কালের স্রোত

শ্রীযোগেশচন্দ্র সিংহ বি. এল্. প্রণীত

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্. এ, বি. এল্. লিখিত ভূমিকা

ও

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্. এ. লিখিত

উপক্রমণিকা

কলিকাতা

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্

বেঙ্গল মেডিকাল লাইব্রেরী হইতে

প্রকাশিত

বঙ্গাব্দ ১৩১৮

মূল্য ১।০

"ततः पदं तत् परिमार्गितव्यं
यस्मिन् गता न निवर्त्तन्ति भूयः ।
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये
यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥"

"युगेष्वावर्त्तमानेषु मासत्वंयनवायनैः ।
सर्गप्रलययोः कर्त्ता तस्मै कालात्मने नमः ॥"

"कालोहि कुरुते भावान् सर्व्वलोके शुभाशुभान् ।
कालः संक्षिपते सर्व्वाः प्रजा विसृजते पुनः ॥
कालः सुप्तेषु जागर्त्ति कालोहि दुरतिक्रमः ।
कालः सर्व्वेषु भूतेषु चरत्यविधृतः समः ॥"

महाभारतम् ।

উৎসর্গ

"पिता स्वर्गः पिता धर्म्मः पिता हि परमन्तपः ।
पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्व्वदेवताः ॥"

পরমারাধ্য স্বর্গীয় কৃষ্ণদয়াল সিংহ চৌধুরী

পিতঃ!

অনন্ত কালস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে সপ্ততিবর্ষ অষ্টমাস পঞ্চদিবস উক্ত শরীর ধারণ করিয়া ইহজগতে আপনি বিদ্যমান ছিলেন। ঐ স্রোতেই ভাসিতে ভাসিতে কিয়ৎকালের জন্য আমি পুত্ররূপে আপনার সম্পর্কে আসিয়াছিলাম।

জীবমাত্রই যাঁহার উদ্দেশে ভাসিয়া চলিয়াছে, তাঁহাকে পাইবার যে পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া আজ দ্বাদশ বৎসর আপনি অন্তর্হিত হইয়াছেন, সেই পথে চলিবার কতটুকু যোগ্যতা পাইয়াছি জানি না; কিন্তু আপনি স্বীয় জীবনের মহৎ দৃষ্টান্ত আমার সম্মুখে ধরিয়া আমার হৃদয়ের যৎকিঞ্চিৎ যে বিকাশ ঘটাইয়াছিলেন, তাহা আজ আপনারই পবিত্র চরণযুগল উদ্ভাসিত করিবার জন্য নিয়োজিত করিয়া কৃতার্থ হইলাম।

১৫ আষাঢ়
বঙ্গাব্দ ১৩১৮
শকাব্দ ১৮৩৩

ভবদীয় পুত্র
যোগেশ

গ্রন্থকারের নিবেদন।

প্রায় চতুর্দ্দশ বৎসর অতীত হইল, এই পুস্তকের বিষয়গুলি সময়ে সময়ে প্রবন্ধাকারে লিখিয়াছিলাম, কিন্তু পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করি নাই। ঐ সকল প্রবন্ধ বহু দিবস পড়িয়া ছিল, তৎপরে কয়েক বৎসর হইল গয়াধামে অবস্থানকালে [illegible] স্কুলের তৎকালীন শিক্ষক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রায় মহাশয় উহা দেখিয়া পুস্তকাকারে ছাপাইবার জন্য আমাকে প্ররোচিত ও উৎসাহিত করেন। তদনুযায়ী ঐ সমস্ত আমি পুস্তকের উপযোগী করিয়া সংযোজিত করি এবং ঐ কার্য্যে তাঁহার নিকট অনেক স্থলে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি, তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

চব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন আমি হিন্দু আইন সম্বন্ধে পুস্তক লিখি, সেই সময়ে আর্য্যশাস্ত্রগ্রন্থ সামান্যমাত্র পড়িবার প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহাতেই আভাস পাইয়াছিলাম যে ইহাতে অমূল্যনিধি বিদ্যমান আছে। তদবধি সেই সমস্ত আরও দেখিবার ও জানিবার জন্য সাতিশয় ইচ্ছা হয়; কিন্তু ইচ্ছা হইলে কি হয়, আর্য্যশাস্ত্রসমুদ্র অনন্ত এবং ইহাতে অসংখ্য রত্ন অতি গুপ্তভাবে নিহিত রহিয়াছে; সেই সমুদ্রে ডুবিয়া কোন রত্ন লাভ করিবার সামর্থ্য ও সুযোগ আমার নাই, তীরে দুই একটি যাহা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহাই সংগ্রহ করিয়া তাহারই সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়াছিলাম; এবং কেবল স্বয়ং তাহা উপভোগ না করিয়া, অপরকেও দেখাইবার জন্য আগ্রহ হইয়াছিল, তদনুযায়ী সেই স্বভাব-সুন্দর রত্নরাজিকে আমার রুচিমত চিত্রবিচিত্র ও সজ্জিত করিয়া, অতি সঙ্কুচিতভাবে সাধারণের সমক্ষে ধারণ করিলাম। ইহাতে অনেক ত্রুটি থাকার সম্ভাবনা, আশা করি, সহৃদয় পাঠক তজ্জন্য

ক্ষমা করিবেন। অপরকে শিক্ষা দেওয়ার ক্ষমতা আমার নাই, কিন্তু আমার এই চিত্র দেখিয়া যদি কেহ প্রকৃত রত্নসমূহ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন এবং তাহারই কতকগুলি লাভ করিয়া, তাহাদেরই উজ্জ্বল আভায় আলোকিত স্বকীয় পথ দর্শন করিয়া, দুস্তর কালের স্রোত উত্তীর্ণ হইবার জন্ত অগ্রসর হন, তাহা হইলেই শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত রেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সুধী বন্ধুদ্বয়কে এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। অভিপ্রায়, ইঁহাদের একজনেরও যদি ভূমিকা লিখিবার অবসর ঘটে। সৌভাগ্যক্রমে উভয়েই ভূমিকা লিখিয়া দিয়া কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। উভয়ের পাণ্ডিত্যপূর্ণ সরস রচনা আমার এই গ্রন্থে যোজনা করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে না পারায়, পরন্তু উহা হইতে পাঠকগণকে বঞ্চিত করিবার প্রবৃত্তি না হওয়ায়, একটির 'ভূমিকা' এবং অপরটির 'উপক্রমণিকা' নাম দিয়া উভয়ই ইহাতে সন্নিবেশিত করিলাম। এই পুস্তক ছাপাইবার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র বাবু ইহা একবার দেখিয়া দিয়াছিলেন, তজ্জন্যও তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

কলিকাতা
১৫ আষাঢ় শকাব্দ ১৮৩৩
খ্রীষ্টাব্দ ৩০ জুন ১৯১১

সূচী।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
ভূমিকা	৸০
উপক্রমণিকা	১৷৵০
কালের স্রোত কখন কখন প্রকাশিত ও কখন কখন অপ্রকাশিত হইতেছে	১
কালস্রোতে ভাসমান জীব ও পদার্থসকল কোথা হইতে কি প্রকারে আসিতেছে	৫
অদ্বৈত মত	৫
দ্বৈতাদ্বৈত মত	৫
দ্বৈত মত	১৪
আর্য্যদর্শনশাস্ত্রের তিনটি মত	১৫
বিবর্ত্তবাদ	১৫
পরিণামবাদ	১৯
আরম্ভবাদ	১৯
তিনটি মতের পরস্পর সামঞ্জস্য	২০
ত্রিগুণ	২২
পঞ্চভূত ও পঞ্চেন্দ্রিয়	৩১
ষড় রিপু	৩৯
কালস্রোতে ভাসমান তুমি, আমি ও অন্যান্য জীবসকল কে এবং কোথায় কি চরম উদ্দেশ্যে চলিয়াছে ...	৪২
জীব ও পদার্থ কি প্রকারে কালস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে	৪৯
জীব পুনঃপুনঃ কেন ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে ...	৫১
শান্তিময় আশ্রয় ও কালস্রোতে ভাসমান জীব ...	৫৫

বিষয়।	পৃষ্ঠা।

জীবাত্মার প্রতি পরমাত্মার আকর্ষণী শক্তি ... ৫৬
জীবগণের দেহাবরণের পরিবর্ত্তন এবং ভ্রূণাদিরূপে তাহার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ৫৮
ঋতুভেদে প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা এবং ত্রিগুণের পরিবর্ত্তন ৬৪
স্বভাব ও তাহার পরিবর্ত্তন ৭৭
কালস্রোতে ভাসমান জীবগণের শ্রেণীবিভাগ এবং তাহাদের ক্রমোৎকর্ষ ৭৯
অধোলোক বা স্থাবর হইতে পশুজাতি পর্যন্ত এবং তাহাদের ক্রমোৎকর্ষ ৭৯
মধ্যলোক বা মনুষ্যজাতি এবং তাহাদের বর্ণ বা শ্রেণীবিভাগ ও ক্রমোৎকর্ষ ৮২
ঊর্দ্ধলোক বা দেবলোক ৮৮
মনুষ্যগণ জন্মের দ্বারা কি প্রকারে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ লাভ করে ৮৯
নানাপ্রকারে মনুষ্যগণের শ্রেণীবিভাগ ১০০
দৈবী ও আসুরী প্রকৃতি ১০৮
পুরুষার্থ ১১১
পুরুষকার ১১১
ভাসমান জীব কি প্রকারে শান্তিময় অবস্থায় উপনীত হয় ১১৪
প্রকৃত সুখের অনুসন্ধান করিতে হইবে ১১৯
শান্তিময় স্থানে উপনীত হইবার পথ কে বলিয়া ও দেখাইয়া দেন ১২০
শান্তিময় আশ্রয়ে যাইবার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পথ ... ১২৬
কর্ম্মমার্গ ১২৮
কর্ম্ম কি ১২৮
কর্ম্মবিভাগ এবং কর্ম্মানুযায়ী সত্ত্বাদিগুণের তারতম্য ... ১৩১
স্বাভাবিক বা লৌকিক কর্ম্ম ১৩৩
জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ ও তাহাদের কর্ম্ম ... ১৩৫
ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও তাহার কর্ম্ম ১৩৫

বিষয়। পৃষ্ঠা।

রসনেন্দ্রিয় ও তাহার কর্ম্ম (আহার) ... ১৩৬
সাত্ত্বিক, রাজসিক, ও তামসিক আহার ... ১৩১
দর্শনেন্দ্রিয় ও তাহার কর্ম্ম ১৪৯
স্পর্শনেন্দ্রিয় ও তাহার কর্ম্ম ১৫০
শ্রবণেন্দ্রিয় ও তাহার কর্ম্ম ১৫০
কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ ও তাহাদের কর্ম্ম ১৫৫
বাগিন্দ্রিয় ও তাহার কর্ম্ম ১৫৫
পাণি ও পাদেন্দ্রিয় ও তাহাদের কর্ম্ম ১৫৯
সঙ্গ ও সঙ্গী ১৬১
স্থানভেদে গুণভেদ ১৬৩
কালভেদে গুণভেদ ১৬৭
আনুষ্ঠানিক বা বৈদিক কর্ম্ম ১৭২
যজ্ঞ ১৭৩
নৃযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ ১৭৪
দান ১৭৭
দানশীলতা ও কৃপণতা ১৭৮
তপঃ ১৮০
যোগ ১৮২
ঐশ্বর্য্য বা যোগসিদ্ধি ১৯৮
বর্ণভেদে কার্য্যভেদ ২০০
চতুরাশ্রম ২১৪
ব্রহ্মচর্য্য ২১৪
গার্হস্থ্য ২২২
বিবাহ ২২৩
বিবাহের বয়স ২২৫

বিষয়।			পৃষ্ঠা।
বরকন্যানির্ব্বাচন	...	...	২৩৫
সবর্ণ ও অসবর্ণ বিবাহ	...	...	২৩৯
রক্তসম্পর্কীয়গণের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ		...	২৪৯
বিধবাবিবাহ এবং ইহা কাহাদের কর্ত্তব্য ও কাহাদের অকর্ত্তব্য			২৫২
বাণপ্রস্থ	...	...	২৬৬
সন্ন্যাস	...	...	২৬৭
পবিত্র ও পূজ্য কি	...	...	২৬৯
নিষ্কাম কর্ম্ম	...	...	২৭২
সকামী কি প্রকারে নিষ্কাম হইতে পারে		...	২৭৬
কর্ত্তব্য কর্ম্ম	...	...	২৮১
শাস্ত্র এবং শাসন	...	...	১৮৪
বিধানকর্ত্তা	...	...	২৮৮
শাস্তিদাতা	...	...	২৯০
ভক্তিমার্গ	...	...	২৯১
ভক্তি কি	...	...	২৯৩
প্রেম কি	...	...	২৯৪
ভক্তি কি প্রকারে হয়	...	...	২৯৬
সকামভাবে উপাসনা করিতে করিতে কামনাহীন হইয়া ঈশ্বরে প্রকৃত ভক্তির উদয় হয়	...	...	২৯৮
চরম লক্ষ্যকে কে কোন্ অবস্থায় কি ভাবে লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইয়া থাকে।	...	...	৩০২
দাস্যাদি ভাব			
ভক্তিমার্গে গমনশীল বৈষ্ণব সাধকগণ	...	...	৩০৩
জ্ঞানমার্গ	...	...	৩০৭
জ্ঞান কি এবং কি প্রকারে ইহার উদয় হয়	...	...	৩০৮

বিষয়। পৃষ্ঠা।

জীবন্মুক্তি ৩১১
সকলের এক ধর্ম্ম হইতে পারে কি না ৩১২
উপসংহার ৩১৬

ভূমিকা।

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহ বি, এল মহাশয় স্বরচিত "কালের স্রোত" গ্রন্থের একটী ভূমিকা লিখিতে আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি বয়সে বিদ্যায় ও প্রতিষ্ঠায় আমার অপেক্ষা প্রবীণ। অতএব তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকা লেখা আমার পক্ষে অসঙ্গত, কিন্তু তথাপি বন্ধুর অনুরোধ পরিহার করিতে পারি নাই।

জীব কালের স্রোতে ভাসমান হইতেছে। তাহার জীবনতরি কোন্ ধ্রুবতারাকে লক্ষ্য করিয়া, কোন্ কর্ণধারের সাহায্যে, কোন্ মার্গ অবলম্বন করিয়া কি প্রকারে কালের স্রোত অতিক্রম করতঃ শান্তিময় সুখধামে উপনীত হইতে পারে গ্রন্থকার "কালের স্রোত" গ্রন্থে তাহারই উপদেশ করিয়াছেন।

"কালের স্রোত" যাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, যিনি কালাতীত ("পরঃ ত্রিকালাৎ"), যাঁহার সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন :—

যস্মাদ্ অর্ব্বাক্ সংবৎসরঃ অহোভিঃ পরিবর্ত্ততে।

তদ্ দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতেঽমৃতং ॥

"যাঁহাকে স্পর্শ না করিয়া সংবৎসর দিবসের সহিত পরিবর্ত্তিত হয়। দেবগণ তাঁহাকে জ্যোতির জ্যোতিঃ অমৃত আয়ুঃ বলিয়া উপাসনা করেন।"

যিনি অনাদি সনাতন, যিনি ভূত ও ভব্য হইতে ভিন্ন (অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ), যিনি অতীত ও ভবিষ্যতের অধীশ্বর (ঈশানং ভূতভব্যস্য), গ্রন্থকার প্রথমেই সেই পরব্রহ্মের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, কালের স্রোত পর্য্যায়ক্রমে পরমাত্মা হইতে প্রসৃত হইয়া

প্রবাহিত হইতেছে, আবার পরমাত্মায় লীন হইয়া অপ্রকাশিত হইতেছে। কালস্রোত যখন ব্রহ্মে বিলীন থাকে তখন ব্রহ্মের নির্গুণ অবস্থা, কালস্রোত যখন ব্রহ্ম হইতে উচ্ছ্বসিত হয় তখন ব্রহ্মের সগুণ অবস্থা। এ সম্বন্ধে আমি অন্যত্র এইরূপ লিখিয়াছি।

"অনন্ত সাগরের যে নিবাত-নিষ্কম্প প্রশান্ত-নিথর অবস্থা ইহাই ব্রহ্মের নির্গুণ ভাব। আর সমুদ্রের যে লহরীসঙ্কুল বীচিবিক্ষুব্ধ সফেণ-তরঙ্গিত অবস্থা—ইহাই ব্রহ্মের সগুণ ভাব। একই সমুদ্র কখন প্রশান্ত, কখন বিক্ষুব্ধ; একই ব্রহ্ম কখন নির্গুণ, কখন সগুণ। প্রশান্ত সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হইতেছে, আবার বিক্ষুব্ধ সমুদ্র প্রশান্ত ভাব ধারণ করিতেছে; পরব্রহ্ম মায়াযবনিকার আবরণে সগুণ সঙ্কুচিত হইতেছেন, আবার মায়ার আবরণ তিরোহিত করিয়া নির্গুণ-নিস্তরঙ্গ হইতেছেন। পর্য্যায়ক্রমে মহাসমুদ্রের এই দুই অবস্থা; পর্য্যায়ক্রমে ব্রহ্মের ঐ দুই বিভাব। তিরস্করণীর আবরণে ব্রহ্মজ্যোতিঃ কখন সঙ্কীর্ণ-সসীম হইতেছেন, আবার তিরস্করণীর তিরোধানে ব্রহ্মজ্যোতিঃ অসীম অনন্ত অনাবৃত হইতেছেন।"

এই যে পর্য্যায়ক্রমে সৃষ্টি ও প্রলয়—পাশ্চাত্যদর্শনে ইহাকে Law of rhythm বলা হইয়াছে। যে নিয়মে দিনের পর রাত্রি হয়, গ্রীষ্মের পর শীত হয়, জোয়ারের পর ভাঁটা হয়, জীবনের পর মৃত্যু হয়—ইহাও সেই মহানিয়মের অন্তর্গত। বাস্তবিক সৃষ্টি ও লয় প্রবাহরূপে অনাদি। সৃষ্টির পর লয়, আবার সৃষ্টি আবার লয়, এইরূপে অবিরাম কালের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। ভগবান্ কাল-রূপী। তিনি অখণ্ড দণ্ডায়মান থাকিয়া এই কালস্রোতকে ধারণ করিয়া আছেন। আমরা ভীষ্মের মত সেই কালাত্মাকে নমস্কার করি।

"তস্মৈ কালাত্মনে নমঃ।"

সেই পরমাত্মার যখন সিসৃক্ষা হয়, যখন তিনি "একোহহং বহুঃ স্যাম্" —এইরূপ ঈক্ষণ করেন, তখন তাঁহাতে জড় ও চিৎ—প্রকৃতি ও পুরুষ, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, এই দ্বৈতের উদয় হয়। জড় জীবের উপাধি। ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের রঙ্গভূমি। অতএব প্রথমেই গ্রন্থকার বিচার উত্থাপন করিয়াছেন যে, জড়জগতের প্রকৃত সত্তা আছে কি না। প্রসঙ্গতঃ তাঁহাকে অদ্বৈত, দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত মতের এবং বিবর্ত্তবাদ, পরিণামবাদ এবং আরম্ভবাদের সংক্ষেপে আলোচনা করিতে হইয়াছে এবং তিনি দেখাইয়াছেন যে এই তিনটী, আপাততঃ বিরোধী মতের সামঞ্জস্য করা অসম্ভব নহে।

প্রকৃতি গুণময়ী—সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের ক্রীড়া-ক্ষেত্র। অতএব গ্রন্থকারকে প্রকৃতির প্রসঙ্গে ত্রি-গুণ এবং ঐ গুণত্রয়ের বিকার পঞ্চভূত ও ইন্দ্রিয়গণের এবং ষড়্‌রিপুর আলোচনা করিতে হইয়াছে। এইরূপ গ্রন্থের প্রস্তাবনা শেষ করিয়া গ্রন্থকার প্রকৃত বিষয়ে উপস্থিত হইয়াছেন। 'কালস্রোতে ভাসমান জীবসকল কে এবং কোথায় কি উদ্দেশ্যে চলিয়াছে।' তিনি দেখাইয়াছেন যে জীব প্রকৃতই ব্রহ্ম, "তত্ত্বমসি" "সোহহং" "ব্রহ্মের সহিত আমার অভেদজ্ঞান অর্থাৎ জড়-জগৎ কল্পনা-প্রসূত ও আমিই ব্রহ্ম—এই জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান। এই জ্ঞানের উদয় হইলে জীব চিরশান্তি লাভ করে।" তিনি জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদের ভাষায় বলিয়াছেন :—

"মত্তঃ সর্ব্বমহং সর্ব্বং ময়ি সর্ব্বং সনাতনে।
অহমেবাক্ষয়ো নিত্যঃ পরমাত্মাত্মসংশ্রয়ঃ।"

তথাপি জীব অবিদ্যার বশে মোহান্ধ হইয়া নিজের ঈশ্বরত্ব বিস্মৃত হইয়াছে এবং উপনিষদের কথায় "অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ"। গ্রন্থকারের ভাষায় "শত বৎসর নহে, সহস্রবৎসর নহে, যুগযুগান্তর ধরিয়া

—এক জন্ম নয়, শত জন্ম নয়, জন্মজন্মান্তর ব্যাপিয়া আমি অসীম অনন্ত কালের স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছি।" জীব মোহের ছলনায়, কামনার তাড়নায়, বাসনার প্রেরণায় এইরূপে ক্রমাগত গতাগতি করিতেছে ("গতাগতং কামকামা লভন্তে")। জীব ইহলোকে জন্মিতেছে, মরিতেছে, পরলোকে যাইতেছে, আবার ইহলোকে ফিরিয়া আসিতেছে, —এইরূপে জীব চক্রভ্রমীর ন্যায় পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন করিতেছে। জীব পুনঃ পুনঃ কেন ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে, কিরূপে তাহার দেহাবরণের পরিবর্ত্তন এবং নানা অবস্থার সংযোজন ঘটিতেছে অতঃপর গ্রন্থকার তাহারই আলোচনা করিয়াছেন। সেই প্রসঙ্গে তাঁহাকে কালস্রোতে ভাসমান জীবগণের শ্রেণীবিভাগ এবং তাহাদের ক্রমোৎকর্ষের বিচার করিতে হইয়াছে। এ সম্বন্ধে তাঁহার গ্রন্থে অনেকগুলি সারগর্ভ কথা সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাইয়াছি।

অনেকের ধারণা ক্রমবিকাশবাদ (doctrine of Evolution) পাশ্চাত্য জাতিদিগের নিজস্ব। যাঁহারা ত্রিকালদর্শী ঋষিদিগের গ্রন্থাদির আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা এ ধারণাকে কখনই সঙ্গত বলিবেন না।

ঋগ্বেদের ঐতরেয় আরণ্যকে (২।৩।২) উক্ত হইয়াছে যে আত্মা স্থাবরের অপেক্ষা উদ্ভিদে, উদ্ভিদের অপেক্ষা পশুতে, পশুর অপেক্ষা মনুষ্যে অধিক প্রকাশমান। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন যে ব্রহ্মার শরীর হইতে অসংখ্য মূর্ত্তি নিঃসৃত হয় এবং উচ্চ এবং নীচ জীবসকল সেই সকল শরীরে অধিষ্ঠিত হইয়া কার্য্য করে।

> "অসংখ্যা মূর্ত্তয়স্তস্য নিপতন্তি শরীরতঃ।
> উচ্চাবচানি ভূতানি সততং চেষ্টয়ন্তি যাঃ ॥" ১২।১৫

পাশ্চাত্য ক্রমবিকাশবাদের মতে দেহেরই ক্রমবিকাশ হয়। স্থাবর হইতে উদ্ভিদ্, উদ্ভিদ্ হইতে কীট পতঙ্গ সরীসৃপ মৎস্য পক্ষী পশু ইত্যাদি মূর্ত্তিরই

ক্রমবিকাশ হয়। আর্য্যঋষিদিগের মত এইরূপ ক্রমবিকাশের বিরোধী নহে। কিন্তু তাঁহারা বলেন যে, যেমন দেহের ক্রমবিকাশ হয় সঙ্গে সঙ্গে জীবেরও ক্রমপ্রকাশ হয়। জীবের মধ্যে কতকগুলি শক্তি অব্যক্ত থাকে, পুনঃ পুনঃ দেহসংযোগের ফলে ঐ অব্যক্ত শক্তিসকল ক্রমশঃ সুব্যক্ত হইতে থাকে; জীবের দিক্ হইতে ইহাই Evolution। সঙ্গে সঙ্গে জীবের অধিষ্ঠানে দেহেরও ক্রমবিকাশ হয়। যে জীব যত উন্নত, তাহার দেহও তত উন্নত। মৎস্যজীব মনুষ্যশরীরে অধিষ্ঠিত হইতে পারে না এবং মনুষ্যজীবের পক্ষে মৎস্যশরীর পর্য্যাপ্ত নহে। সেই জন্যই মনু উচ্চনীচ জীবের উপযোগী অসংখ্য মূর্ত্তির উল্লেখ করিলেন। দেহের পক্ষ হইতে এই ক্রমবিকাশই Evolution। এ সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকগুলি আমাদিগের বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ঃ—

স্থাবরং বিংশতের্লক্ষং জলজং নবলক্ষকম্।
কূর্ম্মাশ্চ নবলক্ষং চ দশলক্ষং চ পক্ষিণঃ॥
ত্রিংশল্লক্ষং পশূনাং চ চতুর্লক্ষং চ বানরাঃ।
ততো মনুষ্যতাং প্রাপ্য ততঃ কর্ম্মাণি সাধয়েৎ॥
এতেষু ভ্রমণং কৃত্বা দ্বিজত্বমুপজায়তে।
সর্ব্বযোনিং পরিত্যজ্য ব্রহ্মযোনিং ততোঽভ্যাগাৎ॥

বৃহৎ বিষ্ণুপুরাণ।

অর্থাৎ “জীব পর পর ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া অবশেষে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হয়। জীব ২০ লক্ষ স্থাবর, ৯ লক্ষ জলজ প্রাণী (মৎস্যাদি), ৯ লক্ষ সরীসৃপ (কূর্ম্মাদি), ১০ লক্ষ পক্ষী, ৩০ লক্ষ পশু ও ৪ লক্ষ বানর যোনি অতিক্রম করিয়া অবশেষে মনুষ্যশরীর গ্রহণ করে এবং মনুষ্যের মধ্যেও ক্রমোন্নতির স্রোতে ভাসমান হইয়া দেহের পর দেহ অতিক্রম করিয়া পরিণামে ব্রহ্মজ্ঞানের উপযোগী সম্পূর্ণ বিকশিত ব্রহ্মযোনি প্রাপ্ত হয়।

জীবগণের শ্রেণীবিভাগের বিচার করিতে গিয়া গ্রন্থকারকে জাতি-ভেদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতি বা বর্ণ। এই বর্ণবিভাগের ভিত্তি—গুণকর্ম্মভেদ। গ্রন্থকার এ বিষয়ের বিস্তৃত উল্লেখ করিয়াছেন। তবে তিনি জন্মগত জাতির বিষয়ে কিছু বেশী লিখিয়াছেন। উত্তরাধিকারসূত্রে যে পিতৃগুণ পুত্রে সাধারণতঃ সংক্রামিত হয়, ঐ মতে বোধ হয় কাহারও আপত্তি হইবে না। পাশ্চাত্যেরাও স্বীকার করেন "There is something in descent।" কিন্তু গুণকর্ম্মের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া জন্মগত জাতির প্রতিষ্ঠা করিলে সমাজে অনেক অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এ সম্বন্ধে মহাভারতের বনপর্ব্বে কয়েকটী সারকথা নিবদ্ধ হইয়াছে।

ঋষির শাপে নহুষ রাজা সর্পদেহ ধারণ করিয়া হিমালয়ের এক গুহায় বাস করিতেছিলেন। সেই সময় যুধিষ্ঠিরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। যুধিষ্ঠিরের নিকট সর্পরূপী নহুষ এই প্রশ্নটী জিজ্ঞাসা করেন।

ব্রাহ্মণঃ কো ভবেদ্ রাজন্ বেদ্যং কিঞ্চ যুধিষ্ঠির!

"হে যুধিষ্ঠির বেদ্য কি? হে রাজন্! ব্রাহ্মণ কে?"

যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন:—

বেদ্যং সর্প পরং ব্রহ্ম নির্দুঃখমসুখঞ্চ যৎ।

"হে সর্প! সুখদুঃখের অতীত যিনি পরব্রহ্ম, তিনিই বেদ্য।"

সত্যং দানং ক্ষমা শীলম্ আনৃশংস্যং তপো ঘৃণা।

দৃশ্যন্তে যত্র নাগেন্দ্র! স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥

"যাঁহাতে সত্য, দান, ক্ষমা, শীল, অক্রূরতা, তপস্যা ও করুণা দৃষ্ট হয়, তিনিই ব্রাহ্মণ।"

সর্প বলিল যে এ সকল গুণ ত শূদ্রেও লক্ষিত হয়; অতএব শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইতে পারে?

যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন :—

ন বৈ শূদ্রো ভবেৎ শূদ্রো ব্রাহ্মণো নচ ব্রাহ্মণঃ।
যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প! বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প! তং শূদ্রমিতি নির্দ্দিশেৎ॥

"শূদ্রবংশে জন্মিলেই শূদ্র হয় না, আর ব্রাহ্মণবংশে জন্মিলেই ব্রাহ্মণ হয় না। কিন্তু যে ব্যক্তিতে বৈদিক বৃত্ত লক্ষিত হয়, তিনিই ব্রাহ্মণ এবং যাহাতে লক্ষিত না হয় সেই শূদ্র।"

যত্রেদানীং মহাসর্প! সংস্কৃতং বৃত্তমিষ্যতে।
তং ব্রাহ্মণমহং পূর্ব্বং উক্তবান্ ভুজগোত্তম॥

"হে মহাসর্প! আধুনিক কালে মূলজাতি নির্দ্দেশ করা অতি দুরূহ হইয়াছে। অতএব যাঁহাতে সংস্কৃত বৃত্ত (উৎকৃষ্ট আচার ও উত্তম শীল) লক্ষিত হয়, তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিবে।

যুধিষ্ঠিরের উত্তরে নহুষ বিশেষ প্রীত হইলেন এবং তাঁহাকে কয়েকটী তত্ত্বকথা উপদেশ দিয়া এই শেষ কথা বলিয়া গেলেন :—

সত্যং দমস্তপোদানমহিংসাধর্ম্মনিত্যতা।
সাধকানি সদা পুংসাং ন জাতির্ন কুলং নৃপ!

"হে রাজন্! জাতি, কুল, কার্য্যকারক নহে—কিন্তু সত্য, দম, তপঃ, দান, অহিংসা ও ধর্ম্মনিষ্ঠতাই পুরুষার্থসাধক।"

হিন্দুসমাজে অধুনা বর্ণাশ্রমধর্ম্মের যে শোচনীয় অধঃপতন ঘটিয়াছে তাহাতে আমাদের যুধিষ্ঠিরনহুষসংবাদ স্মরণ করা ভাল। এখন জাতি বংশগতই হইয়াছে; যে জাতিতে যে জন্মিয়াছে, সেই জাতির প্রাকৃতিক

গুণ তাহাতে আছে কি না,—তাহার প্রতি আমরা এখন আর দৃষ্টি করি না। গীতাতে ভগবান্ বলিয়াছেন—

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগতঃ।

"গুণ ও কর্ম্মের তারতম্য অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণ সৃষ্ট হইয়াছে।"

ব্রাহ্মণবর্ণ সত্ত্বগুণপ্রধান; ব্রাহ্মণের কর্ম্ম,—শম, দম, তপঃ, শৌচ, ক্ষমা, সারল্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য। ক্ষত্রিয়প্রকৃতিতে সত্ত্ব ও রজঃ উভয় গুণের সমাবেশ; ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম,—শৌর্য্য, বীর্য্য, ধৈর্য্য, দক্ষতা, সাহস, দান ও প্রভুত্ব। বৈশ্যের প্রকৃতি রজঃপ্রধান, তাহার কর্ম্ম,—ধনার্জ্জন, কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য। শূদ্র তমঃপ্রধান তাহার কর্ম্ম—সেবা। গ্রন্থকার এ সম্বন্ধে সবিশেষ বলিয়াছেন। যদি কেহ ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়বংশে উৎপন্ন হইয়া অভিমান করেন, অথচ তাঁহার প্রকৃতি সত্ত্বপ্রধান বা সত্ত্বাবিষ্ট না হয়, তিনি যদি ব্রাহ্মণের বা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মপালনে পরাঙ্মুখ হন, তবে কি তাঁহার অভিমান সঙ্গত হইবে? ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ হইবার চেষ্টা করুন, তবেই তিনি ব্রাহ্মণের উচ্চাধিকারের অধিকারী হইবেন। অন্যান্য বর্ণেরা যদি উচ্চতর প্রকৃতি অর্জ্জন করিতে পারেন, তবে তাঁহারাও নামতঃ না হউন, ফলতঃ ব্রাহ্মণ হইবেন।

জাতিভেদের বিচার করিয়া গ্রন্থকার কালস্রোতে ভাসমান জীব কি প্রকারে শান্তিময় অবস্থায় উপনীত হয় তাহার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, জীবের প্রকৃতিভেদে শান্তিময় আশ্রয়ে যাইবার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পথ। গ্রন্থকার তিনটী মার্গের উল্লেখ করিয়াছেন কর্ম্মমার্গ, ভক্তিমার্গ ও জ্ঞানমার্গ। এই তিন মার্গ ব্যতীত আর একটী মার্গের শাস্ত্রে উপদেশ আছে, সে মার্গের নাম ধ্যানমার্গ। যোগশাস্ত্রে এই মার্গের বিশেষভাবে বিচার আছে। ভগবান্ এই মার্গকে লক্ষ্য করিয়া গীতায় বলিয়াছেন যে "হে অর্জ্জুন তুমি যোগী হও (অর্থাৎ ধ্যান-

যোগ আশ্রয় কর); কারণ ধ্যানযোগী তপস্বীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কর্ম্মীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানীর অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।"

তপস্বিভ্যোঽধিকোযোগী।
কর্ম্মিভ্যোপি মতোধিকঃ॥
জ্ঞানিভ্যোপ্যধিকো যোগী।
তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন॥

গ্রন্থকার এই ধ্যানমার্গের স্বতন্ত্র আলোচনা করেন নাই। তিনি ইহাকে কর্ম্মেরই অঙ্গরূপে অবান্তরভাবে উপস্থিত করিয়াছেন।

গ্রন্থকার কর্ম্মমার্গের অতি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। ব্রহ্মচর্য্য, বিবাহ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস প্রভৃতি বিষয়ে তিনি অনেকগুলি সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন। অতঃপর ভক্তিমার্গ ও জ্ঞানমার্গের বিচার করিয়া গ্রন্থের উপসংহার করা হইয়াছে। এই দুই মার্গের বিষয় আমরা গ্রন্থকারের নিকট আরও অনেক কথা শুনিবার আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি ভক্তি ও জ্ঞানের অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছেন। আশা করি আগামী সংস্করণে এই বিষয়ের বিস্তার দেখিতে পাইব।

পরিশেষে আমার একটী কথা বক্তব্য আছে। গ্রন্থকার গীতার বিশেষ পক্ষপাতী বোধ হইল। গীতার আলোচনা করিলে দেখা যায় যে গীতাপ্রচারের সময় ভারতবর্ষে মোক্ষলাভের জন্য চারিটী বিভিন্ন মার্গ প্রচারিত ছিল। এ বিষয়ে আমি অন্যত্র এইরূপ লিখিয়াছি। "সেই মার্গচতুষ্টয়ের নাম ছিল যথাক্রমে—কর্ম্মমার্গ, জ্ঞানমার্গ, ধ্যানমার্গ ও ভক্তিমার্গ। যিনি যে পথে চলিতেন, তিনি ভাবিতেন যে, সাধনমার্গের সেই একমাত্র পথ, দ্বিতীয় পথ নাই। ভগবান্ গীতা প্রচার করিয়া ঐ সকল বিভিন্ন সাধনমার্গের অপূর্ব্ব সমন্বয় বিধান করিয়াছেন। তাহার ফলে দেখা যায় যে, প্রয়াগে যেমন গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী পুণ্যসঙ্গমে

মিলিত হইয়া পতিতপাবনী ধারায় দেশ প্লাবিত করিয়া সমুদ্রাভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছেন, সেইরূপ গীতাতে কর্ম্ম, জ্ঞান, ধ্যান ও ভক্তিরূপ মার্গচতুষ্টয় অপূর্ব্ব সমন্বয়ে সমন্বিত হইয়া জগৎকে পবিত্র করিয়া ভগবানের অভিমুখে প্রধাবিত হইয়াছে। এই সমন্বয়বাদ গীতার নিজস্ব। শাস্ত্রের আর কোথাও এমন উজ্জ্বলভাবে ইহার উপদেশ দেখা যায় না।" এই সমন্বয়বাদের এখানে বিস্তার করা সম্ভব নহে। তবে আমি আশা করি গ্রন্থকার পরবর্ত্তী সংস্করণে এ বিষয়ে তাঁহার পরিণত জ্ঞানের সংসিদ্ধান্ত পাঠকের গোচর করিবেন।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

উপক্রমণিকা।

কর্ম্মে মনুষ্যের স্বাধীনতা নাই; থাকা বাঞ্ছনীয়ও নহে। এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিবার আমার কোন অধিকার নাই; কিন্তু গ্রন্থখানি যিনি রচনা করিয়াছেন, তিনি আমার সম্মানভাজন বন্ধু; তাঁহার অনুরোধে আমাকে এই অনধিকারচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে; আমি স্বাধীন হইলে এই ভূমিকা লিখিতাম না; কিন্তু গ্রন্থকর্ত্তা আমাকে সে স্বাধীনতা দেন নাই।

কর্ম্মে স্বাধীনতা না থাকিলেও 'চিন্তায় স্বাধীনতা' সকলেরই আছে; থাকাও বাঞ্ছনীয়;—স্বাধীন চিন্তা লইয়া আস্ফালনের এই যুগে এ বিষয়ে কাহারও ভিন্ন মত হইবে না।

গ্রন্থকার গ্রন্থখানি ছাপিবার পূর্ব্বে আমাকে দেখিতে দিয়াছিলেন; ছাপা শেষ হইলেও দেখিতে দিয়াছিলেন; কেন দিয়াছিলেন তিনিই জানেন; আমি তাঁহার অনুরোধপালনে নিতান্ত বাধ্য বলিয়াই দেখিয়াছিলাম আমি নিতান্ত কুণ্ঠার সহিত এখানে ওখানে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিতে বলিয়াছিলাম। গ্রন্থের কোন স্থানে কোন বিশেষ পরিবর্ত্তনের আমি প্রয়োজন দেখি নাই। তাঁহার সকল কথা আমি মানিতে প্রস্তুত আছি, ইহা বলিতে চাহি না; তাঁহার চিন্তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিবার আমার কোন অধিকার ছিল না।

আমাদের পুরাতন সমাজতন্ত্রসম্বন্ধে গ্রন্থকর্ত্তা প্রচুর চিন্তা করিয়াছেন, এই গ্রন্থে তাহার পরিচয় আছে। আমিও কিছু কিছু ভাবিয়াছি; এই ভূমিকা উপলক্ষ করিয়া সে সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা বলিয়া লইব। এমন দুরাশা রাখি না যে তাহা অন্যের গ্রহণযোগ্য

বা শ্রবণযোগ্য হইবে। তবে এ কালে যখন সকলেই স্বাধীন চিন্তার অধিকারী, আমিই বা আমার দাবি ছাড়িব কেন?

আমাদের পুরাতন সমাজতন্ত্র বেদনামক শব্দরাশির উপর প্রতিষ্ঠিত। যাঁহারা এই সমাজতন্ত্রের অধীন, তাঁহারা এই শব্দরাশিকে অনাদি ও অপৌরুষেয় বলিয়া মানিয়া থাকেন। যাঁহারা মানেন না,—কার্য্যতঃ মানেন না,—তাঁহারা বড়লোক ও ভাললোক হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা আমাদের সমাজতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত নহেন।

অথচ ইহা না মানিবারও সম্যক্ কারণ দেখি না। এই ব্যাবহারিক জগতে যাহা কিছু আছে, তাহা চিরকালই আছে ও চিরকালই থাকিবে; ইহা না মানিলে কোন বিজ্ঞানেরই ভিত্তি থাকে না। এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে, যে বস্তুমাত্রই বিকারী ও পরিণামশীল; এবং এই বিকার ও পরিণামই আমরা অনুক্ষণ প্রত্যক্ষ করি। এই অনিত্য বিকারের অন্তরালে ইহার আশ্রয়রূপে যে নিত্য বস্তু আছে, তাহা আমাদের প্রত্যক্ষগোচর নহে; উহা হয়ত একটা কাল্পনিক বস্তু। কিন্তু এই ব্যাবহারিক জগৎ সমস্তটাই যখন কল্পিত বস্তু, তখন এই যুক্তিতে ভীত হইবার প্রয়োজন নাই। ব্যাবহারিক হিসাবে অস্তিত্বযুক্ত যাবতীয় বস্তুকে নিত্য সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। "সত্যেনোত্তভিতা ভূমিঃ"—সত্য দ্বারাই ভূমি ধৃত হইয়া আছে; "ঋতেনাদিত্যাস্তিষ্ঠন্তি"—ঋত দ্বারাই আদিত্যগণ স্থির আছেন; ইহা না মানিলে বিজ্ঞানশাস্ত্র টিকে না। এই 'ঋত' ও এই 'সত্য' অভীদ্ধ তপস্যা হইতে জাত, এবং তাহা হইতেই আর সমস্ত জন্মিতেছে, এটুকু মানিয়া লইয়াই আমরা সংসারক্ষেত্রে চরিতেছি।

বেদকে শব্দসমষ্টি বলিয়া গ্রহণ করিবার প্রথা আছে। কিন্তু এই শব্দ আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়লব্ধ এবং বায়ুরাশিতে প্রতিঘাত-

জাত শব্দ মনে না করিলেও চলিতে পারে। প্রাচীন কালের মীমাংসক ও শাব্দিক আচার্য্যগণ ইহা লইয়া বহু বিতণ্ডা করিয়াছেন। সেই বিতণ্ডার ফলে এইটুকু বুঝা যায়, যে প্রাচীন আচার্য্যেরা যে শব্দকে অনাদি ও অপৌরুষের বলিতেন, তাহা সাধারণের পক্ষে কোনরূপ অতীন্দ্রিয় বস্তু ;—তাহা নিত্যবস্তুরূপে জগৎ জুড়িয়া বিদ্যমান আছে ;—তাহার আদি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, অতএব তাহা অনাদি ; তাহা কোন পুরুষের "কৃত" নহে, অতএব অপৌরুষেয়। এমন কি এই শব্দ হইতেই ব্যাবহারিক জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, এরূপ কথাও যখন দেখা যায়, তখন সেই শব্দকেই ঋত বা সত্যের বিকাশ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

সর্ব্বসাধারণের পক্ষে তাহা অতীন্দ্রিয় হইলেও কোন কোন মহাপুরুষ সাধনাবলে কোন না কোনরূপে তাহার কোন না কোন দিকের, কোন না কোন অংশের, সন্ধান পান—তাহা যেন তাঁহাদের 'দৃষ্টি', পথে আইসে। যাঁহারা ইহা দেখিতে পান, তাঁহাদের নাম 'ঋষি'।

বস্তুতঃ এরূপ মহাপুরুষের আবির্ভাব সকল দেশে সকল কালেই হইয়া থাকে ; অন্যে যাহা দেখিতে পায় না, তাঁহারা তাহা দেখেন, এবং জনসমাজে প্রচলিত ভাষায় শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দদ্বারা প্রকাশ করেন। তাঁহারাই ঋষি। নিউটন এবং ডারুইন এবং মাক্‌সওয়েলকে যদি কেহ আধুনিক যুগের ঋষি বলিয়া অভিহিত করিতে চাহেন, তাহাতে ক্ষুব্ধ হইবার কারণ দেখিব না। তাঁহারাও সেই ঋতের—যে ঋত বিশ্বজগৎকে ধারণ করিয়া আছে, সেই ঋতের—এক দেশ না এক দেশ দেখিয়াছেন। তাঁহারা যাহা দেখেন ও প্রচার করেন, তাহা ব্যাবহারিক জগতের নিত্য সত্য—তাহা চিরদিনই বিদ্যমান আছে ;—ছিল এত দিন প্রচ্ছন্নভাবে ; তাঁহারা তাহা ব্যক্ত করিয়া দেন।

বেদপন্থীরা বলেন, বেদনামক অতীন্দ্রিয় শব্দরাশিও সময়ে সময়ে

ঋষিগণের বিজ্ঞানদৃষ্টির গোচর হইয়াছে; তাঁহারা সেই প্রচ্ছন্ন সত্যকে প্রচলিত মানবী ভাষায় প্রকাশ করিয়া মানবের হিতার্থ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। নিউটন যেমন মাধ্যাকর্ষণঘটিত মন্ত্রে অথবা ডারুইন যেমন অভিব্যক্তিঘটিত মন্ত্রে ব্যাবহারিক নিত্য সত্যের এক একটা দেশ ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, বেদপন্থী সমাজের প্রাচীন ঋষিরাও সেইরূপ ব্যাবহারিক জগতের কোন না কোন দেশের আবরণ খুলিয়া দিয়াছেন। এমন কি, যে গূঢ়তর আবরণে পরমার্থতত্ত্ব আবৃত হইয়া ব্যাবহারিক জগৎরূপে প্রতীয়মান হইতেছে, সেই আবরণও উদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছেন।

আর একটু নীচে নামিয়া দেখ যায়,—বেদ ও বিদ্যা এই দুই শব্দ সমানার্থক। প্রাচীন বেদপন্থী সমাজে ঋষিগণের আবিষ্কৃত সমুদয় বিদ্যার সমষ্টিকে বেদ বলিত। এ কালের বেদপন্থী সমাজেও যে কিছু বিদ্যা বর্ত্তমান আছে, তাহা সেই পুরাতনী বিদ্যারই বিকৃতি ও পরিণতি মাত্র। ভাগীরথীর সহস্র শাখার উৎসসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে সেই গোমুখী-তেই উপস্থিত হইতে হইবে। স্থূলতঃ এই বিদ্যাকে জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ডে ভাগ করা হয়। জ্ঞানকাণ্ডে ব্যাবহারিক জগতের পারমার্থিক তত্ত্বনির্ণয়ের চেষ্টা আছে। ঋগ্বেদসংহিতার অন্তর্গত নাসদাসীয় সূক্তে সম্ভবতঃ সেই তত্ত্বের প্রথম স্পষ্ট প্রচার দেখা যায়—উক্ত সংহিতার অন্তর্গত অম্ভৃণকন্যা বাগ্দেবীদৃষ্ট দেবীসূক্তে সেই তত্ত্বের প্রায় পূর্ণ পরিণতি দেখা যায়। বেদের সমুদয় জ্ঞানকাণ্ডে এই তত্ত্বই আরও ফুটাইবার চেষ্টা হইয়াছে, আর নূতন কথা বড় একটা বলা হয় নাই। তার পর কত যুগ অতীত হইয়া গেল; আর কেহ আর কোন নূতন কথা প্রচার করিতে পারেন নাই; পারিবেন এরূপ আশাও নাই। উহাই জ্ঞানকাণ্ডের প্রথম কথা ও শেষ কথা—উহাতে যে সত্যের উল্লেখ আছে, তাহা অনাদি ও অপৌরুষেয় সত্য।

ঋষিগণের আবিষ্কৃত এই সত্য মানবজাতির সাধারণ সম্পত্তি। শুক্লযজুর্বেদান্তর্গত ঈশাবাস্যমিত্যাদি ঋক্‌সমূহাত্মক উপনিষদে মানবসাধারণের ধর্ম্মসম্পর্কে মূল কথা আবিষ্কৃত হইয়াছে—মানবের কর্ম্মকাণ্ডের ইহাই প্রথম কথা ও শেষ কথা। তৎপরে যিনি যাহা প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে ঐ মূল কথাকেই পল্লবিত করা হইয়াছে। মানবের ব্যাবহারিক কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে অনাদি ও অপৌরুষেয় সত্যের এতদ্দ্বারা প্রচার হইয়াছে, তাহাও মানবজাতির সাধারণ সম্পত্তি।

কিন্তু বেদপন্থীর বেদমধ্যে অনেক কথা আছে, যাহা মানবের সাধারণ সম্পত্তি নহে। মানবসমাজের যে সঙ্কীর্ণ অংশ বেদপন্থী, সেই সঙ্কীর্ণ অংশেই তাহার প্রয়োজ্যতা। এই অংশকেই সাধারণতঃ বেদের কর্ম্মকাণ্ড বলিয়া থাকে। কিন্তু এই কর্ম্মকাণ্ডের ভিত্তিভূমিও উক্ত উপনিষদেই নিহিত আছে।

বেদপন্থী সমাজের মূল কোথায় ও এই সমাজের বিশিষ্ট ভাব কি, তাহা জানিতে হইলে ঋষিপ্রচারিত বেদের এই কর্ম্মকাণ্ডের আশ্রয় লইতে হয়। বেদপন্থী সমাজের যাহা বিশিষ্ট ধর্ম্ম, যদ্দ্বারা ঐ সমাজ পৃথিবীর অন্যান্য সমাজ হইতে ভিন্ন করিয়া চিনিয়া লইতে পারা যায়, সেই ধর্ম্মের পরিচয় বেদের এই কর্ম্মকাণ্ড ভিন্ন অন্য কোথাও জানিবার উপায় নাই।

এই বিশিষ্ট সামাজিক ধর্ম্মেরও আদি কোথায়, তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সহসা একদিন পাঁচজনে জটলা করিয়া এই ধর্ম্মের স্থাপনা করে নাই—কোন পুরুষকর্তৃক ইহা "কৃত" নহে; বেদপন্থীর চক্ষুতে এই ধর্ম্মেও যে ব্যাবহারিক সামাজিক সত্যের একদেশের পরিচয় দেয়, তাহাও অনাদি ও অপৌরুষেয়। যে দিন হইতে আর্য্য জাতির বেদপন্থী শাখা সমাজবদ্ধ হইয়াছে,—সে কোন্ দিন তাহা আজিও কেহ জানে না—সেই দিন হইতে এই বিশিষ্ট ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া সেই

সমাজ ধৃত রহিয়াছে। এই ধর্ম্মের পারিভাষিক নাম যজ্ঞ এবং যজ্ঞের নামান্তর ত্যাগ। ত্যাগ নহিলে মনুষ্য সমাজবদ্ধ হইতে পারেনা। ধর্ম্মমাত্রই ত্যাগাত্মক; তবে বেদপন্থী সমাজে ত্যাগের একটু বিশিষ্ট ভাব ছিল, তাহা বেদপন্থীর বেদ ভিন্ন অন্য কোথাও পাওয়া যায় না।

যে পুস্তকের উপক্রমণিকা লিখিতে বসিয়াছি, তাহাতে জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড উভয়ই আলোচিত হইয়াছে; অতএব উভয়ের কথাই আর একটু স্পষ্ট ও বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিব। বাহ্য জগতের সহিত আমার সম্পর্ক এই জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড উভয়েরই আলোচ্য বিষয়; আর তৃতীয় কথার কোন প্রয়োজন নাই। কেননা আমি জানি এবং আমি করি—এই দুইটা বলিলেই আমার সম্বন্ধে সমস্ত কথাই বলা হয়; আর তৃতীয় কথা বলিবার প্রয়োজন থাকে না। এই বাহ্য জগৎ কতিপয় শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধে নির্ম্মিত; শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ ছাড়িয়া দিলে বাহ্য জগতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এই শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ আমারই জ্ঞানের বিষয়; আমার যখন জ্ঞান থাকে না—যেমন সুষুপ্তির সময়—তখন শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধের লেশ মাত্র কোথাও কিছু থাকে না—তখন বাহ্য জগৎও থাকে না। বাহ্য জগৎ যে তখন বর্ত্তমান থাকে, কোন তার্কিকই তাহার প্রমাণ দিতে পারিবেন না। আমিই শব্দস্পর্শাদিকে জানি; এবং যতক্ষণ জানি, ততক্ষণই উহারা বর্ত্তমান থাকে; আমি জানি বলিয়াই বর্ত্তমান থাকে। আমিই ঐ শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ 'সৃষ্টি' করিয়া উহাদিগকে বিবিক্তভাবে স্বতন্ত্র ভাবে জানিয়া থাকি; এবং উহাদিগকে দুই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সাজাইয়া বিন্যস্ত করিয়া বা সন্নিবেশিত করিয়া জানিবার চেষ্টা করি। এক রকম বিন্যাসের নাম দেশে বিন্যাস, অন্যরূপ বিন্যাসের নাম কালে বিন্যাস। এই দেশ ও কাল, উভয়ই সেই রূপরসাদিবিষয়ক জ্ঞানগুলিকে সাজাইবার প্রথামাত্র; উভয় প্রথাই আমারই কল্পিত। আমার যখন জ্ঞান থাকে

না, তখন দেশও থাকে না; কালও থাকে না; তখন দেশকালের অস্তিত্বের কেহ প্রমাণ দিতে পারে না। ফলে এই দেশে বিস্তৃত ও কালে প্রসারিত রূপরসাদিময় বাহ্যজগৎকে আমি কল্পনা করিয়া বা সৃষ্টি করিয়া আমার কল্পিত সম্মুখে পশ্চাতে আশে পাশে ছুড়িয়া ফেলি এবং আমার কল্পিত অতীতে ও ভবিষ্যতে টানিয়া লইয়া যাই। ইহাই আমার সুষুপ্তি হইতে জাগরণ—ইহারই নামান্তর জগৎ-সৃষ্টি। আবার যখন আমার জাগরণ সুষুপ্তিতে লীন হইয়া যায়, তখন এই বাহ্য জগৎকে গুটাইয়া লইয়া দেশ ও কালকে লোপ করিয়া আমার ভিতরে টানিয়া লই—ইহারই নামান্তর প্রলয়। কিন্তু যখন এই জগৎব্যাপারটা আমারই কল্পনা—যখন কালনামক পদার্থটা আমারই কল্পিত,—তখন এই 'যখন' 'তখন' প্রভৃতি নির্দ্দেশেরও কোনরূপ পারমার্থিক তাৎপর্য্য নাই; জগৎই যদি কল্পনা হয়, তবে তাহার সৃষ্টি ও প্রলয় কল্পিত না হইয়া যায় না।

কিন্তু এই কল্পনা করে কে?

এই কল্পনা করি আমি। এই আমার অস্তিত্বে আমার কোনরূপ সংশয় নাই; সংশয় করিলে আমার কোন কথা কহিবারই অবসর বা অধিকার থাকে না। জগতের অস্তিত্ব আমার অপেক্ষা করে—আমি না থাকিলে এই জগৎ কোথায় থাকিত? কিন্তু আমার অস্তিত্ব কাহারও অপেক্ষা রাখে না। আমি আছি, ইহা আমার পক্ষে অবিসংবাদিত ধ্রুব সত্য। এই সত্যটুকুই পরমার্থতত্ত্ব।

আর এই যে আমার কল্পিত জগৎ, উহার অস্তিত্ব ব্যাবহারিক মাত্র। আমি উহাকে সৃষ্টি করিয়া আমা হইতে স্বতন্ত্রভাবে দেখিতেছি ও উহার সহিত আমার একটা কাল্পনিক সম্পর্ক পাতিয়াছি। এই কাল্পনিক সম্পর্ক পাতানর নাম ব্যবহার—এই ব্যবহারের আলোচনা যাবতীয় বিজ্ঞানবিদ্যার বিষয়।

বেদের যাহা জ্ঞানকাণ্ড, তাহাতে ঋষিগণ এই সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন ও ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, যে আমাছাড়া আর কোন বস্তুর পারমার্থিক সত্তা নাই। আমিই আছি—আর যাহা আছে বলিয়া মনে করি, তাহা মনে করি মাত্র, তাহা আমারই কল্পনামাত্র, আমারই সৃষ্টিমাত্র—তাহার নিরপেক্ষ অস্তিত্ব নাই। আমিই এই কাল্পত বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা—আমি ভিন্ন আর কোন সৃষ্টিকর্তা নাই। এই যে আমি, সেই আমার নামান্তর ব্রহ্ম। আমিই ব্রহ্ম। তদতিরিক্ত কোন সৃষ্টিকর্তার কল্পনা একেবারে অনাবশ্যক।

প্রশ্ন উঠে, আমিই না হয় একমাত্র সৎপদার্থ হইলাম এবং জগৎ না হয় কল্পিত পদার্থ হইল; কিন্তু এই পরিদৃশ্যমান জগৎ মৎকর্তৃক কেন ও কিরূপে সৃষ্ট বা কল্পিত হইল? নাসদাসীয় সূক্তের ঋষি এই প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন। 'কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ, কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টি."—কে জানে,কে বলিবে, এই জগৎ কোথা হইতে আসিল? কোথা হইতে সৃষ্ট হইল? কে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে? "যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ"—যিনি পরম ব্যোমে অর্থাৎ ব্যাবহারিক দেশের পরপারে থাকিয়া এই জগতের অধ্যক্ষ সাক্ষী বা দ্রষ্টা—তিনিই জানেন; অর্থাৎ জগতের সৃষ্টিকর্তা ও দ্রষ্টা আমিই ইহা জানি—আমিই উত্তর দিতে পারি। অথবা আমিও জানিনা; অর্থাৎ আমি মূঢ় সাজিয়া এই জগতের সৃষ্টি কিরূপে হইল, তাহা না জানিবার ভাণ করি।

বস্তুতঃ এই জগতের উৎপত্তি একটা "বিসৃষ্টি" বা বিসর্জ্জনমাত্র,—ছুড়িয়া ফেলামাত্র; আমিই এই জগৎকে আমার বাহিরে ছুড়িয়া ফেলিয়াছি। কিরূপে ছুড়িয়া ফেলিলাম?—"কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি, মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ"—আমার মনে কাম উপস্থিত হইল, ইহাই জগতের উৎপত্তিহেতু। অর্থাৎ আমি ইহা কামনা করিলাম—সেই

কামনা হইতে ইহার উৎপত্তি। এই জগদ্ব্যাপার আমার কামনামাত্র, আমার লীলা মাত্র। এই কামনারূপ জগন্নির্ম্মাণের শক্তির পরবর্ত্তী কালে নাম দেওয়া হইয়াছে মায়া।

অম্ভৃণকন্যা বাক্ স্পষ্ট ভাষায় প্রচার করিয়াছেন—"অহং রুদ্রেভি-র্বসুভিশ্চরামি অহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ, অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্মি অহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা"—আমিই রুদ্রগণের ও বসুগণের সহিত বিচরণ করি,আমিই আদিত্যগণের ও বিশ্বদেবগণের সহিত বিচরণ করি; আমিই মিত্র ও বরুণকে ভরণ করি, আমিই ইন্দ্র ও অগ্নি এবং অশ্বিদ্বয়কে ধারণ করি। "অহং সুবে পিতরমস্য মূর্দ্ধন্ মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে, ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বোতামূং দ্যাং বর্ষ্মণোপস্পৃশামি"—আমিই সকলের শিরঃস্বরূপ দ্যোঃ পিতাকে প্রসব করিয়াছি, সমুদ্রের অভ্যন্তরে জলমধ্যে আমার যোনি আছে; সেই স্থান হইতে আমি সকল ভুবনে প্রতিষ্ঠিত হই; আমার দেহ দ্বারা আমি দ্যুলোক স্পর্শ করি। "অহমেব বাত ইব প্রবামি, আরভমাণা ভুবনানি বিশ্বা"—আমি বিশ্ব ভুবন নির্ম্মাণ করিতে করিতে বায়ুর ন্যায় সর্ব্বত্র প্রবহমাণ হই। "পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যা এতাবতীমহিমা সংবভূব"—আমার মহিমা পৃথিবী ও দ্যুলোককেও অতিক্রম করিয়াছে।

আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলা যাউক। এই আমি এই জগতের কল্পনা বা সৃষ্টি করিয়াছি—কেন করিয়াছি, কি উদ্দেশে করিয়াছি? এ সমস্যার উত্তর দিতে আমিই সমর্থ, অথচ আমিও সম্যক্‌রূপে সমর্থ নহি। মনুষ্যের ভাষা আশ্রয় করিয়া ব্যবহারিক ভাবে আমি উত্তর দিই—আমি এইরূপ ইচ্ছা করিয়াছি—ইহাই আমার কামনা—ইহাই আমার লীলা—ইহাই আমার আনন্দ। অথবা ইহাই আমার মায়া—মায়াবী আমি এই ইন্দ্রজাল রচনা করিয়া আপনাকে প্রতারিত করিয়া আমোদ করিতেছি। নিতান্তই যদি মানবীয়

ভাষায় ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে হয়, আমি জগতের সৃষ্টি করিয়াছি—উহাই আমার আনন্দ—আমি এই ব্যাবহারিক কল্পিত জগতের সম্পর্কে আনন্দস্বরূপ,—আমি রসস্বরূপ,—আমি সাক্ষাৎ কামস্বরূপ। ভারতবর্ষে সমুদায় বৈষ্ণব পন্থার ভিত্তি এই খানে। অথবা বলিতে হয়—আমার মায়াকল্পিত এই জগৎব্যাপার—ইহার সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-ব্যাপারের জননী আমার মায়া। সমুদায় শাক্ত পন্থার ভিত্তি মুখ্যতঃ এই খানে। এই গেল বেদের জ্ঞানকাণ্ড। নাসদাসীয় সূক্ত ও দেবীসূক্ত যিনি অবহিত হইয়া পাঠ করিবেন, তিনি দেখিবেন ইহাই জ্ঞানকাণ্ডের প্রথম কথা ও শেষ কথা—অন্যান্য বেদান্ত বাক্য ইহারই পল্লবিত ভাষ্যমাত্র।

যাহা হউক, আমি এই শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাত্মক বিষয়রূপী জগতের সৃষ্টি করিয়াছি—তাহাকে দেশে ও কালে ছড়াইয়া দিয়াছি—এবং এই স্বকল্পিত জগতের সহিত নিজের একটা সম্পর্ক পাতাইয়াছি। এই সম্পর্ক প্রথমতঃ জ্ঞানরূপী—আমি এই জগৎকে আমার জ্ঞানের বিষয় করিয়া লইয়াছি। এই জগৎকে আমি এইরূপ জানি - ইহাই আমার চেতনা। আমি চিৎস্বরূপ—আমি চেতন এই জগৎ যে আমার জ্ঞানগম্য হইতেছে—এই জগতের সহিত আমার যে এই সম্পর্ক পাতান হইয়াছে—ইহাই আমার চেতনা—ইহাই আমার জাগরণের অবস্থা। আমি চেতন থাকিয়া এই জগৎকে সম্মুখে ও পশ্চাতে অতীতে ও ভবিষ্যতে বিস্তৃত দেখিতেছি; আমি এই জগদ্ব্যাপারের একমাত্র সাক্ষী। কেন না শব্দস্পর্শাদি পরস্পরকে জানিতে পারেনা। শব্দ স্পর্শকে জানে না, স্পর্শ রূপকে জানেনা, আমি শব্দস্পর্শ সকলকেই জানি। আমিই চেতন—আর শব্দস্পর্শাদিস্বরূপ সমস্ত অচেতন বা জড়। দ্বিতীয়তঃ এই সম্পর্ক কর্ম্মরূপী। বস্তুতঃ আমি জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়াও কেমন একটা খেয়ালের বশে আপনাকে

সেই জগতের সর্ব্বতোভাবে অধীন ধরিয়া লইয়াছি। মনে করিতেছি এই জগৎ অতি বৃহৎ, আর আমি অতি ক্ষুদ্র; এই বৃহৎ জগৎ সর্ব্বতোভাবে আমাকে অধীন রাখিয়াছে। এই বৃহৎ জগতের সহিত সর্ব্বদা আমার আদান প্রদান চলিতেছে; ইহার কিয়দংশ আমার উপাদেয়—আমি তাহা গ্রহণ করিতেছি; অপরাংশ আমার হেয়—তাহা আমি বর্জ্জন করিবার চেষ্টায় আছি। এইরূপে অনুক্ষণ জগতের সহিত আমার একটা কারবার লেনা দেনা চলিতেছে। এই কারবার লেনা দেনা সমস্তই ব্যাবহারিক কল্পিত ব্যাপার—ইহারই নাম ব্যবহার—ইহারই নামান্তর কর্ম্ম। এবং এই কর্ম্মের ফল সুখদুঃখের ভোগ। আমি মনে করিতেছি আমি জগতের সহিত নিয়ত আদানপ্রদানরূপ কর্ম্ম করিতেছি ও সেই কর্ম্মের ফল রূপে সুখদুঃখ ভোগ করিতেছি। যখন আমি এইরূপে আপনাকে জগতের অধীন মনে করিয়া জগতের সহিত আদান প্রদান—উপাদেয় গ্রহণ ও হেয় বর্জ্জন—কর্ম্মে নিযুক্ত থাকি, তখন আমার নাম হয় জীব। এই জীবরূপে আমি কর্ম্মকর্ত্তা ও কৃতকর্ম্মের ফল-ভোক্তা।

কে বলিল? কে জানে? আমি যে কর্ম্ম করিতেছি ও ফল ভোগ করিতেছি, তাহা কে জানে? আমিই জানি। আমিই ইহার দ্রষ্টা বা সাক্ষী। আমিই দেখিতেছি যে আমি জগতের সহিত আদান প্রদান কর্ম্মে নিযুক্ত আছি ও কর্ম্মফলের ভোক্তা রহিয়াছি। আমিই আমাকে ঐভাবে দেখিতেছি।

আমিই দেখি ও আমাকেই দেখি। যে আমি দেখি ও যে আমাকে দেখা যায়, উভয় আমিই এক আমি। আর দ্বিতীয় আমি কুত্রাপি নাই। বাঙ্গালা আমি পদ সংস্কৃত ভাষায় আত্মা; যে আমি দ্রষ্টা ও জ্ঞাতা তাহার নাম পরমাত্মা; যে আমি দৃশ্য ও জ্ঞেয়, তাহার নাম জীবাত্মা। উভয় আমিই এক আমি। কর্ম্ম ও তাহার ফল উভয়ই ব্যবহারমাত্র—

জগৎ যখন কল্পনা, উহাও তখন কল্পনা। যতক্ষণ আমি এই কল্পনায় ভ্রান্ত থাকিয়া আমোদ করি, ততক্ষণ আমি বদ্ধ জীব। যখন বুঝি এটা আমারই খেয়াল বা আমোদমাত্র, আমারই কল্পনা বা স্বপ্ন বা কামনা, তখন আমি মুক্ত। ইন্দ্রজালটাকে ইন্দ্রজাল বলিয়া বুঝাই মুক্তি।

জীব এক বই দুই নহে। আমিই ব্রহ্ম ও আমিই জীব। এক বই দুই নহে—একমেবাদ্বিতীয়ম্। তবে ব্যাবহারিক জগতে আমি খেয়ালের বশে মৎসদৃশ বহু জীবের কল্পনা করিয়া লই এবং সেই সকল কল্পিত জীবের সহিতও আদান প্রদান করিয়া খেয়াল পূরণ করি। এই সকল মৎসদৃশ কল্পিত জীবের সমষ্টি মানবসমাজ। এই মানবসমাজের সহিত আদানপ্রদানরূপ কর্ম্মও আমি করিয়া থাকি এবং তাহার ফলভোগও আমাকেই করিতে হয়।

জীবের পক্ষে জগতের কিয়দংশ উপাদেয় কিয়দংশ হেয়। উপাদেয় গ্রহণ ও হেয় বর্জ্জন দ্বারা জীবের জীবত্ব রক্ষিত হয়। ইহাতেই জীবের সুখ; উহা না করিতে পারিলেই জীবের দুঃখ। ঐ গ্রহণ ও ঐ বর্জ্জনই জীবের কর্ম্ম—তাহার করণে ফল সুখ ও অকরণে ফল দুঃখ। জীব সেই সুখভোগের ও দুঃখভোগের কর্ত্তা। এই সুখ-দুঃখ ভোগই ভোগ। কর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী ফল এই ভোগ।

কোন্ কর্ম্মের ফল সুখ, কোন্ কর্ম্মের ফল দুঃখ—তাহা আমি জীব ভ্রান্তির ঘোরে সর্ব্বদা বুঝিতে পারি না। যে ভ্রান্তি হইতে আমি ক্ষুদ্র জীব, সেই ভ্রান্তির—অবিদ্যার—বশে বুঝিতে পারি না। সে বিষয়ে অভিজ্ঞতা ক্রমশঃ উপার্জ্জন করিতে হয়। জগতের সহিত বহুদিন কারবার করিয়া তবে সুখ প্রাপ্তির ও দুঃখ পরিহারের উপায়—কোন্ কর্ম্ম করণীয় এবং কোন্ কর্ম্ম অকরণীয়—তাহা আমাকে বুঝিতে হয়। এই অভিজ্ঞতালাভ বহুকালসাধ্য ও বহুক্লেশসাধ্য। অনেক ঠেকিয়া তবে এই কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণে ক্ষমতা জন্মে। আধিব্যাধি দৌর্ম্মনস্য

প্রভৃতি দুঃখ সহিয়া ক্রমশঃ ঠেকিয়া শিখিতে হয়। জগতের সহিত ক্রমশঃ পরিচয় লাভ করিতে হয় এবং সেই পরিচয়ের সহিত কার্য্য ও অকার্য্য নিরূপণ করিয়া লইতে হয়। জগতের সহিত পরিচয়বৃদ্ধিসহকারে যে অভিজ্ঞতা জন্মে, তাহা একালের ভাষায় বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য। আর তদ্দ্বারা যে কার্য্য ও অকার্য্য নিরূপণ হয়, তাহা ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য। এই জন্য দাঁতন কাঠির ব্যবহার হইতে কুরুক্ষেত্রের লড়াই পর্য্যন্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের বিষয়। ধর্ম্মশাস্ত্রে দাঁতন কাঠির ব্যবহার সম্বন্ধে উপদেশ দিলে তাহাতে বিদ্রূপ করিও না।

জীবের জীবত্ব অর্থাৎ ক্ষুদ্রত্ব যখন গোড়াতেই একটা কল্পিত ভ্রান্তি হইতে উৎপন্ন, তখন জীবের বিজ্ঞানান্ধতাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। বিজ্ঞানান্ধ জীব সর্ব্বদা কার্য্য অকার্য্য বিবেচনায় অক্ষম। যাহা উপাদেয় মনে করে, তাহা সর্ব্বদা উপাদেয় নহে; যাহা হেয় মনে করে, তাহা সর্ব্বদা হেয় নহে। ঐ অজ্ঞানান্ধতার ফলে জীব আপনাকে জগৎ হইতে স্বতন্ত্র মনে করে, এবং জগৎকে আপনা হইতে স্বতন্ত্র মনে করে এবং জগতের সহিত একটা অহেতুক বিরোধের সম্পর্ক খাড়া করিয়া সর্ব্বদা প্রতারিত হয়। বস্তুতঃ ঐরূপ বিরোধ নাই। ঈশাবাস্য উপনিষৎ বলিয়াছেন "যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি, সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে"—যে দেখে সর্ব্বভূতই আমাতে বর্ত্তমান এবং আমি সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান—সে সেই জগৎ হইতে ভয় পায় না, জগৎকে ঘৃণা করে না। বৃহৎ জগৎ ক্ষুদ্র জীবকে গ্রাস করিয়া আত্মসাৎ করিতে আসিতেছে—তাহারই ফলে আধিব্যাধি—যে এইরূপ মনে করে, সেই প্রতারিত হয়। আর যে জানে আমিই জগৎকে আমার বাহিরে দূরে ও নিকটে, অতীতে ও ভবিষ্যতে, ছুড়িয়া ফেলিয়া, বিসর্জ্জন করিয়া, জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছি—জগৎ আমাকে আত্মসাৎ করিবে কি, আমিই আপনাকে প্রসারণ করিয়া জগতে পরিণত করিয়াছি,—তাহার সেই ভয় নাই।

"যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ, তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বমনুপশ্যতঃ"—যে জানে আমিই সব, তাহার আর মোহই বা কি আর শোকই বা কি?

কিন্তু জীব যতক্ষণ জীব থাকে, ততক্ষণ ইহা জানিতে পারে না। তাহাকে জগতের সহিত সাবধানে কারবার করিয়া কর্ম্ম করিতে হয়। এই কর্ম্ম যতই উৎকৃষ্ট কর্ম হউক না, এতদ্ দ্বারা কখনই নিঃশ্রেয়স-প্রাপ্তি অর্থাৎ মুক্তিলাভ ঘটিতে পারেনা। কেননা যতক্ষণ জীবত্ব, যতক্ষণ বহুত্ব, ততক্ষণই কর্ম্মের প্রয়োজন; তবে কার্য্য অকার্য্য নিরূপণ দ্বারা জগতের সহিত জীবের জীবনের সামঞ্জস্যস্থাপনে আনুকূল্য হয় মাত্র। জগৎ হইতে ভয়ের মাত্রা কমে—সুখের মাত্রা বাড়ে, দুঃখের মাত্রা কমে।

বিজ্ঞানান্ধ জীব মনে করে বৃহৎ জগৎ তাহাকে গ্রাস করিয়া আত্মসাৎ করিতে উন্মুখ; তাহার পাল্‌টা দিতে গিয়া সে জগতের যাহা কিছু উপাদেয় মনে করে, তাহাই নিজে গ্রাস করিয়া আত্মসাৎ করিতে চায়; ইহাই তাহার প্রবৃত্তি। কিন্তু এই প্রবৃত্তি দ্বারা জীবের ও জগতের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধিত হয় না। কেননা জগতের সহিত জীবের প্রকৃত সম্পর্ক অন্যরূপ। আমিই জগৎকে সৃষ্টি করিয়াছি—আপনাকে প্রসারিত করিয়া জগতে পরিণত করিয়াছি—আপনাকে জগৎ মধ্যে বিলাইয়া দিয়া এই বৃহৎ ব্যাপারের সৃষ্টি করিয়াছি। এই যে জগৎ-নির্ম্মাণ ব্যাপার, ইহা আমার ত্যাগ। আমি আমার মহত্ত্ব ত্যাগ করিয়া জগৎ বিধান করিয়াছি, এবং তজ্জন্য আপনাকে সঙ্কীর্ণ করিয়া ক্ষুদ্র জীবে পরিণত করিয়াছি। আপনার একত্বকে নষ্ট করিয়া বহুত্বে পর্য্যবসিত করিয়া জগদ্বিধানের সৃষ্টি করিয়াছি। আমি আমার বৃহত্ত্বকে সঙ্কীর্ণ করিয়া ক্ষুদ্রত্বে পরিণত করিয়া জীব সাজিয়াছি, এবং আমা হইতে স্বতন্ত্র বৃহৎ জগৎ কল্পনা করিয়া সেই জগতের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছি;—পরতন্ত্র হইয়া স্বয়ং আপনাকে জগতের নিকট বলি দিয়াছি।

এই জগন্নির্ম্মাণ একটা ত্যাগ—ত্যাগের নামান্তর যজ্ঞ। প্রকৃত পক্ষে আমিই সর্ব্বময়—"পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্"। পুরুষ অতি বৃহৎ, তাঁহার কিয়দংশ মাত্র বিশ্বভুবনরূপে বিজ্ঞানান্ধ জবের জ্ঞানগোচর; অবশিষ্ট অংশ এখনও অজ্ঞানাবৃত। "স ভূমিং সর্ব্বতো বৃত্বাত্য-তিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্"—সমস্ত বিশ্বভুবন ব্যাপিয়া তিনি আছেন—তাহা অতিক্রম করিয়া আরও দশ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত আছেন। অথবা এই বিশ্বভুবন তাঁহার এক পাদ মাত্র—বিশ্বভুবনের ওপারে যে অদৃশ্য দীপ্তিময় অমৃত লোক আছে—সেখানে তাঁহার ত্রিপাদ বর্ত্তমান। কিন্তু হইলে কি হয়—"তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ" সেই সকলের অগ্রজন্মা পুরুষকেই যজ্ঞরূপে—যজ্ঞিয় পশুরূপে—কল্পনা করিয়া প্রোক্ষিত করা হইয়াছিল—"যজ্ঞেন যজ্ঞময়জন্ত দেবাঃ"—সেই পুরুষকেই যজ্ঞিয় পশুরূপে আলম্ভন করিয়া যজ্ঞসম্পাদন হইয়াছিল; সেই যজ্ঞ হইতেই চন্দ্র সূর্য্য ইন্দ্র অগ্নি ভূমি আকাশ ব্রাহ্মণ শূদ্র প্রভৃতি সকলেই জন্মিয়াছে।

অতএব এই বিশ্বব্যাপার এক মহাযজ্ঞ—বিশ্বকর্ম্মার সম্পাদিত যজ্ঞ। যজ্ঞ ত্যাগাত্মক—যাজ্ঞিকের পরিভাষায় দেবোদ্দেশে দ্রব্যত্যাগের নাম যজ্ঞ। কাজেই জীব যে জীবত্ব গ্রহণ করিয়া জগতে উপস্থিত আছেন—"সংসার" করিতেছেন, তাহা যখন মূলেই ত্যাগ, তখন কর্ম্মমাত্রই ত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রবৃত্তির বশে জীব সবই গ্রহণ করিতে চায়—নিবৃত্তি দ্বারা প্রবৃত্তিকে নিরোধ করিতে বলিয়া তাহাকে ত্যাগ শিখাইতে হইবে। ত্যাগাত্মক কর্ম্ম দ্বারাই জীবের সহিত জগতের প্রকৃত সামঞ্জস্য সাধিত হইবে—ত্যাগাত্মক কর্ম্মই ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মই সম্পাদ্য—জীবের অন্যথা গতি নাই। এই কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই, কেন না জীব যতক্ষণ জীব, ততক্ষণ তাহাকে কর্ম্ম করিতেই হইবে—এবং ত্যাগাত্মক কর্ম্মেই জীবের জীবত্বের সার্থকতা।

ঈশোপনিষৎ এই কথাই বলিয়াছেন—"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ"—এই জগতে যাহা কিছু আছে, তাহা ঈশ্বরের ঈশিত্ব দ্বারা আচ্ছাদিত আছে। ঈশ্বরই (অর্থাৎ আমিই) আপনাকে প্রসারণ করিয়া—বিলাইয়া দিয়া—সেই সমস্ত পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছি। আমি আত্মত্যাগ দ্বারা তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছি। অতএব "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"—ত্যাগের দ্বারাই ভোগ করিবে। আমি ত্যাগ করিয়াছি বলিয়াই ইহা ভোগ্যরূপে কল্পিত হইয়াছে—ত্যাগই এখানে ভোগ—অন্যরূপে ভোগ করিতে গেলে জগৎব্যাপার বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইবে। "মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্"—এসমস্তই যখন আমার—অন্যের ইহাতে কোন অধিকারই নাই—তখন ইহাতে গৃধ্নুতার—লোভের—প্রয়োজন কি? নিজের ধনে কে নিজে লোভ করে? অতএব লোভ করিও না—ত্যাগ কর। এই ত্যাগই কর্ম্ম—এতদ্ভিন্ন অন্য কর্ত্তব্য থাকিতে পারে না। "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ"—কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াই পৃথিবীতে শত বৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে—ভাক্ত বৈরাগ্যদ্বারা জগৎকে হেয় জ্ঞান করিয়া আত্মহত্যার প্রয়োজন নাই। কর্ম্ম কর ও শতায়ুঃ হইতে ইচ্ছা কর—"এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে,"—এতদ্ভিন্ন আর অন্য কোন উপায় নাই, যাহাতে জীবকে কর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয় না। যে হেতু তুমি জীব—তোমাকে কর্ম্ম করিতেই হইবে। ত্যাগরূপ কর্ম্ম কর—তাহাতে তোমার উপরে আর নূতন কর্ম্মের প্রলেপ পড়িবে না।

মানবজাতির ধর্ম্মশাস্ত্রের ভিত্তিপত্তন এইখানে। যাবতীয় ধর্ম্ম-শাস্ত্র এই ধর্ম্মমূল স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ত্যাগই কর্ম্ম—অন্যথা কর্ম্ম নাই। কিন্তু কেন আমি ত্যাগ করিব—তাহাতে আমার লাভ কি—এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া অন্য দেশের ধর্ম্মশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্র

হাবুডুবু খাইয়াছেন। বেদপন্থীর বেদ এইখানে মূল সত্য আবিষ্কার করিয়া উত্তর দিয়াছেন। মানবজাতির জ্ঞানকাণ্ডের প্রথম কথা ও শেষ কথা যেমন নাসদাসীয় সূক্তে পাওয়া যায়—সমস্ত বেদান্ত বিদ্যা তাহাকেই পল্লবিত ও বিস্তারিত করিয়াছেন; মানবজাতির কর্ম্মকাণ্ডের প্রথম কথা ও শেষ কথা এই ঈশোপনিষদে পাওয়া যায়—ধর্ম্মশাস্ত্র ইহাই মূল ধরিয়া পল্লবিত ও বিস্তারিত হইয়াছে।

বেদবিদ্যা এইরূপে কর্ম্মমীমাংসা করিয়াছেন। জীব কর্ম্মে বাধ্য—কিন্তু সেই কর্ম্ম ত্যাগরূপী কর্ম্ম হইলেই জীবের সহিত জগতের আপাততঃ দৃশ্য বিরোধের মীমাংসা হয়; জগৎ হইতে জীবের ভয় দূরে যায়—উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধিত হয়। নিঃশ্রেয়স লাভ না হউক, পরম শ্রেয়োলাভ ঘটে। ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে এই ত্যাগাত্মক কর্ম্মের নাম যজ্ঞ। ভারতের ধর্ম্মশাস্ত্র এই যজ্ঞের কথাতেই পূর্ণ। মানবজাতির যে অংশ বেদপন্থী বলিয়া পরিচিত—সেই অংশ আবহমান কাল হইতে বিশিষ্ট আচার অনুষ্ঠান আশ্রয় করিয়া অন্যান্য জাতি হইতে আপনার বিশিষ্টভাব রক্ষা করিতেন, বেদপন্থীর বেদশাস্ত্র সেই আচার অনুষ্ঠানকে পরিবর্জ্জন করিতে উপদেশ দেন নাই, পরন্তু সেই সকল আচার অনুষ্ঠানকে অব্যাহত রাখিয়া বেদপন্থী সমাজের বিশিষ্টভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রয়াসী ছিলেন। কিন্তু সেই সকল আচার অনুষ্ঠানকে সংস্কৃত মার্জ্জিত বিশুদ্ধ করিয়া ত্যাগধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া যজ্ঞে পরিণত করিয়াছিলেন। ইহাই বেদপন্থীর সনাতন ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য। পশুযাগ সোমযাগ ইষ্টিযাগ প্রভৃতি যে সমস্ত শ্রৌত যজ্ঞের বিবরণ বেদের কর্ম্মকাণ্ডে বিহিত ও উপদিষ্ট হইয়াছে, অবহিত ভাবে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, মনুষ্যের স্বাভাবিক সহজ প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া তাহাকে ত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠা দিবার চেষ্টাতেই এই সকল অনুষ্ঠানের উদ্ভব।

মনুষ্য আপনাকে জগদ্ব্যাপারের অধীন ধরিয়া লইয়া জগদ্ব্যাপারের আপ্যায়ন জন্ম সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হয়; যজ্ঞকর্ম্মের গোঁড়ার কথা এই। কিন্তু বিজ্ঞানান্ধ মানুষ এই সর্ব্বস্বত্যাগের অর্থ করিয়া লয় আত্মহত্যা—নরহত্যা। ফলে যজ্ঞে নরাহুতি বহুস্থলে প্রচলিত আছে। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায়, বহু প্রাচীন সমাজে যজ্ঞার্থ নরপশুর প্রদান কোন না কোন আকারে প্রচলিত ছিল। বেদপন্থী সমাজেও হয়ত এক কালে নরযজ্ঞ চলিত ছিল। যজমান আপনাকে অর্পণ করিতে না পারিয়া পরের ছেলে ধরিয়া আনিয়া যজ্ঞ করিত। নিজের পরিবর্ত্তে—প্রতিভূস্বরূপে—অন্যকে অর্পণ করিত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের প্রসিদ্ধ আখ্যায়িকা অনুসারে—নরের বদলে পশু—পশুর বদলে ধান যব; পশুযাগের পরিবর্ত্তে পুরোডাশযাগের সৃষ্টি—উক্ত উপাখ্যানেই তাহার ইতিহাস পাওয়া যায়। মাতলামি করিয়া দেবতার তৃপ্তিসাধনের চেষ্টা বহু জাতির ধর্ম্মেতিহাসে দেখা যায়। সোমপানে মত্ততা জন্মে—মাদক-সেবনে স্ফূর্ত্তি হয়—দেবগণ সোমপান করিয়া স্ফূর্ত্তি করিতেন। তাঁহারা সোমপানেই ব্যাবহারিক অমরতা পাইয়াছিলেন। এই ব্যাবহারিক অমরতা লাভের জন্য, দেবত্বপ্রাপ্তির জন্য, পার্থিব জগতের মলিনতা হইতে সংস্কৃত হইয়া দ্যুতিমান্ দেবত্ব প্রাপ্তির জন্য—মনুষ্য সর্ব্বত্র লালায়িত। সোমপান করিয়া যজমান দেবত্বের জন্ম স্পর্দ্ধী হইত। এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া বেদশাস্ত্র ব্যবস্থা করিলেন—সোম-পানের অনুষ্ঠান বজায় থাক—উহা বেদপন্থী সমাজের পুরাতন অনুষ্ঠান ও বিশিষ্ট অনুষ্ঠান—কিন্তু মাতাল হইও না। চুমুকমাত্রেই পান অথবা ঘ্রাণমাত্রেই পান। পেট ভরিয়া সোমরসপানের প্রয়োজন নাই—কেননা দেবগণ যে সোমপান করেন তাহা সোমলতার রস নহে—"সোমং মন্যতে পপিবান্ যং সম্পিষন্ত্যোষধিম্, সোমং যং ব্রহ্মাণো বিদুর্ন তস্যাশ্নাতি কশ্চন"—ওষধি সোমকে পিষিয়া তাহার রসপান করিয়া লোক মনে

করে সোম পান করিলাম ; কিন্তু ব্রাহ্মণেরা যাহাকে সোম বলিয়া জানেন, তাহা কেহ পান করিতে পায় না। "সোমেনাদিত্যা বলিনঃ সোমেন পৃথিবী মহী, অথো নক্ষত্রাণামেষামুপস্থে সোম আহিতঃ"—আদিত্যগণ সেই সোমের প্রভাবে বলবান্, পৃথিবী সেই সোমের প্রভাবেই মহীয়সী, সোম এই নক্ষত্রগণের সম্মুখে স্থাপিত আছেন। "অপাম সোমমমৃতা অভূম, অগন্ম জ্যোতিরবিদাম দেবান্"—এই সোমপান করিয়া আমরা অমৃত হইয়াছি, জ্যোতিঃ পাইয়াছি, দেবগণকে জানিয়াছি। ঋষিগণ এই সোমপান করিয়া অমরতা লাভ করিতেন। উহা মাতলামি ছিল না।

যজ্ঞ শব্দটি কেবল বেদপন্থী সমাজের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপেই আবদ্ধ ছিল না। উহা ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত হইত। যজ্ঞের মৌলিক তাৎপর্য্য ত্যাগ, এই কথাটি স্মরণ রাখিলেই বেদপন্থীর শাস্ত্রে যজ্ঞের মহিমা বুঝিতে পারা যাইবে। জগতের সহিত জীবের সামঞ্জস্যসাধন যজ্ঞ দ্বারাই সম্পন্ন হয়। ত্যাগের সহিত ভোগের বিরোধকল্পনা প্রবৃত্তি-প্রবণ মনুষ্যের সহজ ধর্ম্ম। মানুষ সহজে ত্যাগ করিতে চায় না, ভোগ করিতে চায়। ঈশোপনিষৎ দেখাইয়াছেন, এই ধারণা ভ্রান্ত। ত্যাগের সহিত ভোগের বিরোধ থাকিতে পারে না। ভোগের বিষয় এই যে পরিদৃশ্যমান জগৎ, ইহা জীবের আত্মত্যাগের বা আত্মপ্রসারণেরই ফল। জীব ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে বলিয়াই এই ভোগের বিষয় সম্মুখে পাইয়াছে। অতএব ত্যাগই ভোগ। জীব জগতের অধীনতা স্বীকার করিয়া লইয়াছে বলিয়াই জগৎ ভোগের জন্য সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। এই অধীনতা একরূপ ঋণস্বীকার। জীব জগতের নিকট ঋণে আবদ্ধ। বেদপন্থীর ধর্ম্মশাস্ত্র এই ঋণের শ্রেণী-বিভাগ করিয়াছেন—মনুষ্যের নিকট ঋণ, ভূতগণের নিকট ঋণ, পিতৃগণের নিকট ঋণ, দেবগণের নিকট ঋণ, ও সর্ব্বশেষে ঋষিগণের নিকট ঋণ, এই পঞ্চবিধ ঋণ লইয়া মনুষ্যকে জীবরূপে সংসার-

যাত্রা আরম্ভ করিতে হয়। এই পঞ্চঋণ মোচনের জন্য গৃহস্থের পক্ষে পঞ্চ মহাযজ্ঞের ব্যবস্থা আছে। গৃহস্থের দৈনন্দিন অনুষ্ঠানে এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ তাহাকে জগতের নিকট আপনার ঋণের স্মরণ করাইয়া দেয়।

যজ্ঞের মাহাত্ম্যবর্ণনায় বেদপন্থীর শাস্ত্র ওতপ্রোত রহিয়াছে। বিশ্বসৃষ্টিব্যাপারই একটা যজ্ঞ—পুরুষ আপনাকে যজ্ঞরূপে কল্পিত করিয়া সৃষ্টি সংঘটন করিয়াছেন। এই বিশ্বব্যাপারই এক প্রকাণ্ড যজ্ঞ। দেবগণ এই যজ্ঞের যজমান। যজ্ঞই এই যজ্ঞের দেবতা। ত্যাগের জন্যই ত্যাগ—এই ত্যাগের অন্য কোন কামনা হইতে পারে না। "যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাঃ—দেবগণ যজ্ঞদ্বারাই—ত্যাগস্বীকারদ্বারাই—যজ্ঞরূপী দেবতার যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা এখনও যজ্ঞরূপ বস্ত্রের বয়নকর্ম্মে নিযুক্ত আছেন—এই বস্ত্রে বিশ্বভুবন আচ্ছাদিত রহিয়াছে—বিশ্বভুবনের ঘটনাবলী এই বস্ত্রের তন্তুসূত্র। "যো যজ্ঞো, বিশ্বতস্তন্তুভিস্তত একশতং দেবকর্ম্মেভিরায়তঃ, ইমে বয়ন্তি পিতরো য আযযুঃ প্র বয়াপ বয়েত্যাসতে ততে"—এই যজ্ঞরূপী বস্ত্রের তন্তুসকল সমস্ত বিশ্বে বিস্তীর্ণ হইয়া আছে—দেবগণের কর্ম্মে ইহার একশত তন্তু বিস্তৃত হইয়াছে; পিতৃগণ আগমন করিয়া তন্তুসকলদ্বারা বয়ন করিতেছেন; দৈর্ঘ্যের দিকে বয়ন কর, বিস্তারের দিকে বয়ন কর, এই বলিতে বলিতে তাঁহারা বয়নকার্য্য দেখিতেছেন। আমাদের পূর্ব্ব পিতামহগণ—ঋষিগণ ও মনুষ্যগণ—এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; "পশ্যন্ মন্যে মনসা চক্ষুসা তান্ য ইমং যজ্ঞমযজন্ত পূর্ব্বে"—পূর্ব্ববর্ত্তী যাঁহারা এই যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন, আজ যেন আমি তাঁহাদিগকে মানস চক্ষুতে দেখিতে পাইতেছি। বিশ্বকর্ম্মা এই যজ্ঞ করিয়াছিলেন—বিশ্বকর্ম্মা "যো নঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা"—যিনি আমাদের পিতা ও জনক ও বিধাতা, যিনি বিশ্বভুবন ও বিশ্বধাম জানেন, তিনিই প্রথমে এই বিশ্বনির্ম্মাণরূপ যজ্ঞ করেন—"য ইমা

বিশ্বা ভুবনানি জুহ্বদ্ ঋষির্হোতা ন্যসীদৎ পিতা নঃ”—সেই পিতা—সেই পুরাণ ঋষি—তিনিই হোতা হইয়া এই বিশ্বভুবনকে আহুতি দিতে বসিয়াছিলেন. “বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতো মুখো বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ, সং বাহুভ্যাং ধমতি সং পতত্রৈঃ, দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ”—বিশ্ব জুড়িয়া যাঁহার চক্ষু, বিশ্ব জুড়িয়া যাঁহার মুখ, বিশ্ব জুড়িয়া যাঁহার হস্তপদ, সেই একমাত্র দেব তিনি বাহু সঞ্চালন করিয়া ও পক্ষ সঞ্চালন করিয়া গমন করেন—তাহাতেই দ্যাবাপৃথিবী উৎপন্ন হয়। ঋষি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন “বিশ্বকর্ম্মন্ হবিষা বাবৃধানঃ স্বয়ং যজস্ব পৃথিবীমুত দ্যাম্”—অহে বিশ্বকর্ম্মা, তুমি বিশ্বসৃষ্টিরূপ মহাযজ্ঞ ভূলোকে ও দ্যুলোকে যে যজ্ঞ করিয়াছ, ঐ যজ্ঞে অর্পিত হব্যদ্বারা তুমি স্বয়ং বর্দ্ধিত হও। তুমি যাহা ত্যাগ করিয়াছ, তাহাই তোমার ভোগ্য হইয়াছে।

“তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ” এই মহাবাক্যের সার্থকতা এখন বুঝা যাইবে। ত্যাগই ভোগ—অতএব ত্যাগ দ্বারাই জীবের জীবত্বের সার্থকতা এবং ত্যাগাত্মক ধর্ম্মই ধর্ম্ম। এই ভিত্তির উপর বেদপন্থীর ধর্ম্মশাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত। জীবের পক্ষে, কর্ম্মত্যাগ করিবার উপায় নাই; অতএব “কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি, জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ”—কর্ম্ম করিতে করিতেই শতায়ুঃ হইবার ইচ্ছা করিবে। গীতায় ভগবান্ এই মহা-বাক্যের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়াছেন। “ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ”—কোন ব্যক্তি কর্ম্ম না করিয়া ক্ষণকালও থাকিতে পারে না। “সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ, অনেন প্রসবিষ্যধ্বম্ এষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্”—প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত প্রজা সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন—এই যজ্ঞ দ্বারাই তোমরা বৃদ্ধি পাইবে—এই যজ্ঞই তোমাদের অভীষ্ট কামনা দান করিবে, এই ত্যাগই তোমাদের ভোগ হইবে। “নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়োহ্যকর্ম্মণঃ”—নিয়ত কর্ম্ম কর, কেন না

কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করাই শ্রেয়ঃ। "যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বাকিল্বিষৈঃ"—যাঁহারা যজ্ঞের চতাবশেষ ভোজন করেন—ত্যাগের পর যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই ভোগ করেন—তাঁহারা সর্ব্বপাপপ্রমুক্ত হন। "কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবং তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্"—কর্ম্ম ব্রহ্ম হইতেই উদ্ভূত, অক্ষর ব্রহ্ম 'হইতেই ইহার উৎপত্তি, নিত্য সর্ব্বগত ব্রহ্ম যজ্ঞেই প্রতিষ্ঠিত আছেন। উপনিষৎও বলিয়াছেন—ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বম্। "তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর"—সেই জন্য আসক্তি ত্যাগ করিয়া সতত কর্ত্তব্য কর্ম্ম আচরণ কর। আসক্তি ত্যাগ করিতে হইবে—"মা গৃধঃ"। কোন্ বিষয়ে আসক্ত হইবে? সবই ত তোমার। "কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ"—কোন্ কর্ম্ম কর্ত্তব্য, কোন্ কর্ম্ম অকার্য্য, ইহা পণ্ডিতেরাও ঠিক করিতে পারেন না। "গহনা কর্ম্মণো গতিঃ"—বিজ্ঞানান্ধ জীব কর্ম্মাকর্ম্মবিবেচনায় অক্ষম। "যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ"—যাহার সমস্ত কর্ম্ম কামসঙ্কল্পবর্জ্জিত, যিনি জ্ঞানাগ্নি দ্বারা কর্ম্মকে দগ্ধ করেন, তিনিই পণ্ডিত। "গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ, যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে"—যাহার আসক্তি নাই, যাহার চিত্ত জ্ঞানে অবস্থিত, তিনি কর্ম্মবন্ধনমুক্ত। তিনি যজ্ঞার্থ কর্ম্ম আচরণ করেন; তাঁহার সমস্ত কর্ম্ম লয় পায়। "এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে"।

এই কর্ম্মাকর্ম্ম বিচারের জন্য বেদপন্থীর ধর্ম্মশাস্ত্র। ধর্ম্মশাস্ত্রমতে কর্ম্মের প্রমাণ চতুর্ব্বিধ—শ্রুতিঃ স্মৃতিঃ সদাচার আত্মনস্তুষ্টিরেব চ। শ্রুতির অর্থে বেদোক্ত সনাতনী বাণী; স্মৃতি অর্থে শ্রুত্যর্থবিৎ মহাজনকৃত শ্রুতির তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা; সদাচার অর্থে স্রোতাচার-পালক মহাজনগণের অবলম্বিত পন্থা; এবং সকলের উপর আত্মতুষ্টি—যিনি সকল তত্ত্বের হেতুভূত, সকল চরাচরের নিদান,

যিনি আপনাকে জীবরূপে পরিণত করিয়া আত্মকল্পিত জগতের উদ্দেশে আত্মাকে যজ্ঞরূপে আহুতি দিয়াছেন, তিনিই সেই বৃহৎ জগতের সহিত ক্ষুদ্র জীবের আদান প্রদান বিষয়ে জগতের সহিত জীবের সামঞ্জস্যসাধনে অন্তর্যামি-স্বরূপে জীবের কর্ত্তব্যনির্ণয়ে পরম সহায়; দুর্গম সংসারযাত্রায় যেখানে কোন আলোক পাওয়া যায় না, যেখানে শ্রুতি স্মৃতি সদাচার পর্য্যন্ত গন্তব্য নির্দ্দেশ করে না, সেখানে সেই অন্তর্যামী সহায়—"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" বলিয়া আহ্বান করিলে অন্তর্য্যামী সেখানে সাড়া না দিয়া স্থির থাকিতে পারেন না।

আমার সুদীর্ঘ ভূমিকার এইখানে উপসংহার করিলাম। আমার মনের ভিতর যে কয়টা কথা উপদ্রব করিতেছিল, ভূমিকা উপলক্ষ করিয়া তাহা বলিয়া ফেলিলাম। এই গ্রন্থের যিনি রচনাকর্ত্তা, তিনি আমাকে এই অবসর দিয়াছেন, এজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। গ্রন্থকার আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবান্। তিনি পরম শ্রদ্ধার সহিত ধর্ম্ম-শাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছেন, এবং তাঁহার আলোচনার ফল সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি যাহা কিছু বলিয়াছেন, শাস্ত্র অবলম্বন করিয়াই তাহা বলিয়াছেন। পদে পদে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া আত্মোক্তি সমর্থন করিয়াছেন। আশা করি সর্ব্বসাধারণে শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার কৃত শাস্ত্রব্যাখ্যা পাঠ করিবেন। তিনি যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, আমি হয়ত সর্ব্বত্র সে ভাষা ব্যবহার করিতাম না। এ বিষয়ে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য থাকাই বাঞ্ছনীয়—কিন্তু তাহাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। তিনি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছেন—আমি আশা করি, আজিকার এই সমাজ-বিপ্লবের দিনে সকলেই অবহিত হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শাস্ত্রের তথ্য আলোচনা করেন। যে শাশ্বতী বাণী, যে সনাতন শব্দ, যুগে যুগে

ঋষিমুখপ্রচারিত হইয়া মহাজনকর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়া এই প্রাচীন বেদপন্থী সমাজে লোকস্থিতির সহায় হইয়াছে, যে সনাতনধর্ম্ম শত সহস্র বিপ্লব হইতে এই পুরাতন সমাজকে ধারণ ও রক্ষা করিয়া আসিতেছে—বহুসংখ্যক অনার্য্য আক্রমণ হইতে ইহাকে রক্ষা করিয়া এই আর্য্য সমাজের বিশুদ্ধি ও বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়াছে, সেই বাণী, সেই শব্দ, সেই ধর্ম্ম আমাদের এই বিপত্তির দিনে পথপ্রদর্শক হউন। স্বধর্ম্মে রক্ষিত হইলেই আমরা রক্ষিত হইব—ইহা এই ক্ষুদ্র লেখকের ধ্রুব বিশ্বাস। আর যদিই বা কালপ্রেরণায় আমরা রক্ষিত না হই, যদিই বা মহাকালের চক্রতলে পিষ্ট হইয়া আমাদের জাতীয় জীবনের ধ্বংস হইবে ইহাই আমাদের নিয়তি হয়, তাহা হইলে আমাদের আর্য্য বিশিষ্ট ভাব রক্ষা করিয়াই যেন আমরা বিনষ্ট হই, ইহাই প্রার্থনা—কেন না, ভগবান্ অঙ্গুলিসঙ্কেতে উপদেশ দিতেছেন "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ।"

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

কালের স্রোত।

“अपारसंसारसमुद्रमध्ये सम्मज्जतो मे शरणं किमस्ति।

गुरो कृपालो कृपया वदैतद्विश्वेशपादाम्बुजदीर्घनौका॥”

কালের স্রোত কখন কখন প্রকাশিত ও কখন কখন অপ্রকাশিত হইতেছে।

কালের স্রোত ক্রমাগতই বহিতেছে—উহা অনাদি ও অনন্ত—বিরাম নাই, কেবলই প্রবাহিত হইতেছে। কখন বা তমসাচ্ছন্ন হইয়া অব্যক্তভাবে বহিতেছে,—সেই মহাপ্রলয়কালে—সুষুপ্তি অবস্থায় নিশ্চেষ্ট হইয়া ঐ স্রোত পরমাত্মায় লীন হইয়া অপ্রকাশিত থাকে (১); আবার কখন বা সেই তীব্র স্রোত প্রকাশমান হইয়া প্রবাহিত

---

(১) आसीदिदन्तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम्।

अप्रतर्क्यमविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सर्व्वतः॥

মনু, ১।৫

এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বসংসার এককালে গাঢ় তমসাচ্ছন্ন ছিল। তখনকার অবস্থা প্রত্যক্ষের গোচরীভূত নহে, কোন লক্ষণ দ্বারা অনুমিত নহে, তখন ইহা তর্ক ও জ্ঞানের অতীত হইয়া সর্ব্বতোভাবে যেন প্রগাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত ছিল।

হইয়া যায়, এই সময়ে, কালের স্রোত সেই পরমাত্মাকে অবলম্বন করিয়া তাঁহাতেই অধিষ্ঠিত থাকিয়া চলিয়া যাইতে থাকে (১)। এই পরমাত্মাই তাঁহার মায়াকে আশ্রয় করিয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, অসংখ্য জীব ও অসংখ্য পদার্থাদিরূপে পরিব্যক্ত হন (২), কিন্তু সে সমস্তই কালের স্রোতে ভাসমান হইয়া বহিয়া যাইতে থাকে। তৎসমস্তই ঐ মহাসত্তা পরমাত্মাকেই অবলম্বন করিয়া, তাঁহাতেই অধিষ্ঠিত থাকিয়া, অনন্তাভিমুখে বহিয়া যাইতেছে, আবার এক একটি করিয়া তাঁহাতে গিয়াই নিবৃত্ত হইতেছে (৩)। অনাদি কাল হইতে কতবারই যে এই

---

(১) সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

হে সৌম্য! অগ্রে একমাত্র অদ্বিতীয় সৎই বিদ্যমান্ ছিলেন।

(২) সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি।

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ।

তিনি বহু হইয়া সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৪।৫।

রক্ত শ্বেত কৃষ্ণবর্ণা রজঃ সত্ত্ব তমোগুণবিশিষ্টা অদ্বিতীয়া জন্মরহিতা প্রকৃতি সমান রূপা বহু প্রজার সৃষ্টি করিতেছেন।

বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।

গীতা, ১০।৪২।

এই সমস্ত জগৎ আমি একাংশ মাত্রে ধারণ করিয়া, অবস্থিতি করিতেছি।

(৩) যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি।

যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ্ ব্রহ্ম॥

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ।

যাঁহা হইতে এই ভূত সকল জন্মিতেছে, যাঁহা দ্বারা জাত বস্তু রক্ষিত হইতেছে,

প্রকার প্রলয়রূপ রাত্রিতে সমস্ত জীব মহানিদ্রায় নিদ্রিত থাকিতেছে, আবার কতবারই যে ঐ নিশার অবসান হইলে সমস্ত জীবজগৎ পুনর্ব্বার জাগ্রতভাবে প্রকাশিত হইতেছে, এবং গতনিদ্র হইয়া কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে, তাহা বলা যায় না (১)।

জীবজগতের নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, পরব্রহ্ম কিন্তু নির্ব্বিকার ও নির্লিপ্ত রহিয়াছেন, সৎস্বরূপ পুরমাত্মার কোন পরিবর্ত্তন

এবং যাহাতে সমস্ত ফিরিয়া যাইতেছে ও প্রবেশ করিতেছে, তাঁহাকেই জানিবার জন্ত ইচ্ছা কর, তিনিই ব্রহ্ম।

তদেতৎ সত্যং। যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ। তথাক্ষরাদ্বিবিধাঃ সৌম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যান্তি।

মুণ্ডকোপনিষৎ।

অতএব ইহাই সত্য। যেমন সুদীপ্ত বহ্নি হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সহস্র রূপ পরিগ্রহ করিয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়, হে সৌম্য! সেই প্রকার বিবিধ সৃষ্ট বস্তু অক্ষর হইতে জন্মগ্রহণ করে এবং তাহাতেই পুনরাগমন করে।

কত চতুরানন,　　মরি মরি যাওত,
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুনঃ,　　তোহে সমায়ত,
সাগরলহরীসমানা॥

বিদ্যাপতি।

সৃষ্টিকর্ত্তা চতুরানন ব্রহ্মাও ক্রমে ক্রমে বহুবার লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু (প্রভো!) তোমার আদি ও অন্ত নাই। (বিশ্বসংসারে) সমস্ত ভূতই সাগরলহরীর ন্যায় তোমা হইতে উৎপন্ন হইয়া পুনরায় তোমাতেই প্রবেশ করিয়া থাকে।

(১) অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বা প্রভবন্ত্যহরাগমে।

গীতা, ৮।১৮,১৯।

নাই (১); সৃষ্টিকালে তিনি তাঁহার নিজ মায়াকে আশ্রয় করিলেও, তাহাতে লিপ্ত না হইয়া, তাহা হইতে পৃথগ্‌ভাবে থাকেন (২)। কি করিয়া সেই মায়াতীত পরমতত্ত্বস্বরূপ ব্রহ্মকে অনুভব করিতে পারিব, বা তাঁহাকে বুঝিতে পারিব? তিনি বাক্যের অতীত, মনেরও অতীত, তর্ক দ্বারা তাঁহাকে বুঝিতে পারিব না, বা বুঝাইতেও পারিব না (৩)। যাঁহারা তাঁহাকে জানিয়াছেন বা বুঝিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে, জীব অগ্রসর হইয়া যতই তাঁহার নিকটবর্ত্তী হয় ততই তাঁহাকে বুঝিতে পারে, কিন্তু তাঁহার স্বরূপ সম্যগ্‌রূপে কেহই বলিতে পারে না। যাঁহারা সেই ব্রহ্মরূপ পরমানন্দসাগরে ডুবিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহাকে বিশেষরূপে বুঝিয়াছেন। কিন্তু বুঝিলে কি হয়? তাঁহারা ব্রহ্মসমুদ্রে যেমন ডুবিয়াছেন, তেমনি নিজ অস্তিত্ব হারাইয়া তাহাতেই মিশাইয়া গিয়াছেন, সুতরাং ব্রহ্মের স্বরূপ বলিবে কে?

---

(১) পরস্তস্মাত্তু ইত্যাদিঃ। গীতা, ৮।২০।

(২) প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য ইত্যাদিঃ। গীতা ৯।৮।

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিরিত্যাদিঃ। গীতা ৯।১০

(৩) ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি ন মনো।
ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ॥
অন্যদেব তদ্বিদিতাদথোঽবিদিতাদধি।
ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষাং যে নস্তদ্ব্যাচচক্ষিরে॥

কেনোপনিষৎ।

দৃষ্টি বাক্য এবং মন তথায় যাইতে পারে না, আমরা তাঁহাকে জানি না এবং যে প্রকারে অপরকে জানাইতে হয় সে উপায়ও জানি না। তিনি জ্ঞাত ও অজ্ঞাত হইতে পৃথক্ ইহাই আমরা পূর্ব্ববর্ত্তীগণের নিকট শুনিয়াছি, যাহারা আমাদিগকে তৎসম্বন্ধে বিশেষরূপে বলিয়াছেন।

কালস্রোতে ভাসমান জীব ও পদার্থ সকল কোথা হইতে কি প্রকারে আসিতেছে।

অদ্বৈত মত।

অগ্রে একমাত্র অদ্বিতীয় সৎই বিদ্যমান ছিলেন। তিনিই ব্রহ্ম, এবং তাঁহাকেই আত্মা কহিয়া থাকে। তিনি সৎ, অর্থাৎ নিত্য বর্ত্তমান এবং স্বয়ংপ্রকাশমান সত্যস্বরূপ, চিৎ অর্থাৎ চৈতন্যপদবাচ্য জ্ঞানস্বরূপ, এবং পরম আনন্দস্বরূপ, এইজন্য তাঁহাকে সচ্চিদানন্দ কহিয়া থাকে। তিনি অখণ্ড, অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন, এবং অদ্বিতীয়। সৎ বা অসৎরূপে অনির্ণেয় পদার্থবিশেষকে অজ্ঞান কহে; আমরা সাধারণতঃ ইহাকেই মায়া বলিয়া থাকি। "যেমন রজ্জুকে ভ্রমবশতঃ সর্প মনে করিয়া প্রকৃত বস্তুতে অবস্তুর আরোপ হয়, তেমনই সচ্চিদানন্দ অদ্বয় ব্রহ্মবস্তুতে অজ্ঞানতঃ যাবতীয় জড় অবস্তু আরোপিত হইয়াছে। যাহা কিছু বিদ্যমান তাহা ব্রহ্ম, কিন্তু ব্রহ্ম সম্মুখে থাকিলেও ভ্রমবশতঃ ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিতেছি না। অজ্ঞানই এই ভ্রান্তির কারণ। একটি রজ্জু পড়িয়া আছে, ভ্রমবশতঃ আমি যদি উহাকে সর্প মনে করি, তাহা হইলে রজ্জু প্রকৃত প্রস্তাবে সর্প না হইলেও আমার নিকট ভ্রমাবসান পর্য্যন্ত উহা সর্পই রহিল। যেমন রজ্জুতে সর্প দেখি, ভ্রমবশতঃ ব্রহ্মেও সেইরূপ জগৎ দেখিতে পাই; এই ভ্রম যত দিন না দূরীভূত হইবে, ততদিন আমি জগৎই দেখিব, ব্রহ্ম দেখিব না। তত্ত্বজ্ঞান এই ভ্রমের নিবারক। যেমন নিদ্রাভঙ্গ হইলে স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থগুলি অলীক বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তেমনি তত্ত্বজ্ঞান উপস্থিত হইলে জগতের যাবতীয় পদার্থ একে একে বিলীন হইয়া যায়, এবং তখন কেবল এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মমাত্রই অবশিষ্ট থাকেন।

তখন জগৎ থাকিবে না, তবে জগৎ যাহাতে আরোপিত হইয়াছে কেবল তিনিই থাকিবেন।"

"যাহা আছে তাহাই সৎ, যাহার অস্তিত্ব নাই তাহা অসৎ। *পরিদৃশ্যমান জগৎ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতি সমগ্রই অসৎ, অর্থাৎ* ইহাদের অস্তিত্ব নাই; অনন্তসত্তাময়, অপারআনন্দময়, অসীমজ্ঞানময় ব্রহ্ম সৎবস্তু, গুণের অতীত ও নির্ব্বিকার; কিন্তু মায়াযুক্ত ও ব্যক্ত হইয়া সগুণ, সর্ব্বশক্তিমান্ ও অনন্ত ঈশ্বর সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। ব্রহ্ম ও ঈশ্বর স্বতন্ত্র পদার্থ নহেন, কিম্বা একের পরে অপরের উৎপত্তি হয় নাই; দুইই এক, কেবল অব্যক্ত ও ব্যক্ত দুইটি ভাবমাত্র। ব্যক্তভাবে ইনি নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা ও সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর এবং অব্যক্তভাবে ইনি মনের অতীত, বাক্যের অতীত, একমাত্র-সত্তা ব্রহ্ম। অব্যক্ত ব্রহ্মে সৎ চিৎ আনন্দ এই তিনটি ভাব বিদ্যমান আছে। সৎভাবে ইনি সত্তার পরিচয় প্রদান করিতেছেন, চিৎভাবে চৈতন্যময়রূপে প্রকাশিত হইতেছেন, এবং আনন্দভাবে ইনি আনন্দাত্মা বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছেন। এই তিনটি ভাব ভিন্ন ব্রহ্মে আর কোন ভাব নাই। নিখিল ব্রহ্মাণ্ড তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া গেলে, অবশেষে এই তিন ভাবাপন্ন ও এই তিন ভাবময় পদার্থে আসিয়া উপস্থিত হওয়া যায়; ইহাই ব্রহ্মস্বরূপ। জগতের যাবতীয় পদার্থ একমাত্র ব্রহ্মে উপনীত হয়; বিশ্বস্থ পদার্থে যে সৎ চিৎ আনন্দ এই তিনটি ভাবের আভাস পাওয়া যায়, উপরি উক্ত ঘটনাই তাহার কারণ। এই তিন ভাবের আভাস, বিশ্বস্থ প্রত্যেক পদার্থেই অল্প বা অধিক পরিমাণে আছে।"

অজ্ঞান অবস্থাভেদে মায়া ও অবিদ্যা বলিয়া উক্ত হয়। উল্লিখিত মায়াতে পরব্রহ্মের যে প্রতিবিম্ব পতিত হয়, সেই প্রতিফলিত চিদাত্মা বা চৈতন্য উক্ত মায়াকে স্ববশে আনয়ন করিয়া সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্,

সর্ব্বনিয়ন্তা, ও সর্ব্বান্তর্যামী ঈশ্বর হন। অবিদ্যাতে যে পরব্রহ্মের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, সেই প্রতিবিম্বিত চিদাত্মা ঐ অবিদ্যার বশবর্ত্তী হইয়া জীবপদবাচ্য হন।

"জীব অবিদ্যার বশ, মায়া ঈশ্বরের বশ। অবিদ্যার বশ বলিয়া জীবের ভ্রম হয়, সুতরাং এক ব্রহ্মে নানাবিধ রূপ দেখিতে পায়; ঈশ্বর সেরূপ দেখেন না, বরং তিনি মায়াকে স্ববশে আনয়ন করিয়া সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বজ্ঞ হন, এবং তাঁহার ইচ্ছায় চরাচর জগৎ সৃষ্ট হয়। ব্রহ্ম দেশকালের অতীত ও নিরপেক্ষ সৎ বস্তু; মায়া ব্রহ্মের সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান আছে। মায়া ও ব্রহ্ম এই উভয়ের সম্মিলনে ঈশ্বর, সুতরাং ঈশ্বরও অনাদি ও অনন্তভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন। মায়া থাকিলে ভ্রান্তি থাকে, সুতরাং এই ভ্রান্তিপ্রসূত জগৎও ভ্রান্তের নিকট চিরকাল রহিয়াছে। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ এবং ইচ্ছাময়, তিনি এই জগতের স্রষ্টা। ঈশ্বর কোনও উপাদান দিয়া জগৎ নির্ম্মাণ করেন নাই। জগতের যদি কোনও উপাদান থাকে, তবে তাহা তিনি। তাঁহা হইতেই জগতের উৎপত্তি হইতেছে, এবং তিনিই এই জগৎ উৎপাদন করিতেছেন। কোন পদার্থ নির্ম্মিত হইলে, আমরা সচরাচর দেখিতে পাই. তিনটি বস্তু বর্ত্তমান থাকে, নির্ম্মাতা, নির্ম্মাণের উপাদান এবং নির্ম্মিত পদার্থ। ঈশ্বরকর্ত্তৃক জগৎসৃষ্টি ঐ প্রকার নহে, তিনিই স্রষ্টা, তিনিই সৃষ্টির উপাদান, এবং তিনিই সৃষ্ট পদার্থ।"

উপরি উক্ত অবিদ্যার নির্ম্মলতা বা মালিন্যের তারতম্যপ্রযুক্ত নানা প্রকার প্রতিবিম্বসমন্বিত হইয়া ঐ জীব দেব, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি জঙ্গম, এবং প্রস্তর, ধাতু, সলিল প্রভৃতি স্থাবরের নানা প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অবিদ্যা সেই জীবের কারণ-শরীর হন, সেই কারণশরীরাভিমানী জীব প্রাজ্ঞ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন, জীবের উপভোগের নিমিত্ত ঈশ্বর অপরিমিত শক্তি-

বিশিষ্ট মায়াসহকারে নামরূপাত্মক নিখিল প্রপঞ্চকে প্রথমতঃ বুদ্ধিতে কল্পনা করিয়া "এইরূপ করাই কর্ত্তব্য" এই প্রকার সংকল্প করেন, পরে সেই মায়াবিশিষ্ট আত্মা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হয়। এই আকাশাদি পাঁচটি পদার্থকে পঞ্চ মহাভূত বা পঞ্চ তন্মাত্র কহে।

উল্লিখিত এক একটি পঞ্চভূতের এক একটি নির্ম্মলাংশ হইতে যথাক্রমে শ্রবণ, ত্বক্, দর্শন, রসনা ও ঘ্রাণ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। অন্তঃকরণ ঐ পঞ্চ অংশের সমষ্টি, অর্থাৎ ঐ পঞ্চভূতের পঞ্চ অংশ মিলিত হইলে তাহা দ্বারা অন্তঃকরণের উৎপত্তি হয়; অন্তঃকরণ, বৃত্তি ও অবস্থাভেদে দ্বিবিধ, যথা, মন ও বুদ্ধি। সংশয়াত্মিকা অর্থাৎ সংকল্পবিকল্পাত্মিকা বৃত্তির নাম মন, এবং নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তির নাম বুদ্ধি। উপরি উক্ত প্রত্যেক পঞ্চ সূক্ষ্মভূতের প্রত্যেক মলিনাংশপঞ্চক হইতে যথাক্রমে বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু এবং উপস্থরূপ পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় যথাক্রমে বচন, আদান, গমন, ত্যাগ ও আনন্দ এই পাঁচটী কর্ম্ম সম্পন্ন করে।

উক্ত পাঞ্চভৌতিক মলিনাংশ একত্রিত হইলে প্রাণ সমুৎপন্ন হয়। ঐ প্রাণবায়ু শরীরাভ্যন্তরে কার্য্য ও স্থানভেদে পঞ্চপ্রকারে প্রকাশ পায়, যথা, প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান। ঊর্দ্ধে গমনশীল যে বায়ু হৃদয়ে অবস্থান করে এবং শ্বাসপ্রশ্বাসরূপে নাসিকাদি পথে যাতায়াত করে, এবং যাহা দ্বারা ভুক্ত ও পীত দ্রব্য উদরমধ্যে প্রেরিত হয়, তাহার নাম প্রাণবায়ু; অধোগমনশীল যে বায়ু মলাশয়ে অবস্থান করিয়া পায়ু প্রভৃতি পথে মলমূত্রশুক্রাদিকে বহির্নিঃসারণ করে, তাহাকে অপান বায়ু; যে বায়ু উদরে অবস্থান করিয়া ভুক্ত ও পীত দ্রব্যাদির পাকাদি কার্য্য সম্পাদন করে, তাহাকে সমান বায়ু; ঊর্দ্ধে গমনশীল যে বায়ু জীবের কণ্ঠদেশে অবস্থান করিয়া ভাষণ ও গীতাদি

ক্রিয়া সম্পন্ন করে, তাহাকে উদান বায়ু ; এবং সর্ব্ব নাড়ীতে গমনশীল যে বায়ু সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া রহিয়াছে ও স্নায়ুপ্রভৃতির কার্য্য সাধন করে, তাহাকে ব্যানবায়ু বলে। ব্যানবায়ু স্বেদনিঃসারণ, শোণিতাদি সংবাহন, এবং গতি, অপক্ষেপণ, উৎক্ষেপণ, নিমেষ ও উন্মেষাদি কার্য্য সম্পাদন করে। এই পঞ্চ বায়ুই জীবনস্বরূপে শরীরে অবস্থান করিতেছে। আমাদের শরীরে অসংখ্য নাড়ী আছে, তাহার মধ্যে চতুর্দ্দশটি প্রধান, তন্মধ্যে আবার ইরা, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিনটিই প্রধানতম। এই সমস্ত নাড়ীপথেই শরীরে বায়ু চলাচল করিয়া থাকে।

উল্লিখিত শ্রবণাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্‌পাণি প্রভৃতি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, প্রাণাদি পঞ্চবায়ু, মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশের সমবায়ে যে সূক্ষ্মশরীর উৎপন্ন হয়, তাহাকেই লিঙ্গশরীর কহে ; এই লিঙ্গশরীর ইহলোক ও পরলোকগামী এবং মুক্তি পর্য্যন্ত স্থায়ী। মলিনসত্বপ্রধানা অবিদ্যার আশ্রয়ীভূত এই এক একটি লিঙ্গশরীরের অভিমানী জীবকে তৈজস বলিয়া থাকে, এবং বিশুদ্ধসত্বপ্রধানা মায়ার অধিষ্ঠাতা ঈশ্বর লিঙ্গ-শরীরের অভিমানী হইলে হিরণ্যগর্ভ নামে অভিহিত হন (১)। ঐ

---

(১) हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे
भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्।
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां
कस्मै देवाय हविषा विधेम॥

ऋग्वेद, १०म मण्डल, १२१ सूक्त।

অগ্রে কেবল হিরণ্যগর্ভ ছিলেন। তিনি জাতমাত্র সর্ব্বভূতের অধীশ্বর হইলেন। তিনি অন্তরীক্ষ, দ্যুলোক এবং এই পৃথিবী ধারণ করিয়াছিলেন আমরা এবম্ভূত "ক" নামক পরমদেবকে হবিঃপ্রদান করিয়া অর্চ্চনা করি।

উভয়েই লিঙ্গশরীরের অভিমানী বিধায়, একরূপ হইলেও ইহাদের বিভিন্নতা আছে; লিঙ্গশরীরোপাধিবিশিষ্ট হিরণ্যগর্ভরূপী ঈশ্বর, জীব তাঁহা হইতে পৃথক্ নহে, এইরূপ জানেন বলিয়া, তাঁহাকে সমষ্টি বলে, আর সেই জ্ঞানের অভাববশতঃ জীব ব্যষ্টি নামে পরিগণিত হয়। হিরণ্যগর্ভ পুরুষ সমস্ত জীবকে আপনার সহিত অভেদরূপে জানেন, এবং জীবগণ পরস্পর পরস্পরকে পৃথক্‌রূপে জ্ঞান করে।

পঞ্চ সূক্ষ্মভূতের নানাপ্রকার বিমিশ্রণের দ্বারা পঞ্চ স্থূলভূতের উৎপত্তি হইয়াছে। এই পঞ্চ স্থূলভূত হইতে ভূঃ ভূবঃ প্রভৃতি চতুর্দ্দশ লোকের, এবং তৈজস জীবের ভোগার্থ অন্নপানীয়াদি ভোগ্যবস্তুর, এবং সেই সকল ভোগ্যদ্রব্যের উপযুক্ত স্থূলশরীরের উৎপত্তি হইয়াছে। স্থূলশরীর চতুর্ব্বিধ, যথা, জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ। জরায়ুতে যে শরীরের উৎপত্তি হয়, তাহাকে জরায়ুজ কহে, যথা, মনুষ্য, পশু ইত্যাদি। পক্ষী ও সর্পাদি অণ্ডজ, মশক বৃশ্চিকাদি স্বেদজ এবং বৃক্ষ লতাদি, যাহাদের শরীর মৃত্তিকা ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উৎপন্ন হয়, তাহারা উদ্ভিজ্জ (১)। এই স্থূলদেহসমষ্টির অভিমানীকে বৈশ্বানর বা বিরাট্ পুরুষ এবং এক এক ব্যষ্টি স্থূল শরীরাভিমানী জীবকে বিশ্ব কহে। অন্নপানীয়াদির দ্বারা এই স্থূল দেহের কান্তি ও পুষ্টি হয়, এই জন্য ইহাকে অন্নময় কোষ বলে (২)।

---

(১) ধাতু প্রস্তরাদিকেও এই শ্রেণীর অন্তর্গত বলিতে পারা যায়। ইহারা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া মৃত্তিকা ভেদ করে। ইহাদেরও জীবন আছে। মৃত্তিকা হইতে অথবা মূল দেহ হইতে কোন অংশ বিচ্ছিন্ন হইলে তাহার জীবন নষ্ট হইয়া থাকে।

(২) উপরে সৃষ্টিসম্বন্ধে যাহা লিখিত হইল তাহা বেদান্ত বা উত্তরমীমাংসার অদ্বৈত মত।

দ্বৈতাদ্বৈত মত।

কোন কোন দার্শনিক পণ্ডিতের মতে অপরিচ্ছিন্ন-দৃক্-শক্তিমান্, জীবাতিরিক্ত, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান্, লোকাতীত, পরমপুরুষ পরমেশ্বর বিদ্যমান আছেন (১)। এতদ্ব্যতীত পুরুষ এবং চতুর্বিংশতি তত্ত্ব আছে, যথা, মূলপ্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্র, চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাগাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন, এবং আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত। পুরুষ এবং এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব হইতেই এই জগৎ।

পুরুষ শরীরভেদে নানা, অর্থাৎ এক একটি শরীরের অধিষ্ঠাতা আত্মাস্বরূপ এক একটি পুরুষ আছেন, তিনি নিত্য, সত্ত্বাদি-ত্রিগুণশূন্য, চেতন অর্থাৎ স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ, বিবেকী, সাক্ষী এবং দ্রষ্টা। প্রকৃতি পুরুষকে আপনার অবস্থা ও রূপাদি দেখাইয়া থাকেন, এই জন্য পুরুষ সাক্ষী; যে দেখিতে পারে, তাহাকেই দেখাইয়া থাকে, পুরুষ চেতন বলিয়া দেখিতে পারেন, সুতরাং পুরুষ দ্রষ্টা। প্রকৃতি প্রভৃতি অচেতন, তাহাদিগের দেখিবার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং তাহারা সাক্ষী বা দ্রষ্টা নহে। পুরুষ কৈবল্যযুক্ত, কারণ কৈবল্য অর্থাৎ দুঃখত্রয়ের অত্যন্ত বিনাশরূপ মুক্তি তাঁহাতে আছে; তিনি ত্রিগুণস্বরূপ না হওয়াতে দুঃখ তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে, উহা আরোপিত ধর্ম্ম, সুতরাং তাহা হইতে তাঁহার মুক্তি হয়। স্ফটিকমণি স্বভাবতঃ রক্তবর্ণ নহে, কিন্তু জবাকুসুমের নিকট থাকিলেই রক্তবর্ণ বোধ হয়, এবং

---

(১) পতঞ্জলি প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণ পরমপুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। কেহ কেহ বলেন সাংখ্যকার কপিলদেব উঁহার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, কাহারও কাহারও মতে তিনি স্বীকার করেন নাই। এই অধ্যায়ে সৃষ্টি প্রভৃতি সম্বন্ধে যে মত লিখিত হইল তাহা সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনের দ্বৈতাদ্বৈত মত।

উহা সরাইয়া লইলেই স্ফটিকের স্বাভাবিক বর্ণ প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ পুরুষের দুঃখ, প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধবশতঃ, আরোপিত হইয়া থাকে, প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ দূর হইলেই দুঃখনিবৃত্তি হয়, এই কারণেই পুরুষ মধ্যস্থ, অর্থাৎ দুঃখে দ্বেষ বা সুখে অনুরাগ তাঁহার স্বাভাবিক নহে, সুখ দুঃখ তাঁহার সহিত নিঃসম্পর্ক, নিঃসম্পর্ক বস্তুর উপরে দ্বেষ বা অনুরাগ হয় না, এই জন্য তাঁহাকে উদাসীনও কহিয়া থাকে। পুরুষের পরিণাম বা পরিবর্ত্তন নাই। পুরুষ কর্ত্তৃত্বশূন্য, তিনি কোন কার্য্য করেন না, কিন্তু তিনি কর্ত্তা বলিয়া প্রতীয়মান হন, সুতরাং "আমি" কর্ত্তা বলিয়া যে জ্ঞান হয় তাহা ভ্রম (১)।

পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়েই অনাদি। প্রকৃতি সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা স্বরূপ, ইহা নিত্য, অনাশ্রিত অর্থাৎ কোন আশ্রয় অবলম্বন না করিয়াই অবস্থিত, অসংযুক্ত, অবিভক্ত, স্বতন্ত্র, অর্থাৎ অহঙ্কারাদি তত্ত্বান্তরের সাহায্য ব্যতিরেকেই স্বকার্য্যকরণে সমর্থ, অচেতন, জড়াত্মক, এবং পরিণামী, অর্থাৎ পুরুষের অধিষ্ঠানসম্বন্ধবশতঃ প্রকৃতির মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি পরিণাম বা পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে (২)।

"পুরুষের চৈতন্যাংশ প্রকৃতিতে প্রতিফলিত হয়, এ জন্য প্রকৃতি চেতন বলিয়া প্রতীয়মান হন, কিন্তু বস্তুতঃ চেতন নহেন। এই অচেতন জড়ময়ী প্রকৃতি জগতের কর্ত্রী, কিন্তু ইহার নির্ম্মাত্রী নহেন, তিনি নিজে পরিবর্ত্তিত হইয়া মহত্তত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চ স্থূল মহাভূত পর্য্যন্ত নিখিল বিশ্বের উৎপত্তি করেন। এই পরিবর্ত্তনপ্রবাহই জগৎ এবং প্রকৃতি ইহার কর্ত্রী, প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব কুম্ভকারের

---

(১) प्रकृतेः क्रियमाणानीत्यादिः। गीता, ३।२७।

(২) प्रकृतिं पुरुषञ्चैवेत्यादिः। गीता, १३।१९।

ঘটনির্ম্মাণের কর্তৃত্বের ন্যায় নহে। কিন্তু যে শক্তি বর্ত্তমান আছে বলিয়া, মৃত্তিকা ঘটরূপে পরিণত হইতে পারে, প্রকৃতি সেই শক্তি অংশের কর্ত্রী, অর্থাৎ পরিবর্ত্তিত হইতে পারেন এই শক্তিটুকুই প্রকৃতির কর্তৃত্ব। প্রকৃতি এক জড়ময়ী মৌলিক শক্তি এবং এই বিশ্বচরাচর সেই শক্তির পরিণাম। আমরা যদি বিশ্বের সমস্ত বস্তুকে একে একে বিশ্লেষণ করিয়া যাই, তাহা হইলে দেখিতে পাইব সর্ব্বশেষে একটিমাত্র শক্তি অবশিষ্ট থাকিবে; ইহাই মূলপ্রকৃতি। এই শক্তিরূপা মূলপ্রকৃতি চৈতন্য ভিন্ন প্রকাশিত হন না। জগতের জন্য শক্তি ও চৈতন্য এই উভয়ের প্রয়োজন; শক্তি (প্রকৃতি) কর্ত্রী, চৈতন্য (পুরুষ) প্রকাশক। প্রকৃতি আপনার গুণে পরিবর্ত্তিত হন, এই পরিবর্ত্তনের জন্য ঐশ্বরিক কর্তৃত্বের আবশ্যক হয় না। জগৎ পরিবর্ত্তিত হইতেছে, সৃষ্ট হইতেছে না। মূল প্রকৃতির পরিবর্ত্তনেই জগতের নানাবিধ রূপ দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং জগতের সৃষ্টি নাই, পরিবর্ত্তন আছে। এই প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর সমীপস্থ বা যুক্ত হইয়া জগৎ ও তদানুষঙ্গিক সুখ দুঃখাদির উৎপত্তি করেন। পুরুষ নিজে নির্লিপ্ত তথাপি প্রকৃতিসম্বলিত হইয়া লিপ্তের ন্যায় সুখদুঃখাদি ভোগ করেন (১)।"

পঞ্চ মহাভূত হইতে মহত্তত্ব পর্য্যন্ত জড়ত্বহেতু নিকৃষ্টা যে প্রকৃতি, যাহা মায়ানামে অভিহিতা শক্তি, তাহাকে অপরা প্রকৃতি বলে, এবং জীবরূপা প্রকৃষ্টা প্রকৃতি, যাহা এই জগৎকে ধারণ করিতেছে, তাহাকেই পরা প্রকৃতি বলে। এই প্রকৃতিদ্বয় হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু পরমেশ্বর এই জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের কারণ, তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই, মণিসমূহ যেমন সূত্রে গ্রথিত থাকে, তদ্রূপ সমস্ত

(১) কার্য্যকারণকর্তৃত্বে ইত্যাদি। গীতা, ১৩।২০-২১।

জগৎ তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করিতেছে (১)। তাঁহারই অধিষ্ঠানবশতঃ প্রকৃতি এই সচরাচর জগৎ প্রসব করিয়া থাকেন এবং সেই জন্যই এই জগৎ পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, অর্থাৎ নানারূপে বারম্বার উৎপন্ন হইয়া থাকে (২)।

দ্বৈত মত।

কেহ কেহ বলেন (৩) তিনটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বস্তু আছে, যথা, স্রষ্টা, সৃষ্টির উপাদান এবং সৃষ্ট বস্তু। অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন পরমেশ্বর বা পরমাত্মা স্রষ্টা, পরমাণু তাঁহার এই সৃষ্টির উপাদান এবং জগৎ সৃষ্ট বস্তু। পরমেশ্বরের ভোগসাধন শরীর ও সুখদুঃখদ্বেষাদি কিছুই নাই, কেবল নিত্যজ্ঞান, ইচ্ছা ও যত্নাদি কয়েকটি গুণ আছে। বিশ্বের প্রত্যেক বস্তুই বিভাজ্য; প্রত্যেক বস্তুকেই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র করিয়া বিভাগ করিতে পারা যায়, কিন্তু এই বিভাগ কার্য্যেরও শেষ আছে; কোন এক অবস্থায় উপস্থিত হইলে বস্তুকে আর বিভাগ করা যায় না, ইহাকেই পরমাণু বলে, এবং এই অবস্থার নামই পারমাণবিক অবস্থা। পরমাণু অবিনাশী ও অনাদি। এক একটি শরীরের অধিষ্ঠাতাস্বরূপ এক একটি জীবাত্মা আছেন, উহা অনাদি ও অনন্ত। জীবাত্মা শরীর হইতে পৃথক্, তিনি আপন কর্ম্মফল অনুসারে নূতন নূতন শরীর ধারণ করিয়া জন্ম হইতে জন্মান্তরগ্রহণপূর্ব্বক সুখদুঃখাদি ভোগ করেন। কর্ম্মফল ক্ষয় হইয়া গেলে তিনি আর সেইরূপ জন্মগ্রহণ করেন না, তখন সুখদুঃখবিবর্জ্জিত হইয়া অবস্থান করেন।

---

(১) ভূমিরাপোঽনলোবায়ুরিত্যাদি। গীতা, ৭।৪-৭।

(২) ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিরিত্যাদিঃ। গীতা, ৯।১০।

(৩) ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের দ্বৈত মত।

আর্য্যদর্শনশাস্ত্রের তিনটি মত।

সৃষ্টিসম্বন্ধে উপরে দর্শনের যে তিনটি মত লিখিত হইল, তাহাদিগকে দার্শনিক ভাষায় ক্রমান্বয়ে বিবর্ত্তবাদ, পরিণামবাদ ও আরম্ভবাদ কহিয়া থাকে। উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তের বিবর্ত্তবাদ, সাংখ্য ও পাতঞ্জলের পরিণামবাদ এবং বৈশেষিক ও ন্যায়ের আরম্ভবাদ।

বিবর্ত্তবাদ।

রজ্জুতে সর্পভ্রমের যে দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে বিবর্ত্তবাদীর মত বেশ বুঝিতে পারা যাইবে। পতিত রজ্জু হইতে সর্পভ্রমে দূরে পলায়ন করিলাম, ইহা একটি ভ্রান্তির কার্য্য। যতক্ষণ আমার ঐ প্রকার ভ্রম থাকিল, ততক্ষণ রজ্জু আমার নিকট রজ্জু থাকিল না, ইহা সর্প হইল। সর্প ও রজ্জু এক পদার্থ নহে, একটি অপরটিতে পরিণত হয় নাই, বা ঐ উভয়ের উপাদানও এক নহে, কেবলমাত্র একটিতে অপরের বোধ হইল। এই একের উপরে অপরের আরোপকে বিবর্ত্তন বলে। বিবর্ত্তবাদিগণ বলেন যে, যাহা কিছু আমাদের অনুভূতির বিষয় তৎসমস্তই বিবর্ত্তনের নিয়মানুসারে এক বস্তুতে অপর বস্তুর আরোপ হইলে আমাদের অনুভূত হয়। আমরা যাহা কিছু অনুভব করিতেছি, সমস্তই ভ্রান্তিপ্রসূত, সমস্তই ব্রহ্মে আরোপিত হইয়া ভ্রান্তি বা অজ্ঞান হইতে ঐ প্রকার অনুভূত হইতেছে। আমি যদি ঐ রজ্জু হইতে পলায়ন করি, বা উহাকে আর বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া না দেখি, তাহা হইলে আমার সেই সর্পভ্রম রহিয়া গেল, কিন্তু যদি উহাকে বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া রজ্জু বলিয়া বুঝিতে পারি, তাহা হইলে ঐ রজ্জুতে সর্পভ্রম দূরীভূত হইয়া রজ্জুকে রজ্জু বলিয়াই বুঝিলাম, তখনই আমার রজ্জুসম্বন্ধে অজ্ঞান দূর হইয়া প্রকৃত

জ্ঞান জন্মিল। এইরূপভাবে যখন ভ্রম ঘুচিয়া গিয়া এই জগতের যাবতীয় পদার্থকে ব্রহ্মে আরোপিত বলিয়া বুঝিতে পারিব, এই জগৎকে ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিব, তখনই আমার প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হইবে, তাহা হইলে সকলেতেই আমার ব্রহ্মজ্ঞান হইবে, সমস্তই ব্রহ্ম বলিয়া আমার উপলব্ধি হইবে, তখন আর আমার নিকট তোমার আমার এই নিখিল বস্তুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিবে না, সকলকেই "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বলিয়া আমার অনুভব হইবে, তখনই আমি "সোঽহম্" বলিতে পারিব, আমি ও ব্রহ্ম এক তাহাই বলিবার অধিকারী হইব।

কেহ পতিত রজ্জু দেখিয়া সর্পভ্রমে পলায়ন করিতেছে, তাহাকে যদি কেহ বলে যে উহা সর্প নহে রজ্জু, কিন্তু সে উহা ভাল করিয়া না দেখিয়া, উহা বাস্তবিক কি তাহা না বুঝিয়া, যদি কেবল মুখে বলে যে উহা রজ্জু উহা সর্প নহে, অথচ মনে মনে তাহার উহাতে সর্পজ্ঞানই থাকে, নিকটে যাইতেও ভয় করে, তাহা হইলে তাহার যেমন মিথ্যা কথা বলা হয়; সেইরূপ যদি কেহ, সে নিজে কে তাহা না জানিয়া, ব্রহ্ম কি তাহা না বুঝিয়া, জগৎ কি তাহা পর্য্যালোচনা না করিয়া, এই জগৎকে মিথ্যা বলে এবং সেও যাহা পরব্রহ্মও তাহাই, ইহাই বলে, তাহা হইলে তাহারও মিথ্যা কথা বলা হইল। সে আপনাকে স্বতন্ত্র দেখিতেছে, জগৎকে জগৎই দেখিতেছে, ইহাকেই সত্য বলিয়া বুঝিতেছে, মিথ্যা বলিয়া অনুভব করিতেছে না, ব্রহ্ম কি তাহা বুঝিতেছে না, অথচ বলিতেছে জগৎ মিথ্যা, সেই কেবল সত্যপদার্থ এবং সেও যাহা ব্রহ্মও তাহাই, তাহা হইলে তাহার মিথ্যা ভিন্ন আর কি বলা হইল? যাহা বুঝিতেছে তাহা না বলিয়া তাহার অন্যরকম বলা হইল। কিন্তু যদি ঐ সর্পভ্রান্ত ব্যক্তি বলে যে, কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়াছে যে, উহা সর্প নহে রজ্জু, তাহা হইলে তাহার মিথ্যা কথা বলা হইল না, এবং সে যদি ঐ ব্যক্তির বাক্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাহার কিম্বা

অন্তের উপদেশানুযায়ী রজ্জুকে উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করে, সর্প ও রজ্জুর কি কি লক্ষণ এবং তাহাদের কি প্রভেদ তাহা পর্য্যালোচনা করে, তাহা হইলে তাহার যেমন ভ্রম ঘুচিয়া যায়, সেইরূপ ঐ জগৎভ্রান্ত ব্যক্তি যদি বলে যে, শাস্ত্র বলিয়াছে জগৎ মিথ্যা, তাহা হইলে তাহার মিথ্যা কথা বলা হইল না, এবং সে যদি ঐ শাস্ত্রবাক্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া গুরুর উপদেশানুযায়ী জগৎ কি, ব্রহ্ম কি, সে নিজে কে, এই সমস্ত উত্তমরূপে জানিবার চেষ্টা করে ও তদনুযায়ী কার্য্য করে এবং ঐ সকলের স্বরূপ বুঝিতে পারে, তাহা হইলেই তাহার ভ্রম ঘুচিয়া যায়, তখন ব্রহ্মকে আর জগৎ বলিয়া তাহার অনুভব হয় না, তাহার ব্রহ্মজ্ঞান হয়, সে ব্রহ্মকে ব্রহ্ম বলিয়া মানস চক্ষুতে দেখিতে পায়, বুঝিতে পারে, এবং তখন সে বলিতে পারে "সোঽহম্", "আমিই সেই ব্রহ্ম"।

ভ্রম কি, তাহা আরও সহজে বুঝিবার চেষ্টা করা যাক। একটি ফুল আছে, তাহা আছে কি করিয়া বলিলাম? আলোক দ্বারা উহার প্রতিকৃতি আমার চক্ষুতে পতিত হইল, তাহাতে যদি আমার মন সংযোজিত হইল, তাহা হইলেই তাহার রূপের জ্ঞান বা প্রত্যয় হইল, সুতরাং ঐ রূপের অস্তিত্ব এবং আমা হইতে তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্বজ্ঞান হইল, এবং ঐ রূপবিশিষ্ট দ্রব্যকে ফুলনামে অভিহিত করিলাম। ঐ স্বতন্ত্র অস্তিত্বজ্ঞানই আমার ভ্রান্তি। ঐ ফুলের প্রতিকৃতি আমার চক্ষুতে পড়িলেও আমার মন যদি তাহাতে সংযোজিত না হয়, তাহা হইলে তাহার জ্ঞান আমার হইল না, সুতরাং আমার নিকট তাহার অস্তিত্ব নাই। অতএব আমার চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত আলোক দ্বারা তাহার সংস্পর্শ এবং তাহাতে আমার মন সংযোজিত হইলেই বলিব যে তাহা আছে, নতুবা তাহার অস্তিত্ব নাই বলিব। আমি উহা দেখিলে উহার রূপসম্বন্ধে আমার জ্ঞান হইল, এবং তৎপরে উহা আমার চক্ষু হইতে অন্তর্হিত হইলেও মনেতে তাহাকে যদি দেখিতে পাই, তখন বলিব

যে বিশেষ বিশেষ কতকগুলি রূপযুক্ত যে দ্রব্য, যাহার নাম ফুল, তাহার অস্তিত্ব আছে, এবং আমা হইতে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। অতএব যতদিন আমার মনে উহার রূপ অঙ্কিত থাকে, যতদিন উহার সম্বন্ধে আমার চিত্তবৃত্তি লোপ না হয়, ততদিন আমার ফুলের জ্ঞান থাকে, সুতরাং আমার নিকট উহার স্বতন্ত্র অস্তিত্বও থাকে, নতুবা আমার নিকট উহা কিছুই নয়, উহার অস্তিত্বও থাকে না। ঐ যে স্বতন্ত্র অস্তিত্বজ্ঞান, তাহাই অজ্ঞান, তাহাই ভ্রম। যেমন ফুল, তাহার রূপ এবং দর্শনেন্দ্রিয় সম্বন্ধে বলা হইল, জগতের যাবতীয় বস্তু এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়সম্বন্ধেও তদ্রূপ হইয়া থাকে। অতএব যখন মন এবং তাহার সঙ্গে সমস্ত ইন্দ্রিয় বহির্ব্বিষয় হইতে বিরত হয় এবং ইহজন্মে বা জন্মান্তরে মনে যে সকল জ্ঞানের ছবি অঙ্কিত হইয়াছিল,—যাহা লইয়া আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি, এবং যে সকল সংস্কার ইহজন্মে সঞ্চিত হইয়াছে, সে সমস্ত লুপ্ত হইয়া আমার চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়, অর্থাৎ মনের আর কোন প্রকার স্ফুরণ না হয়,—পৃথক্ পৃথক্ বিষয়ের জ্ঞানের স্বতন্ত্রতা লোপ হইয়া একীভূত হইয়া যায় এবং মন অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় একটি বস্তুতে সংলগ্ন হইয়া থাকে,—তখন আমার নিকট আমার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমস্ত বিষয়ের, সমগ্র জগতের, অস্তিত্ব থাকে না, তখন জগৎ আমার নিকট মিথ্যা; যে সকল পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞান বা প্রত্যয় লইয়া,—মনের পৃথক্ পৃথক্ স্ফুরণ লইয়া,—আমার পৃথক্ অস্তিত্ব জ্ঞান হইয়াছিল, অর্থাৎ যে সকল প্রত্যয় বা সংস্কারের সমষ্টি লইয়া স্বতন্ত্র আমি বা জীবাত্মা হইয়াছিলাম, তাহা লোপ হইয়া যায়, আমার আত্মা ও পরমাত্মা যাহা এক হইলেও স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হইতেছিল, উভয়েই পুনরায় এক বলিয়া জানিতে পারি; তখনই মুক্তি ঘটে।

পরিণামবাদ।

যেমন দধি দুগ্ধের, হিমশিলা জলের, পরিণাম বা পরিবর্ত্তন, সেইরূপ অনাদি প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া এই জগতে পরিণত হইয়াছে। ইহাই পরিণামবাদীর মত। পুরুষের চৈতন্যাংশ প্রকৃতিতে প্রতিফলিত হয় বলিয়া প্রকৃতি চেতন বলিয়া প্রতীয়মান হন, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহেন। মূল প্রকৃতির পরিবর্ত্তনেই এই জগতের নানাবিধ রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। পুরুষ বা প্রকৃতি ইহার সৃষ্টি করেন না, কিংবা ইহার সৃষ্টির জন্য স্বতন্ত্র উপাদানও নাই। পুরুষ ও প্রকৃতি অভেদভাবাপন্ন হইয়া সম্মিলিত হইলে জগৎ ও তাহার আনুষঙ্গিক সুখদুঃখাদির উৎপত্তি হয়। পুরুষের যখন প্রকৃতি হইতে ভেদজ্ঞান হয়, তখন পুরুষ আপনাকে আর কর্ত্তা বা ভোক্তা মনে করেন না, সুতরাং তিনি আর সুখদুঃখ ভোগ করেন না, তখনই তাঁহার মুক্তি হয়।

আরম্ভবাদ।

যেমন একটি ঘট নির্ম্মাণ করিতে হইলে কুম্ভকাররূপ একজন নির্ম্মাতা এবং মৃত্তিকাদিরূপ উপাদান থাকে, সেইরূপ পরমেশ্বররূপে এই জগতের একজন স্রষ্টা এবং পরমাণুরূপ সৃষ্টির উপাদান বিদ্যমান আছে। মৃত্তিকাদি পরিবর্ত্তিত হইয়া ঘট হয় না, মৃত্তিকাদির উপাদানে ঘটরূপ একটি স্বতন্ত্র বস্তু নির্ম্মিত হয়। কুম্ভকাররূপ ঘটনির্ম্মাতা, মৃত্তিকাদিরূপ উপাদান এবং ঘটরূপ সৃষ্ট পদার্থ, এই তিনটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পদার্থ। ঐরূপ জগৎস্রষ্টা পরমেশ্বর, জগৎসৃষ্টির উপাদান পরমাণু এবং সৃষ্ট জগৎ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বস্তু। ইহার মধ্যে কোনটিতে একটি আরোপিত হইয়া ঐ প্রকার বোধ হয় না, অথবা একটির পরিবর্ত্তন হইয়াও অপরটি হয় না।

আর্য্য দর্শনের তিনটি মতের পরস্পর সামঞ্জস্য।

আর্য্যদর্শনসমূহের মত পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হইলেও প্রকৃত তাহা নহে। আরম্ভবাদ কিয়দ্দূর গিয়া আর যায় নাই, পরিণামবাদ তাহার পরে কতকদূর এবং তৎপরে বিবর্ত্তবাদ আরও অগ্রসর হইয়া সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতমে উপনীত হইয়াছে। পৃথক্ পৃথক্ অধিকারীর জন্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দর্শন লিখিত হইয়াছে, সুতরাং সকলগুলি এক প্রকার না হইয়া ঐরূপ পৃথক্ পৃথক্ হওয়াই প্রয়োজনীয়। যে দর্শনকার সিদ্ধিলাভের জন্ত যে পথে গিয়াছেন, অপরের জন্তও তিনি সেই পথ দেখাইয়া গিয়াছেন।

সৃষ্টিসম্বন্ধে উপরিউক্ত তিনটি মতই প্রধান, এই তিনটিই সকল মতের মূল ভিত্তি (১)। সকল শাস্ত্রই, সকল মতই ইহাদের উপর ভিত্তিস্থাপন করিয়া রচিত ও প্রচারিত হইয়াছে। যদিও ঐ সকলের মত পরস্পর বাহ্যভাবে বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বস্তুত তাহা নহে। সকলেরই মূল ভিত্তি ও চরম উদ্দেশ্য এক। পৃথক্ পৃথক্ শাস্ত্র ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর জন্ত রচিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি যে প্রকারের

---

(১) Respecting the origin of the universe, three verbally intelligible suppositions may be made. We may assert that it is Self-existent, or that it is Self-created; or that, it is created by an External Agency. Herbert Spencer.

ইহাদের মধ্যে প্রথম মতটিকে দর্শনানুযায়ী বিবর্ত্তবাদীয়, দ্বিতীয়টিকে পরিণামবাদীয় এবং তৃতীয়টীকে আরম্ভবাদীয় মত বলিতে পারা যায়। আর্য্যশাস্ত্রের ভক্তিবাদীয় মত প্রধানতঃ আরম্ভবাদের মত, কেহ কেহ বা ইহার সহিত অবশিষ্ট দুইটি বা একটির মত মিশ্রিত করিয়াছেন। Bible ও কোরাণের মত কতকটা আর্য্যশাস্ত্রের আরম্ভবাদমতাবলম্বী ভক্তিবাদীয় মত।

অধিকারী তাহার তদুপযোগী শাস্ত্রানুযায়ী উপদেশ পাওয়াই কর্ত্তব্য; তাহার উপযোগী ঈশ্বরের স্বরূপ, জগতের সৃষ্টি, সাধনপ্রণালী এবং চরম উদ্দেশ্যসম্বন্ধেই সদ্‌গুরু তাহাকে উপদেশ দিয়া থাকেন এবং তদুপযোগী শাস্ত্রের নিয়মানুসারে চলিতে আদেশ করেন, কোন কোন শাস্ত্রে নানা প্রকার অধিকারীর উপযোগী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মতও প্রকটিত হইয়াছে, তাহা হইতে বাছিয়া লইয়া পৃথক্ পৃথক্ অধিকারীকে সদ্‌গুরু স্বতন্ত্র স্বতন্ত্ররূপ উপদেশ দিয়া থাকেন। অনেকে আর্য্যশাস্ত্রসমূহের গূঢ়তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া, তাহাদের বাহ্য বিভিন্নতা দেখিয়া, ঐ সকলের পরস্পর সামঞ্জস্য করিতে অক্ষম হইয়া, অল্পবুদ্ধিবশতঃ অযথা কটূক্তি প্রয়োগ করেন। তত্ত্ববেত্তা সদ্‌গুরুর উপদেশব্যতীত শাস্ত্রের গূঢ় তত্ত্ব কেহ সহজে বুঝিতে পারে না, অথবা ঐ সম্বন্ধে কেহ উপদেশ দিতে সক্ষম নহে; সেই জন্য ঐ প্রকার গুরুর চরণাশ্রয় করা বিশেষ প্রয়োজনীয়। শাস্ত্রের উপদেশের উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তত্ত্বজ্ঞ সদ্‌গুরুর উপদেশ গ্রহণ করিয়া, তদনুযায়ী কার্য্য করিতে করিতে গূঢ়তত্ত্বসমূহের মনোমধ্যে যে স্ফূরণ হয়, তাহাই প্রকৃত বোধগম্য হওয়া, নতুবা কেবল মনের ভার বৃদ্ধি করা মাত্র।

ত্রিগুণ।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের মাত্রার তারতম্যানুসারে এই জগতের উৎপত্তি, এই ত্রিগুণ যেন জগদ্‌গৃহের মৃত্তিকাচ্ছাদিত মূল ভিত্তি। যে কোন দেশের যে কোন শাস্ত্রানুযায়ীই মানবজীবনের গন্তব্য পথ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে কর্ত্তব্যকার্য্যনির্দ্ধারণে ত্রিগুণই লক্ষিত বা অলক্ষিতভাবে প্রধান সহায়। কোন কার্য্যসিদ্ধির জন্য যে যত্ন চেষ্টা ও কর্ম্ম করা যায়, তাহাই সাধনা। কিন্তু নিকৃষ্ট হইতে ক্রমে ক্রমে উৎকৃষ্ট গুণের আধিক্য লাভ করাই প্রধান সাধনা। সেই উদ্দেশ্যেই পরিস্ফুট বা অপরিস্ফুটভাবে সকল দেশের সকল শাস্ত্রকারই মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য কার্য্য সম্বন্ধে বিধান করিয়া গিয়াছেন। সকল ধর্ম্মশাস্ত্র বিশেষতঃ হিন্দুশাস্ত্র বুঝিতে হইলে এই তিনটি গুণ কি তাহা জানা প্রয়োজন।

উপরিউক্ত তিন গুণ সাম্যাকারে থাকিলেই অব্যক্ত প্রকৃতি এবং ঐ অবস্থাযুক্ত হইলেই ব্যক্ত জগৎ। ঐ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, অর্থাৎ বৈষম্যাবস্থাপ্রাপ্ত ঐ গুণত্রয় পুরুষকে সুখদুঃখমোহাদি দ্বারা আবদ্ধ করে (১)।

ত্রিগুণের মধ্যে সত্ত্বগুণ প্রকাশক, রজোগুণ ক্রিয়াশক্তিসাধক এবং তমোগুণ নিষ্ক্রিয়জড়াত্মক। সত্ত্বগুণ শক্তির প্রকাশাবস্থা, রজোগুণ শক্তির কার্য্যকরী বা চঞ্চল অবস্থা, এবং তমোগুণ শক্তির প্রসুপ্ত অবস্থা। সত্ত্বগুণে শক্তির সঞ্চয় ও রক্ষা (acquisition and preservation of energy), রজোগুণে ইহার কার্য্য ও ব্যয় এবং তমোগুণে

---

(১) सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः इत्यादि।

गीता, १४।५।

ইহার শিথিলতা (relaxation) ও ক্রমে অবিদ্যমানতা হয়। স্থিরতা সত্ত্বগুণের, আকর্ষণ ও গতি (attraction and motion) রজোগুণের এবং বিপ্রকর্ষণ ও বাধা (repulsion and resistance) তমোগুণের কার্য্য।

পুরুষই কেবল নির্গুণ, অর্থাৎ ত্রিগুণের অতীত, তিনি ত্রিগুণ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট হইলেই সৃষ্টি হয়, সুতরাং সৃষ্টবস্তুমাত্রেতেই তিনটি গুণ কোন না কোন পরিমাণে বিদ্যমান থাকে; এইজন্য সত্ত্বগুণের প্রকাশিকা শক্তি, রজোগুণের ক্রিয়াশীলতা এবং তমোগুণের জড়তা সকলেতেই কিছু না কিছু পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে।

সত্ত্ব গুণ লঘু, সুতরাং কার্য্য করিতে সক্ষম, কিন্তু স্বয়ং ক্রিয়াহীন; রজোগুণ ক্রিয়াশীল এবং প্রবর্ত্তক বা পরিচালক, অর্থাৎ রজোগুণের চালনপ্রভাবেই সত্ত্ব ও তমোগুণ পরিচালিত হয়; তমোগুণ স্বয়ং কার্য্য করিতে সক্ষমও নহে এবং ক্রিয়াশীলও নহে, ইহা গুরু বা ভারবিশিষ্ট, সুতরাং ক্রিয়াশীলতার প্রতিবন্ধক। স্থিরতা সত্ত্বগুণের, চঞ্চলতা রজোগুণের এবং নিশ্চেষ্টতা ও কার্য্যাক্ষমতা তমোগুণের ধর্ম্ম। সত্ত্বগুণ আত্মার আবরণশক্তির বিনাশক, সুতরাং নির্ম্মল, এবং এই জন্য জ্ঞানের প্রকাশক; এই কারণবশতঃও ইহা শুভ্ররূপে বর্ণিত হয়। ইহা শান্ত সুতরাং সুখস্বরূপ, অর্থাৎ দুঃখশোকাদির কারণ থাকিলেও সত্ত্বগুণ জীবকে সুখের দিকে আকর্ষণ করে। সত্ত্বগুণও "আমি সুখী, আমি জ্ঞানী" ইত্যাদি পার্থক্যজ্ঞান দ্বারা জীবকে বন্ধনদশাগ্রস্ত করিয়া থাকে, অর্থাৎ এই গুণ অধিক হইলে পরেও অহংজ্ঞান বা পার্থক্যজ্ঞানের সম্পূর্ণ লোপ হয় না (১)। রজোগুণ অনুরাগাত্মক, ইহাতে জীবকে কর্ম্মসকলের আসক্তি দ্বারা আবদ্ধ করে, অর্থাৎ

---

(১) तत्र सत्त्वं निर्म्मलत्वादित्यादि। गीता, १४।६।

সুখাদির কারণ বর্ত্তমান থাকিলেও ইহা জীবকে কর্ম্মে সংশ্লিষ্ট করিয়া দুঃখ প্রদান করে (১)। রাগাত্মক বলিয়া ইহা রক্তবর্ণরূপে কথিত হওয়ারও একটি কারণ। তমোগুণ আবরণশক্তিরূপ, অজ্ঞানতা হইতে উৎপন্ন, সুতরাং ভ্রান্তিজনক, অর্থাৎ সৎকে অসৎ, অসৎকে সৎ, বস্তুকে অবস্তু, অবস্তুকে বস্তু, ধর্ম্মকে অধর্ম্ম, অধর্ম্মকে ধর্ম্ম, কর্ত্তব্যকে অকর্ত্তব্য, অকর্ত্তব্যকে কর্ত্তব্য, ইত্যাদিরূপ বিপরীত জ্ঞান জন্মাইয়া বুদ্ধিবিভ্রম ঘটাইয়া থাকে। ঐ গুণে প্রমাদ অর্থাৎ অনবধানতা, আলস্য অর্থাৎ কার্য্যে শিথিলতা, ঔদাস্য অর্থাৎ কার্য্যে অনুদ্যম, উদ্বেগ, দীর্ঘসূত্রতা, ভয় এবং নিদ্রাতন্দ্রাদি দ্বারা জীবকে আবদ্ধ করে। তমোগুণ সত্বগুণের কার্য্যরূপ জ্ঞানকে আচ্ছাদন করিয়া প্রমাদবুদ্ধিতে জীবকে বিমুগ্ধ করে (২)। এইজন্যও ইহা অন্ধকাররূপ কৃষ্ণবর্ণাত্মক বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। স্থিরবুদ্ধি এবং হিতাহিতজ্ঞান (intellect and discretion) সত্বগুণ হইতে, মানসিক ও শারীরিক কার্য্যকারিতা ও চঞ্চলতা (intellectual and bodily activity and cleverness) রজোগুণ হইতে, এবং মানসিক বা শারীরিক জড়তা (dulness) তমোগুণ হইতে উদ্ভূত। আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক মনোবৃত্তিসমূহ (spiritual and moral faculties and sentiments) সত্বগুণ হইতে, এবং হিতাহিতজ্ঞানশূন্য পাশবভাব (animal propensities and sentiments) তমোগুণ হইতে, উৎপন্ন হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে শরীরসম্বন্ধে যাহাকে পিত্ত বলে তাহা সত্বগুণের, বায়ু রজোগুণের, এবং কফ তমোগুণের শারীরিক বিকার বলিয়া বিবেচিত হয়।

---

(১) रजो रागात्मकमित्यादिः। गीता, १४।७।

(২) तमस्त्वज्ञानजमित्यादिः। गीता, १४।८।

সত্ত্বরজস্তমঃ এই তিনটি গুণ যখন সমতা প্রাপ্ত হয়, তখন মন প্রকৃতিস্থ হইয়া থাকে এবং ইহাদের অসমতা হইতেই মনের নানাপ্রকার বিকার হইয়া থাকে। মনের উক্ত বিকারসমূহ গুণভেদে সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক এই তিন প্রকারের হইয়া থাকে। আস্তিক্য, সত্যবাদিত্ব, হিংসাদ্বেষকামক্রোধাদিশূন্যতা, জ্ঞান, মেধা, বুদ্ধি, ধৈর্য্য, ক্ষমাশীলতা, জিতেন্দ্রিয়ত্ব, দয়া, দাক্ষিণ্য, সরলতা, উদারতা, করুণা, অস্পৃহত্ব, নির্দম্ভতা, স্বার্থশূন্যতা, ত্যাগশীলতা, নির্ভীকতা, বিনয়, মৃদুতা এবং বৈরাগ্য প্রভৃতি সদ্‌গুণসমূহ সত্ত্বগুণোদ্ভূত বিকার, অর্থাৎ সত্ত্বগুণাধিক্যবশতই মনের ঐ ঐ প্রকার অবস্থা হইয়া থাকে। শৌর্য্য, বীর্য্য, তেজ, যত্ন, কার্য্যদক্ষতা, চতুরতা, অধীরতা, চঞ্চলতা, কাম, ক্রোধ, লোভ, প্রভুত্ব, তাড়নশীলতা, বহুল দুঃখ, অধিক সুখেচ্ছা, দম্ভ, অহঙ্কার, ঐশ্বর্য্যাদিতে অভিমানিতা, এবং অধিক পর্য্যটন ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের অধিক ক্রিয়ার ইচ্ছা ইত্যাদিরূপ মনের রাজসিক বিকারসমূহ রজোগুণাধিক্যবশতঃ এবং নিদ্রা, তন্দ্রা, আলস্য, বিষণ্ণতা, ভয়, ভ্রান্তি, ক্রোধান্ধতা, মূঢ়তা, হিতাহিতজ্ঞানশূন্যতা, রিপুগণের অধীনতা, নিন্দিতকর্ম্মজনিত সুখে সদাপ্রীতি, কার্য্যকরণে অনুদ্যম ও অনুৎসাহ, কৃপণতা, মনের সঙ্কীর্ণতা, স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা, শঠতা, প্রবঞ্চকতা, অদূরদর্শিতা, চিন্তাকরণে অক্ষমতা প্রভৃতি তামসিক বিকার তমোগুণাধিক্যবশতঃ হইয়া থাকে (১)। সাত্ত্বিক বিকার দ্বারা পুণ্যের ও রাজস বিকার দ্বারা

---

(১) यः सात्त्विकस्तस्य दया स्थिरत्वं सत्यार्जवं ब्राह्मणदेवभक्तिः ।
रजोऽधिकः काव्यकलाव्रतः स्त्रीसंसक्तचित्तः पुरुषोऽतिशूरः ॥
तमोऽधिको वञ्चयिता परेषां मूर्खोऽलसः क्रोधपरोऽतिनिद्रः ॥
ज्योतिषकल्पद्रुमः, ५म शाखा, २१ ।

পাপের উৎপত্তি হয়, এবং তামস বিকার দ্বারা পাপপুণ্য কিছুই হয় না কেবলই বৃথা আয়ুঃক্ষয় হয় (২)।

সত্ত্বাদিগুণানুযায়ী যে, শরীরের বর্ণ শ্বেত, রক্ত বা কৃষ্ণবর্ণ হয় তাহা নহে, কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তিও সত্ত্বগুণাধিক এবং শ্বেতবর্ণ ব্যক্তিও তমোগুণ-বহুল হইয়া থাকে। তিনটি গুণ যথাক্রমে ঐ প্রকার বর্ণযুক্ত বলিয়া কথিত হওয়ার উপরে যে কারণ দেওয়া হইয়াছে, তদ্ব্যতীত আরও কারণ আছে। যাহার যে গুণ স্বভাবতঃ অধিক, অথবা যখন যাহার ঐ গুণ ক্ষণিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তখন তাহার তদনুযায়ী মানসিক ভাব হইয়া থাকে, এবং তাহাই শরীরের চতুর্দ্দিকে সূক্ষ্ম তেজোরূপে পরিস্ফুট হইয়া থাকে। ইহাকে জ্যোতি বা ছটা এবং ইংরাজীতে "aura" বলিতে পারা যায়। ইহা সূক্ষ্ম দৃষ্টির বিষয়ীভূত। সত্ত্বরজস্তমঃ এই তিন গুণের আধিক্যানুযায়ী ঐ তেজ যথাক্রমে প্রধানতঃ শুভ্র, রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণাধিক্যবশতঃ যাহার মন গভীর ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন তাহার শরীরের চতুর্দ্দিকের সূক্ষ্ম বহিস্তেজ শুভ্রবর্ণ, রজোগুণাধিক্যবশতঃ যাহার অত্যধিক ক্রোধ আসক্তি প্রভৃতির আবির্ভাব হইয়াছে তাহার রক্তবর্ণ, এবং যাহার তমোগুণাধিক্যবশতঃ ভয়ঈর্ষাদ্বেষাদিরূপ নিকৃষ্ট মানসিক ভাবের উদয় হইয়াছে, কিংবা যে নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছে, তাহার কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। ঐরূপ যে স্বভাবতঃ সত্ত্বগুণাবলম্বী তাহার বহিস্তেজ অপেক্ষাকৃত শুভ্রবর্ণ, যে রজোগুণাধিক তাহার রক্তবর্ণ এবং যে তমো-গুণাধিক তাহার কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। সূক্ষ্মদর্শী আর্য্যঋষিগণ দিব্য চক্ষুতে দেখিতে পাইয়া এই সমস্ত বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

---

(২) ঘাত্বিকং প্রবিভজ্যভোজনমনুতাপস্য তথ্যং প্রবর্ত্তিতাদয়ঃ।

ভাবপ্রকাশ, পূর্ব্বখণ্ড, ১ম ভাগ, ১০-১২।

এই জগৎ ত্রিগুণের যুদ্ধক্ষেত্র ; জীবের পূর্ব্বজন্মের সংস্কারবশে কখন রজঃ ও তমোগুণকে পরাভব করিয়া সত্বগুণ প্রবল হইয়া জীবকে সুখাদিতে সংশ্লিষ্টকরতঃ হৃদয়ে শান্তিপ্রদান করে, কখন বা রজোগুণ প্রবল হইয়া অপর গুণদ্বয়কে অভিভূতকরতঃ তাহাকে কর্ম্মে আবদ্ধ করিয়া তাহার হৃদয়কে চঞ্চল করে এবং দুঃখ প্রদান করে, আবার কখন বা সত্ব ও রজঃকে পরাভব করিয়া তমোগুণ প্রবল হইয়া তাহাকে প্রমাদালস্যাদিতে সংশ্লিষ্ট করিয়া তাহার হৃদয়কে অজ্ঞানতা-রূপ মোহান্ধকারে আচ্ছন্ন করে (১)। এই কারণবশতঃই একই ব্যক্তিকে পৃথক্ পৃথক্ সময়ে পৃথক্ পৃথক্ ভাবাপন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। যখন দেহে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়রূপদ্বারসমূহে স্বরূপজ্ঞানের আবির্ভাব এবং মনের প্রসন্নতা হয়, তখনই জানিতে হইবে যে সত্বগুণের উদয় হইয়াছে (২)। যখন লোভ অর্থাৎ বহুধনাদি লাভেও উত্তরোত্তর ধনাদিবর্দ্ধনের তৃষ্ণা জন্মিয়াছে, সর্ব্বদা কর্ম্মকরণে চেষ্টা, যত্ন, ও প্রবৃত্তির বৃদ্ধি হইতেছে, অট্টালিকাদিনির্ম্মাণ বৃক্ষাদিরোপণ প্রভৃতি কার্য্যে উদ্যম হইতেছে, "এই কর্ম্ম করিয়া এই কর্ম্ম করিব" ইত্যাদিরূপ সংকল্প প্রতিনিয়ত মনে উত্থিত হওয়ায় অশান্তিতে চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে, কিংবা স্পৃহা অর্থাৎ মনোরম ও দৃষ্টবস্তুমাত্রেরই প্রাপ্তির ইচ্ছা জন্মিতেছে, তখনই বুঝিতে হইবে যে রজোগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে (৩)। আবার যখন বিবেকবুদ্ধির বিকাশ না হইয়া বিবেকভ্রংশ ঘটিতেছে, কর্ম্মানুষ্ঠানে অনুদ্যম বা চিত্তের ঔদাস্যরূপ অপ্রবৃত্তির উদয় হইতেছে, কোন্ কার্য্য কর্ত্তব্য বা কোন্ কার্য্য অকর্ত্তব্য তাহা অনুসন্ধান করিতে

---

(১) रजस्तमश्चाभिभूयेत्यादि । गीता, १४।१०, १६ ।

(२) सर्व्वद्वारेषु देहेऽस्मिन्नित्यादिः । गीता, १४।११ ।

(३) लोभः प्रवृत्तिरारम्भ इत्यादिः । गीता, १४।१२ ।

ইচ্ছা হইতেছে না, কার্য্যের কর্ত্তব্যতা জানিয়াও তাহা সমুচিত সময়ে স্মরণ না হওয়ায় প্রমাদের অবস্থা ঘটিতেছে, নিদ্রাতন্দ্রাদির আবির্ভাব-বশতঃ মন ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ মোহে অভিভূত হইতেছে, কিংবা সৎকে অসৎ, অসৎকে সৎ ইত্যাদিরূপ মিথ্যাজ্ঞানের উদয় হইয়া বুদ্ধি-বিপর্য্যয়রূপ মোহের সঞ্চার হইতেছে, তখনই বুঝিতে হইবে যে তমো-গুণের বৃদ্ধি হইয়াছে (১)।

প্রত্যেক জীবে গুণসমূহের পরস্পর তারতম্য নিয়ত সম্ভবমত পরিবর্ত্তিত হইতেছে; মন ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণের এবং শ্বাসপ্রশ্বাসাদির পৃথক্ পৃথক্ সময়ের অবস্থা অনুধাবন করিয়া দেখিলে ইহা বুঝিতে পারা যায়। দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন ইন্দ্রিয়ে কখন কোন গুণের অপেক্ষাকৃত হ্রাস এবং কখনও বা ইহার কিয়ৎপরিমাণে বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যেমন, সঞ্চালিত হইবার শক্তি থাকিলেও হস্ত কোন সময়ে নিশ্চল ও স্থির হইয়া থাকে, ইহা সত্ত্বগুণবশতঃই হয়। তৎপরে রজোগুণের বৃদ্ধি-বশতঃ ইহা চালিত হইল, কিয়ৎক্ষণ পরে যদি অবসন্ন না হইয়া স্থির হয়, তাহা হইলে ইহাতে পুনরায় সত্ত্বগুণের আধিক্য হইয়া ঐ ইন্দ্রিয়ের সংযমাবস্থা ঘটে; কিন্তু স্থির না হইয়া যখন ইহা রজোগুণবশতঃ ক্রমাগত চালিত হইয়া অবশ ও নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে, তখন বুঝিতে হইবে যে ইহাতে তমোগুণের বৃদ্ধি হওয়াতেই ইহা নিষ্ক্রিয় হইয়াছে। পুনরায় গুণান্তরের আধিক্য হইলে ইহা সেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত গুণেরই কার্য্য করিতে থাকে। এই প্রকারে ঐ ইন্দ্রিয় ক্রমাগত একটি গুণ হইতে গুণান্তরের আধিক্যে নীত হয় এবং তত্তদনুযায়ীই কার্য্য করিতে থাকে। যে প্রকার হস্তসম্বন্ধে বলা হইল, অন্যান্য ইন্দ্রিয়সম্বন্ধেও সেইরূপ হইয়া থাকে।

---

(১) अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च इत्यादिः । गीता, १४।१३ ।

যাহার যত সত্ত্বগুণ অধিক তাহার ইন্দ্রিয়গণও সেই পরিমাণে অধিকক্ষণ স্থিরভাবে থাকিতে পারে এবং চঞ্চল হইলেও শীঘ্র সংযত হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারে, যাহার যে পরিমাণে রজোগুণ অধিক তাহার ইন্দ্রিয়গণও তদনুযায়ী ক্রিয়াশক্তিসম্পন্ন ও চঞ্চল হয় এবং যাহার তমোগুণ যত অধিক তাহার ইন্দ্রিয়গণও সেই পরিমাণে অল্প সময় মধ্যে নিষ্ক্রিয় ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। যেমন, রজোগুণের আধিক্য হইলে, চক্ষু একটি বিষয়ে স্থির হইয়া থাকিতে পারে না, একটি ছাড়িয়া অপরটী দেখিতেছে, পুনরায় আর একটি দেখিতেছে, এই প্রকারে ক্রমশঃই ইহা এক বস্তু হইতে বস্বন্তরে আকৃষ্ট হইতেছে। কর্ণও ঐ রূপ একটি শব্দ শুনিতে শুনিতে শব্দান্তরে যাইতেছে, প্রতিক্ষণই এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে চালিত হইতেছে। অবশিষ্ট ইন্দ্রিয়গণেরও এইরূপ হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণাধিক্য হইলে ইন্দ্রিয়সমূহ একটি বিষয়ে অধিকক্ষণ স্থির হইয়া থাকিতে পারে এবং তমোগুণাধিক্য হইলে নিশ্চেষ্ট ও কার্য্যকরণে অক্ষম হয়।

মনই অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণের নিয়ামক, ইহারই ইঙ্গিতে ঐ সমস্ত চালিত হইতেছে এবং ইন্দ্রিয়গণের উত্তেজনাতেই তত্তৎ শারীরিক যন্ত্র কার্য্য করিতেছে। গুণত্রয়ের তারতম্যের পরিবর্ত্তনবশতঃ মানসিক বৃত্তিসমূহেরও নানাপ্রকার অবস্থা ঘটিয়া থাকে। সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিবশতঃ মন অধিকক্ষণ এক বিষয়ের চিন্তা করিতে সক্ষম হয়; রজোগুণাধিক্য-বশতঃ চিন্তার বিষয় মুহুর্মুহুঃ পরিবর্ত্তন হয় ও মন স্থির হইয়া অধিকক্ষণ থাকিতে পারে না; এবং তমোগুণের বৃদ্ধি হইলে চিন্তাশক্তির হ্রাস হইয়া থাকে। একটি বিষয়ে অধিক মনোনিবেশ এবং স্মরণশক্তির প্রবলতা প্রভৃতি মানসিক ব্যাপার সত্ত্বগুণাধিক্যবশতই হইয়া থাকে।

যেমন ইন্দ্রিয়গণ সম্বন্ধে বলা হইল, তদ্রূপ শরীরাভ্যন্তরস্থ প্রাণাদি বায়ুতেও ঘটিয়া থাকে। সত্ত্বগুণাধিক্যবশতঃ ঐ সমস্ত বায়ু স্বভাবতঃ

সমভাবে অবস্থিত হইয়া নিশ্চল ও স্থিরভাবে থাকে, ঐ অবস্থায় ঐ সকল বায়ুর চঞ্চল হইবার এবং কার্য্য করিবার ক্ষমতা থাকে কিন্তু কার্য্য করে না, প্রয়োজন হইলেই কার্য্য করিয়া থাকে। রজোগুণাধিক্যবশতঃ প্রাণাদি বায়ু চঞ্চল হয়, দ্রুতগমনাদি রজোগুণের কার্য্যকালে শ্বাস-প্রশ্বাসাদির গতি দেখিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। তমোগুণাধিক্য-বশতঃ প্রাণাদি বায়ুর অসামঞ্জস্য ঘটিয়া ইহাদের কার্য্যকারিতাশক্তির হ্রাস হয় এবং ঐসকল বায়ুর অসমতা ঘটে বলিয়া জৃম্ভনও দীর্ঘনিশ্বাসাদি হইয়া থাকে। নিদ্রাতন্দ্রাক্লান্তিপ্রভৃতির অবস্থায় শ্বাসপ্রশ্বাসাদির গতি দেখিলে তমোগুণাধিক্যে প্রাণাদি বায়ুর কি প্রকার অবস্থা হয় তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। জীব ক্রমে ক্রমে যখন পূর্ণ তমোগুণের অবস্থায় উপনীত হয়, তখন প্রাণাদি বায়ুর ক্রিয়াশক্তির একবারে লোপ হয়; তাহাদেরই চালনায় শরীর সঞ্চালিত হইতেছিল, সুতরাং শরীরও নিষ্ক্রিয় হয়। ইহাই মৃত্যু।

পঞ্চভূত ও পঞ্চেন্দ্রিয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, মায়াবিশিষ্ট আত্মা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে অপ্ এবং অপ্ হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হয় (১)। এই আকাশাদি পাঁচটি পদার্থকে পঞ্চ মহাভূত, এবং সাংখ্যমতে পঞ্চতন্মাত্র বলে। অব্যক্ত হইতে ব্যক্তাবস্থাপ্রাপ্ত, অপ্রকাশ হইতে প্রকাশ হওয়াই, সৃষ্টি, অর্থাৎ সূক্ষ্ম হইতে ক্রমে ক্রমে স্থূলাবস্থায় পরিণতিই সৃষ্টি। ঐরূপ ব্যক্তাবস্থা হইতে ক্রমে ক্রমে অব্যক্তাবস্থায়, অর্থাৎ স্থূল হইতে ক্রমশঃ সূক্ষ্মে লীন হওয়াই লয় (২)। এই প্রকার পরিণতি ও লয়ের একটি স্থূল দৃষ্টান্ত যথা, বাষ্প শৈত্যাবস্থা প্রাপ্ত হইলে জলে এবং জল হিমশিলায় পরিণত হয়, ঐরূপ হিমশিলা তাপসংযোগে জলে এবং জল বাষ্পে লীন হয়। সৃষ্টির অবস্থায় সূক্ষ্মতম ভূত, অর্থাৎ আকাশ; ক্রমে ক্রমে পর পর স্থূল হইতে স্থূলতর ভূতে পরিণত হইয়া অবশেষে স্থূলতম ক্ষিতির অবস্থায় উপনীত হয়, এবং লয়ের অবস্থায় ইহার বিপরীত ভাব হয়।

পঞ্চভূত সত্ত্বরজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের কার্য্য হইতে উদ্ভূত। গুণত্রয়ের তারতম্যানুসারেই পঞ্চভূতের ক্রমশঃ অভিব্যক্তি হইয়াছে। আকাশ সত্ত্বগুণবহুল, বায়ু রজোগুণবহুল, তেজঃ সত্ত্বরজোগুণবহুল এবং ক্ষিতি তমোগুণবহুল। পাশ্চাত্য রসায়নশাস্ত্রবিদ্‌গণ অম্লজান

---

(১) তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী।

তৈত্তিরীয়োপনিষদ্, ব্রহ্মানন্দবল্লী।

(২) অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বা প্রভবন্ত্যহরাগমে। অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বা ইত্যাদিঃ।

গীতা, ৮।১৮।

(Oxygen), উদ্‌জান (Hydrogen) প্রভৃতি যাহাদিগকে রূঢ় পদার্থ (elements) বলেন, সেই সমস্ত পঞ্চভূত নহে, পঞ্চভূতের বিকার অথবা ইহাদের পরস্পর সংমিশ্রণে উৎপন্ন বস্তুমাত্র। পঞ্চভূত বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি, শাস্ত্রকারগণ স্থূল পৃথিব্যাদিকে সেই মূল পঞ্চভূত বলেন নাই (২)।

উপরিউক্ত এক একটি পঞ্চ সূক্ষ্মভূতের এক একটি সত্ত্বাংশ হইতে ক্রমশঃ শ্রবণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয় ; অর্থাৎ আকাশের সত্ত্বাংশ হইতে শ্রবণেন্দ্রিয়, বায়ুর সত্ত্বাংশ হইতে ত্বগিন্দ্রিয়, তেজের সত্ত্বাংশ হইতে দর্শনেন্দ্রিয়, জলের সত্ত্বাংশ হইতে রসনেন্দ্রিয় এবং পৃথিবীর সত্ত্বাংশ হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। আমরা ঐ সকল ইন্দ্রিয় দেখিতে পাই না, কেবলমাত্র উহাদের ক্ষেত্র বা অধিষ্ঠান (seat) দেখিতে পাই। আমরা কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা দেখিতেছি কিন্তু ঐ ইন্দ্রিয়গণকে দেখিতেছি না। যে যে সূক্ষ্ম বস্তু না থাকিলে কর্ণ শুনিতে পায় না, ত্বক্ স্পর্শ করিতে পারে না, চক্ষু দেখিতে পায় না, জিহ্বা রসগ্রহণ করিতে পারে না, এবং নাসিকা আঘ্রাণ করিতে পারে না, তাহাই ইন্দ্রিয়। অনেক অন্ধের চক্ষু আছে কিন্তু দর্শনেন্দ্রিয় না থাকায় দেখিতে পায় না, অনেক বধিরের কর্ণ আছে কিন্তু শ্রবণেন্দ্রিয় না থাকায় শুনিতে পায় না ; এই প্রকার অবশিষ্ট ইন্দ্রিয়গণ সম্বন্ধেও ঘটিয়া থাকে। ঐ পঞ্চ মহাভূতের পঞ্চ সত্ত্বাংশ মিলিত হইলে মন ও বুদ্ধির উৎপত্তি হয় ; এই দুইটী অন্তঃকরণ বা অন্তরিন্দ্রিয় নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ঐ প্রত্যেক পঞ্চ মহাভূতের প্রত্যেক রজোংশপঞ্চক

(২) "We must be careful, however, not to confer upon it a too limited significance. The elements, fire, air, water and earth were not regarded in their *strictly* literal sense by the ancients."

Rodwell's History of the Physical Science.

হইতে ক্রমান্বয়ে বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু এবং উপস্থরূপ পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় যথাক্রমে বচন, আদান, গমন, বিসর্গ অর্থাৎ পুরীষত্যাগ এবং রমণ এই কয়েকটি কর্ম্ম সম্পন্ন করে।

পঞ্চ সূক্ষ্মভূতের পরস্পর বিমিশ্রণের দ্বারা পঞ্চস্থূলভূতের উৎপত্তি হয়। এই স্থূলভূতেই শব্দাদিগুণের অভিব্যক্তি বা প্রকাশ হয়। যদিও সূক্ষ্মভূতেও শব্দাদি গুণ বা ধর্ম্ম আছে, কিন্তু অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলিয়া আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয় কর্ত্তৃক অনুভূত হয় না। আকাশের বিশেষ গুণ শব্দ; বায়ুর বিশেষ গুণ স্পর্শ, কিন্তু ইহাতে আকাশের শব্দগুণও আছে; তেজের বিশেষ গুণ রূপ, কিন্তু আকাশ ও বায়ুর শব্দ ও স্পর্শগুণও আছে; জলের বিশেষ গুণ রস, কিন্তু ইহাতে আকাশ, বায়ু ও তেজের, শব্দ, স্পর্শ ও রূপগুণও আছে; পৃথিবীর বিশেষ গুণ গন্ধ, কিন্তু ইহাতে আকাশ, বায়ু, তেজ ও অপের, শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রসগুণও আছে। পৃথিবীস্থ প্রত্যেক পদার্থই পাঞ্চভৌতিক এবং প্রত্যেকে শব্দাদি গুণ বর্ত্তমান থাকে, এই স্থূল জগতে সূক্ষ্ম কোন ভূত বিশুদ্ধভাবে অর্থাৎ অমিশ্রিত অবস্থায় থাকিতে পারে না (১)।

বাগাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, শ্রবণাদি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং উভয়াত্মক মন, এই কয়েকটি দ্বারাই, সৃষ্ট বস্তুমাত্রই, অর্থাৎ আকাশাদি পঞ্চ

---

(১) "In everything are there five elements or qualities contained, because everything consists of vibrations of the one element called by the Alchemists *prima materia* in which these qualities are latent (potentially contained.)"

Occult Science in Medicine
by F. Hartmann, p. 41.

উপরের লিখিত ঐ "*prima materia*" কে শাস্ত্রোক্ত আকাশ বলিতে পারা যায়।

স্থূলভূত এবং তাহাদের শব্দাদি গুণ আমরা অনুভব করি। পঞ্চভূত ও তাহাদের পঞ্চগুণ এই দশটিকে বিষয় বলে। যে ইন্দ্রিয় দ্বারা যে বিষয় অনুভব করা যায়, তাহা সেই ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয়।

আকাশাদি পঞ্চ সূক্ষ্মভূতের মধ্যে শব্দ যাহার গুণ বা ধর্ম্ম, সেই সূক্ষ্ম আকাশরূপে বা শব্দতন্মাত্ররূপে, ব্রহ্ম সর্ব্বপ্রথম অভিব্যক্ত হন, এবং ইহা হইতেই ক্রমশঃ অন্যান্য সূক্ষ্মভূতের উৎপত্তি হয় (১)। আর্য্য শাস্ত্রের এই মত পাশ্চাত্য "Platonic Theory"র মূল এবং ঐ সম্বন্ধে আর্য্যশাস্ত্রের বাক্যসমূহ অপর এক মহাত্মার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছিল, তাই তিনি বলিয়াছিলেন, "আদিতে শব্দ বর্ত্তমান ছিল এবং ঐ শব্দ ঈশ্বরের সহিত বিদ্যমান ছিল এবং ঐ শব্দই ঈশ্বর" (২)। আকাশ সর্ব্বব্যাপী, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আকাশময়, ইহাতে এমন কোন স্থান নাই যাহাতে আকাশ নাই।

পঞ্চ স্থূলভূতের মধ্যেও আকাশই সর্ব্বপ্রথম স্ফুরণ, সুতরাং আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ মধ্যে ইহাই সর্ব্বপ্রথম সৃষ্টি। আকাশের গুণ বা ধর্ম্ম শব্দ এবং আকাশেই শব্দের উৎপত্তি হয়। এই আকাশকে ইংরাজীতে "ether" বলিতে পারা যায়। আকাশ যদিও শ্রবণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয়, কিন্তু আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান কর্ণ, পাঞ্চভৌতিক বলিয়া, কেবলমাত্র আকাশে যে শব্দ হয়, তাহা আমরা শ্রবণ করিতে সক্ষম হই না। ঐ শব্দ বায়ু প্রভৃতি অপর

---

(১) যো বৈ সোঽন্তঃ পুরুষ আকাশঃ।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৩।১২

আকাশো বৈ ব্রহ্মৈব। ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

(২) In the beginning was the Word and the Word was with God and the word was God.

N. Testament, John, Ch. 1, Verse 1.

ভূতচতুষ্টয়ের সাহায্য না পাইলে নানা প্রকারের হইতে পারে না, অথবা আমাদের শ্রবণের উপযোগী হয় না। আকাশ ইহাদের দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইলে, ভিন্ন ভিন্ন রূপে স্পন্দিত হওয়ায়, শব্দের বিভিন্নতা ঘটে, কোন শব্দ কোন দ্রব্য হইতে উৎপন্ন হইলে বায়ুও স্পন্দিত হয় এবং তাহারই আকর্ষণী শক্তি দ্বারা গৃহীত হইয়া আমাদের কর্ণপটহে আঘাত করিলে, সেই শব্দ প্রতিধ্বনিত হইবামাত্র, শব্দবহনকারী স্নায়ুসমূহে (auricular nerves) যে ব্যানবায়ু আছে, তাহারই সাহায্যে প্রথমে আমাদের মস্তিষ্কে তৎপরে মনে নীত হইয়া, আমাদের অনুভূতি (impressions) হয়। যদি মনকে উহাতে নিযুক্ত না করা যায়, তাহা হইলে কর্ণপটহে প্রতিধ্বনিত শব্দ অমনি বিলীন হইয়া যায়, মনে তাহার অনুভূতি অঙ্কিত হইতে পারে না।

মরুৎ বা বায়ুর গুণ বা ধর্ম্ম স্পর্শ, কিন্তু ইহাতে আকাশের শব্দ-গুণও আছে। আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ করিবার শক্তি (attraction and repulsion) ইহার বিশেষত্ব। এই আকর্ষণী-বিপ্রকর্ষণী-শক্তি-বশতই ইহা স্পর্শেন্দ্রিয়দ্বারা অনুভূত হয়। তড়িৎ (electricity) যাহাতে তেজ আবির্ভূত হয় নাই, কর্ষিকাকর্ষণ (magnetism), এবং মাধ্যাকর্ষণ (gravitation), বায়ুর অন্তর্নিহিত আকর্ষণীবিপ্রকর্ষণী শক্তি মাত্র, এই আকর্ষণী শক্তিবশতই বায়ু শোষণ করিয়া থাকে (১)। মরুৎকে তেজোহীন তড়িতের রূপান্তরও বলিতে পারা যায়। বায়ু তেজের আশ্রয়ভূত, অর্থাৎ ইহা হইতেই তেজ উদ্ভূত হইয়া থাকে এবং ইহাকে অবলম্বন করিয়াই তেজ বিদ্যমান থাকে। বায়ুকে বা বায়বীয় অণুসমূহকে ইংরাজীতে "gas" বলিলে ইহার ঠিক প্রতিশব্দ হয় না, ইহাকে "electric ether" বলিতে পারা যায়। বায়ুই

---

(১) গীতা, ২।২৩।

রিথের আকর্ষণী শক্তি এবং ইহা দ্বারা উৎক্ষেপণ বিক্ষেপণাদি ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে (১)।

আকাশ ভিন্ন বায়ু থাকিতে পারে না, ইহা আকাশকে অবলম্বন করিয়া সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছে। ত্বক্ স্পর্শেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান। আমরা সাধারণতঃ যে বায়ু স্পর্শানুভব করি, তাহাতে ক্ষিতি, অপ্ ও তেজ এই তিনটি ভূতও সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান থাকে। আমাদের পাঞ্চভৌতিক ত্বক্ দ্বারা, আকাশ ও বায়ুর সহিত পৃথক্ পৃথক্ পরিমাণে মিশ্রিত অপর তিনটি ভূতেরও কণাসকল স্পর্শ বা অনুভব করিয়া থাকি।

তেজের বিশেষগুণ রূপ, কিন্তু আকাশ ও বায়ু ব্যতীত তেজ থাকিতে পারে না, সুতরাং ইহাতে আকাশের শব্দগুণ ও বায়ুর স্পর্শগুণও আছে। যখন তেজ বিশেষগুণযুক্ত হইয়া জ্যোতিঃ বা আলোক (light) রূপে প্রকাশিত হয়, তখন দর্শনেন্দ্রিয়দ্বারা ইহার জ্ঞান হয়। দর্শনকার্য্য এই তেজের দ্বারাই সাধিত হইয়া থাকে এবং চক্ষু এই দর্শনেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান। তেজে বায়ুর স্পর্শগুণও আছে বলিয়া, ইহা যখন তাপ (heat) রূপে বিদ্যমান থাকে, তখন স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা ইহার জ্ঞান হয়। সর্ব্বশরীরের ত্বক্ এই স্পর্শেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান, সুতরাং ইহা দ্বারাই আমরা এই তাপরূপ তেজ অনুভব করিয়া থাকি।

বায়ু ঘনীভূত হইলে, অর্থাৎ ইহার আকর্ষণীশক্তির বৃদ্ধি হইলে তেজ উৎপন্ন হয়। তেজ ঘনীভূত হইয়া ক্রমে ক্রমে অপ্, ও অপ্

---

(১) অগ্নিশ্রিয়ো মরুতো বিশ্বকৃষ্টয়ঃ।

ঋগ্বেদসংহিতা, ৩।২৬।৪।

অগ্নির আশ্রয় মরুৎ বিশ্বকে আকর্ষণ করে।

ঘনীভূত হইয়া ক্ষিতিতে পরিণত হয় এবং ঐ সকলের সহিত আলোক নানা প্রকারে মিশ্রিত হইয়া, শ্বেত, নীল, পীত, লোহিত ইত্যাদি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বর্ণ আমাদের পাঞ্চভৌতিক চক্ষুর গোচরীভূত হয়। ক্ষিতি ও অপের সাহায্যে তেজ যতই ঘনীভূত হয়, ততই ইহাতে পাঞ্চভৌতিক ত্বকের স্পর্শযোগ্য উত্তাপ, তৎপরে দাহিকাশক্তি, আবির্ভূত ও অনুভূত হইয়া থাকে। যখন বায়ু হইতে তেজ অভিব্যক্ত হইয়া কেবলমাত্র জ্যোতিঃরূপে অবস্থিতি করে, তখনই তেজোময় বায়ু আমাদের প্রথম নয়নগোচর হয়, চক্ষুব্যতীত অন্য কোন ইন্দ্রিয়দ্বারা ঐ তেজ অনুভব করিতে পারা যায় না। যখন বায়ু হইতে তেজ অভিব্যক্ত হইয়া উত্তাপ বৃদ্ধি হয়, তখনই ইহা ত্বকের স্পর্শযোগ্য হয়। এই আলোক (light) ও উত্তাপ (heat) উভয়ই তেজের অন্তর্গত। বায়ুতে তেজ অভিব্যক্ত হইয়া সূর্য্য, বিদ্যুৎ ও অগ্নিরূপে স্ফুরিত এবং আমাদের অনুভব যোগ্য হয়। তড়িৎ যতক্ষণ তেজরূপে অভিব্যক্ত না হয়, ততক্ষণ ইহাতে কেবলমাত্র আকর্ষণীশক্তি থাকে এবং বায়ুরূপে অবস্থিতি করে, তখন ইহার রূপ আমাদের দর্শনযোগ্য এবং ইহার উত্তাপ আমাদের স্থূল স্পর্শেন্দ্রিয়ের স্পর্শযোগ্য হয় না। একমাত্র সূর্য্যই সমস্ত তেজের মূল, সেই তেজই স্বর্গে আদিত্য, অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎ এবং পৃথিবীতে অগ্নিরূপে প্রকাশমান হয় (১)। পৃথিবী হইতে যতই ঊর্দ্ধে উঠা যায়, ততই যে সকল ক্ষিতি ও অপ্‌কণার সাহায্যে উষ্ণতা ও দাহিকাশক্তি জন্মিয়া থাকে, তাহাদের অভাব হয়, সুতরাং অতি ঊর্দ্ধদেশে উত্তাপ হ্রাস হইয়া আসিয়া কেবলমাত্র জ্যোতিরূপে তেজ বর্ত্তমান থাকে ; তখন আমাদের পাঞ্চ-

---

(১) স্তোমেন হি দিবি দেবাসোঽগ্নিমজীজনঞ্ছক্তিভিরোদসি প্রাম্। তমু অকৃণ্বন্ত্রেধাভুবে কং স ওষধীঃ পচতি বিশ্বরূপাঃ।

ঋগ্বেদসংহিতা।

ভৌতিক স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা ইহার উত্তাপ অনুভব করিতে পারি না। পৃথিবীতে যে তেজ বিদ্যমান থাকে, তাহাতে ক্ষিতি ও অপ্‌ কণা অত্যধিকরূপে বিদ্যমান থাকে বলিয়া, তাহা ভারত্ববিশিষ্ট, সুতরাং তমোগুণবহুল, অন্তরীক্ষে যে তেজ, তাহাতে ক্ষিতি ও অপ্‌ কণা অপেক্ষাকৃত কম, সুতরাং তাহা রজোগুণবহুল, এবং স্বর্গে যে তেজ, তাহা সত্ত্বগুণবহুল।

অপ্‌ বা জলের বিশেষ গুণ রস, কিন্তু ইহা আকাশ, বায়ু ও তেজ ব্যতীত থাকিতে পারে না, সুতরাং তাহাদের শব্দ, স্পর্শ ও রূপগুণও ইহাতে বিদ্যমান থাকে। অপ্‌কে ইংরাজিতে (liquid) বলিতে পারা যায়, ইহা রসনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয়, পান ভোজনাদি এই ইন্দ্রিয়ের কার্য্য। জিহ্বা রসনেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠানক্ষেত্র।

अग्ने यत्ते दिवि वर्चः पृथिव्यां यदोषधीष्वप्स्वा यजत्र ।
येनान्तरिक्षमुर्वाततन्थ त्वेषः स भानुरर्णवो नृचक्षाः ॥

ऋग्वेदसंहिता, ३।२२।२।

'হে অগ্নি! তোমার যে তেজ দ্যুলোকে, পৃথিবীতে, ওষধিসমূহে, ও জলে রহিয়াছে, যাহা দ্বারা তুমি অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত করিয়াছ, সে তেজ উজ্জ্বল, ও সমুদ্রের ন্যায় বিস্তীর্ণ এবং মনুষ্যগণের দর্শনকারী।

দ্যুলোকে আদিত্য ভূলোকে আহবনীয় অগ্নি, ওষধিতে গূঢ় অগ্নি ও সমুদ্রে বাড়বানল সমস্তই অগ্নির রূপান্তর মাত্র। অন্তরীক্ষে বায়ুও অগ্নির রূপান্তর।

সায়ণ।

दिवं पृथिवीमन्वन्तरिक्षं ये विद्युतमनुसंचरन्ति ।
ये दिक्ष्वन्तर्ये वाते अन्तस्तेभ्यो अग्निभ्यो हुतमस्त्वेतत् ॥

अथर्ववेदसंहिता, ३।२१।७।

ক্ষিতির বিশেষ গুণ গন্ধ, কিন্তু ইহা অপর ভূতচতুষ্টয় ব্যতীত থাকিতে পারে না বলিয়া, তাহাদের শব্দস্পর্শাদি চারিটি গুণও ইহাতে বিদ্যমান থাকে। ক্ষিতিকে ইংরাজীতে "solid" বলিতে পারা যায়, ইহা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয় এবং নাসিকা এই ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান। ক্ষিতি পঞ্চভূতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল এবং সৃষ্টির সর্ব্বশেষ পরিণতি।

ষড়্‌ রিপু।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য এই ছয়টি মানসিক বৃত্তি সত্ত্বগুণের বিরোধী, ইহারা জীবের ঘোর শত্রু, এই জন্যই ইহাদিগকে রিপু বলে। ইহাদের মধ্যে কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিনটি রজোগুণ-সমুদ্ভব (১), এবং অপর তিনটি তমোগুণ হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে। কোন ইন্দ্রিয়দ্বারা তদ্‌গ্রাহ্য বহির্ব্বিষয় গ্রহণ করিলে সুখ বোধ হইল, যেমন, একটি সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া দর্শনেন্দ্রিয়ের, মনোহর সঙ্গীত শুনিয়া শ্রবণেন্দ্রিয়ের, সুগন্ধ পুষ্প আঘ্রাণ করিয়া ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের, অথবা অন্য কোন বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া তদুপযোগী কোন ইন্দ্রিয়ের প্রীতি হইল, সেই সুখের বা প্রীতির চিত্র যদি মনে অঙ্কিত হয়, তাহা হইলে রাগ বা অনুরাগ জন্মে, ইহা রজোগুণ হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে। কোন বহির্ব্বিষয়ে অনুরাগ জন্মিবার পরে সেই প্রাপ্ত বিষয় ভোগ করিতে করিতে এবং তাহারই সম্বন্ধে মনে মনে চিন্তা করিতে করিতে তাহাতে ক্রমাগত প্রীতি বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তখন সেই বিষয়

---

(১) কাম এষ ক্রোধ এষ ইত্যাদিঃ। গীতা, ৩।৩৭।

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ ইত্যাদিঃ। গীতা, ১৪।১২

রক্ষা করিবার জন্য যে মনোবেগ হয়, তাহাই আসক্তি। আসক্তি জন্মিবার পরে উহার বিষয় বিনষ্ট হইলে, অথবা কোন কারণে তদ্গ্রাহক ইন্দ্রিয়ের বহির্ভূত হইলে, সেই বিষয় পাইবার জন্য যে বলবতী ইচ্ছা তাহাই তৃষ্ণা বা কামনা। ঐ বিষয় কি প্রকারে পাইবে, কখন পাইবে, কোথায় পাইবে এবং পাইলেই বা কি প্রকারে ভোগ করিবে, ইত্যাদি রূপ যে চিন্তা বা সঙ্কল্প, তাহা হইতেই কামনার উদয় হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়, মন, ও বুদ্ধি কামনার অধিষ্ঠান স্থান (১)। ইন্দ্রিয়-বিশেষের চরিতার্থতার জন্য যে আকাঙ্ক্ষা, যদিও সাধারণতঃ তাহাকেই কাম বা কামরিপু বলিয়া থাকে, কিন্তু কামনামাত্রকেই কাম বলিয়া বুঝিতে হইবে।

কামনার বিষয় প্রাপ্তির পক্ষে যদি ব্যাঘাত ঘটে, তাহা হইলেই ক্রোধের উদয় হয়। যাহার সত্ত্বগুণ প্রবল, তাহার ক্রোধের উদয় হয় না, যদিও হয়, তাহা হইলে, মৃদুমন্দ বায়ুসঞ্চালনে যেমন সরোবরের প্রশান্ত বক্ষ ঈষৎ উদ্বেলিত হইলেও অবিলম্বেই স্বাভাবিক স্থিরভাব ধারণ করে, তাহার হৃদয়েও তদ্রূপ ঘটিয়া থাকে। রজোগুণবশতঃ ক্রোধে ইন্দ্রিয়গণ বহির্ম্মুখীন হইয়া চঞ্চলতা প্রাপ্ত হয়, তাহারই বশবর্ত্তী হইয়া ক্রোধান্ধ ব্যক্তির যদি সত্ত্বগুণের উদয় না হওয়ায় সে ক্রোধ দমন করিতে না পারে, তাহা হইলে উহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য করে. তাহার বশেই সে দুষ্কর্ম্ম করিয়া থাকে, সেই জ্ঞানশূন্যতা তমোগুণবৃদ্ধিবশতঃ হইয়া থাকে, ইহা মোহের কার্য্য। ঐ কার্য্য করার পরে যদি সত্ত্বগুণের প্রবলতা হয়, তাহা হইলে দুষ্কার্য্য করিয়াছে এই ভাবিয়া জ্ঞানের উদয় হয়, তখন মোহ দূরে যায়, ক্রোধ প্রশমিত হয় এবং মন শান্তভাবাপন্ন হয়। ক্রোধের প্রশমন তমোগুণ

(১) ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে। গীতা, ৩।৪০

অথবা রজোগুণোদ্ভূত অন্ত কোন মানসিক বৃত্তিদ্বারাও হইতে পারে। যেমন, যখন কাহারও ক্রোধের উদ্রেক হইয়াছে সেই সময়ে তাহার সম্মুখে কোন চিত্তাকর্ষক পদার্থ উপস্থিত হইলে, তাহা পাইবার জন্ত সে উৎসুক হয় এবং ক্রোধের বিষয় ভুলিয়া যায়। রজোগুণকে পরাভব করিয়া তমোগুণ জন্মিলেই ক্রোধবশতঃ হিতাহিতজ্ঞানের লোপ হইয়া অন্তঃকরণ মোহাচ্ছন্ন হয়, সেই মোহ হইতে স্মৃতিভ্রংশ, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইতে মনুষ্য মৃততুল্য হয়, তখন তাহার মনুষ্যত্ব লোপ হয় (১)।

কামনা অত্যন্ত বলবতী হইয়াই লোভ জন্মে। যদি লোভবশতঃ হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া যে কোন প্রকারেই হউক লোভের বস্তু পাইবার জন্য মন ব্যগ্র হয়, তাহা হইলে রজোগুণ তমোগুণদ্বারা পরাভূত হইয়া থাকে, তখন পরদ্রব্যাদি-অপহরণরূপ দুষ্কার্য্য করিতেও লোভী ব্যক্তি কুণ্ঠিত হয় না। সত্ত্বগুণের প্রবলতাদ্বারা লোভের প্রশমন হইয়া থাকে। যে মনুষ্যের সত্ত্বগুণ স্থায়ীরূপে যতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে, ততই তাহার লোভ ক্রমশঃ হৃদয় হইতে দূরীভূত হইয়া অবশেষে কামনা পর্য্যন্তও ক্রমে ক্রমে সমূলে উৎপাটিত হয়। কামনা গেলেই আর ক্রোধলোভাদির উৎপত্তি হইতে পারে না।

মোহ হইতেই মাৎসর্য্য জন্মে। অপরের ভাল হইলে আমার কোন অনিষ্ট নাই এবং তাহার মন্দ হইলেও আমার কোন লাভ নাই, তথাপি যদি আমি অপরের ভাল দেখিতে না পারি এবং তাহার মন্দ হউক ইহাই যদি ইচ্ছা করি, তাহা হইলে মনের যে বৃত্তি হয়, তাহাই মাৎসর্য্য ; পরশ্রীকাতরতা এই মাৎসর্য্যের অন্তর্গত।

---

(১) গীতা, ২।৬২, ৬৩ ; ৭।৪।৩।

কালস্রোতে ভাসমান তুমি, আমি ও অন্যান্য জীবসকল কে এবং কোথায় কি চরম উদ্দেশ্যে চলিয়াছে ?

আমি কে ? তুমি কে ? অন্যান্য জীবই বা কে ? প্রকৃত 'আমি' কে ? আকাশাদি পঞ্চস্থূলভূত হইতে উৎপন্ন যে রক্তমাংসময় পাঞ্চভৌতিক স্থূলশরীর, আহারের দ্বারা বর্দ্ধিত হয় বলিয়া, যাহাকে অন্নময় কোষ বলে, তাহাই কি আমি ? না। এই শরীরের ক্রমাগত পরিবর্ত্তন ঘটি-তেছে, কিন্তু আমি যাহা তাহাই থাকিয়া যাইতেছি; সুতরাং এই স্থূলশরীর আমি নহি। লিঙ্গশরীরের মধ্যগত বাক্‌পাণিপ্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়সমন্বিত যে পঞ্চপ্রাণ, যাহাকে প্রাণময় কোষ বলে, এবং যাহা ক্রিয়াশক্তিশালী ও কার্য্যকরণশীল তাহাই কি আমি ? না। ঐ সমস্ত ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ-প্রাণের পরিবর্ত্তন হইতেছে এবং নিদ্রাবস্থা প্রভৃতির ন্যায় অনেক অবস্থায় উহারা কার্য্য করে না, কিন্তু তখনও ত আমি বিদ্যমান থাকি-তেছি, আমার জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন তখনও কার্য্য করিতেছে ; সুতরাং প্রাণময় কোষও আমি নহি। আকাশাদি পঞ্চভূতের সত্ত্বগুণের কার্য্য-স্বরূপ দর্শনাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়সমন্বিত যে মন, যাহাকে মনোময় কোষ বলে, যাহা ইচ্ছাশক্তিশীল এবং করণস্বরূপ, তাহাই কি আমি ? না। নানা সময়ে নানাপ্রকার মানসিক বৃত্তির পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, কিন্তু আমি যাহা তাহাই থাকিতেছি। যেমন নিদ্রাবস্থায় বহুবিধ স্বপ্ন দেখিতেছি, জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা অলীক বস্তু অনুভব করিতেছি, কিন্তু নিদ্রাভঙ্গে বুঝি-তেছি যে সে সমস্ত কিছুই নহে, তখন আমার পূর্ব্বস্মৃতির উদয় হইতেছে এবং ঐ সমস্ত স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু ও ব্যক্তি অলীক বলিয়া জ্ঞান হইতেছে, স্বপ্না-বস্থাতে আমি বর্ত্তমান ছিলাম এবং তাহার পরেও আমি বর্ত্তমান থাকিতেছি; সুতরাং মনোময় কোষও আমি নহি। ঐ যে নিদ্রাভঙ্গে

স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু ও ব্যক্তি অলীক বলিয়া অনুভব হইতেছে, তাহা, নিশ্চয়াত্মিকা যে অন্তঃকরণবৃত্তি, যাহাকে বুদ্ধি বলে, তাহারই কার্য্য। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত বর্ত্তমান ঐ যে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, যাহাকে বিজ্ঞানময় কোষ বলে, যাহা জ্ঞানশক্তিমান্ ও কর্ত্তৃত্বশক্তিসম্পন্ন তাহাই কি আমি? না। সুষুপ্তির অবস্থায় লিঙ্গশরীরবিষয়ক জ্ঞান থাকে না, কিন্তু সুষুপ্তির সাক্ষিস্বরূপ আমিত বিদ্যমান আছি; সুতরাং বিজ্ঞানময় কোষও আমি নহি। পূর্ব্বোক্ত কারণশরীরে যে অবিদ্যা বিদ্যমান আছে, সেই অবিদ্যার কার্য্যস্বরূপ প্রীতি আমোদ প্রভৃতি কতিপয় বৃত্তির সহিত বর্ত্তমান যে মলিন সত্ত্বগুণ, যাহাকে আনন্দময় কোষ বলে, তবে তাহাই কি আমি? না। যে সময়ে সমাধির অবস্থা হয়, সেই সময়ে আনন্দময় কোষস্বরূপ কারণশরীরের জ্ঞান থাকে না, কিন্তু তথাপি সেই সমাধিঅবস্থায় সাক্ষিস্বরূপ স্বপ্রকাশমান আমি বিদ্যমান আছি; সুতরাং আনন্দময় কোষও আমি নহি। অন্নময়াদি ঐ পঞ্চকোষ হইতে স্বতন্ত্র যে আত্মা, তাহাই প্রকৃত আমি (১)। আমি আত্মা, আমি দেহ হইতে স্বতন্ত্র। দেহই সুখদুঃখ অনুভব করে, আত্মাকে সুখদুঃখ স্পর্শ করিতে পারে না। আত্মারূপী আমার হ্রাস বা বৃদ্ধি, উৎপত্তি বা বিনাশ, এবং জন্ম বা মরণ, কিছুই নাই। আমার নশ্বর শরীরেরই ঐ প্রকার ঘটিয়া থাকে, শরীরের বিনাশ হইলেও আমার বিনাশ নাই। আমাকেও কেহ হনন করিতে পারে না এবং আমিও কাহাকেও হনন করি না; শরীরই হত হয় এবং এক শরীরই অপর শরীরকে হনন করে। আমি ছিন্ন, ক্লিন্ন, দগ্ধ বা শুষ্ক হই না, অর্থাৎ

---

(১) ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থাঃ অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ ইত্যাদি।

কঠোপনিষৎ ৩য় বল্লী।

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিত্যাদিঃ। গীতা, ৩।৪২।

অস্ত্রসকল আমাকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি আমাকে দগ্ধ করিতে পারে না, জল আমাকে আর্দ্র করিতে পারে না এবং বায়ু আমাকে শুষ্ক করিতে পারে না। আমি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের এবং উভয়াত্মক মনেরও অগোচর। আমি অবিনাশী, সর্ব্বব্যাপী, স্থির, অচল ও অনাদি (১)।

যখন আমি উপরিউক্ত পঞ্চকোষ হইতে আমাকে স্বতন্ত্র জ্ঞান করিতে পারিব, তখনই আমি আমাকে বুঝিতে পারিব, আমিই যে আত্মা তাহা উপলব্ধি করিতে পারিব, তখন আমিও যাহা, আত্মাও তাহাই এবং পরব্রহ্ম বা পরমাত্মাও তাহাই—তিনই অভেদ ; তখনই আমি "সোহহং" বলিবার প্রকৃত অধিকারী হইব। আমিও যে আত্মা, তুমিও তোমার পক্ষে সেইরূপ আত্মা, তুমিও যখন পঞ্চকোষরূপ পঞ্চাবরণ হইতে উন্মুক্ত ও নির্লিপ্ত আত্মা হইবে, উহা হইতে তোমার আত্মা স্বতন্ত্র এই জ্ঞান যখন তোমার হইবে এবং তদনুযায়ী কার্য্য করিতে পারিবে, তখন তুমিও পরব্রহ্ম হইতে অভেদ হইবে এবং তখনই তোমার প্রতি "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্য প্রযুক্ত হইতে পারিবে। এইরূপে তুমি, আমি ও সমস্ত পদার্থ এক, এবং পরব্রহ্মের সহিত অভিন্ন। ঐ প্রকার জ্ঞান যখন হইবে তখনই "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (২) এই মহাবাক্যের সারমর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি হইবে।

আমরা পঞ্চকোষকেই আমি ভাবিয়া থাকি, ইহা অহংজ্ঞান বা অহঙ্কারের কার্য্য, ঐ অহংজ্ঞান বা পার্থক্যজ্ঞান লোপ করিতে পারিলেই,—আমার ঐ "অহংত্ব" টুকু হারাইতে পারিলেই,—আমি প্রকৃত "আমি," তখন আর আমার পক্ষে তোমায়, আমায়, সর্ব্বজীবে ও পরব্রহ্মে

---

(১) অবিনাশিতু তদ্বিদ্ধীত্যাদয়ঃ। গীতা, ২।১৭—২৭

(২) ছান্দোগ্যোপনিষদ্, ৩।১৪।

কোনই ভেদ থাকিবে না। যখন আমি সমস্তই এক ভাবিতে পারিব, যখন সকলেরই পৃথক্‌ভাব ভুলিয়া গিয়া সমস্ত জীব ও পদার্থকে একমাত্র আমাতেই অবস্থিত অবলোকন করিতে পারিব, যখন তাঁহা হইতেই সকলের বিস্তার বুঝিতে পারিব, তখন আর আমার পক্ষে আমি বা ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোন পদার্থই থাকিবে না (১)। যত দিন আমার ঐ প্রকার অবস্থা না হইবে, ততদিন আমাকে শরীর হইতে শরীরান্তর গ্রহণ করিয়া, পুনঃ পুনঃ জন্মপরিগ্রহ করিয়া, নানা প্রকার কষ্টভোগ করিতে হইবে। আমার অহংজ্ঞান লোপ হইয়া অজ্ঞানতা দূর হইলে আর আমাকে কষ্ট পাইতে হইবে না, সমস্ত দুঃখ দূর হইয়া যাইবে, আমার তখন নিদ্রাভঙ্গ হইবে, তখন আর স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু দেখিব না, প্রকৃত বস্তু দেখিব, আমাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিব, আর পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণরূপ গতাগতি করিতে হইবে না, আমি চিরশান্তি লাভ করিব।

কেবল 'প্রকৃত আমিই' যে ব্রহ্ম, তাহা নহে, সামান্য পার্থিব পদার্থ হইতে ঈশ্বর পর্য্যন্ত সমস্তই একমাত্র ব্রহ্মেরই মায়াবৃত অধ্যাসমাত্র, ইহারা ব্রহ্ম হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে, সুতরাং কেবলমাত্র ব্রহ্মই আছেন আর কিছুই নাই। অবিদ্যা প্রতিবন্ধক হইয়া ব্রহ্মকে দেখিতে দিতেছে না, কিন্তু ব্রহ্মবস্তুতে নিখিল বিশ্ব দেখাইতেছে। যাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহা ব্রহ্ম, কিন্তু ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করিয়াও ভ্রমবশতঃ ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিতেছি না, কেবল মানুষ, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, নদী, পর্ব্বত ইত্যাদি বুঝিতেছি; মায়া এই ভ্রান্তির কারণ।

ব্রহ্মের সহিত আমার অভেদজ্ঞান, অর্থাৎ জড়জগৎ কল্পনাপ্রসূত ও আমিই ব্রহ্ম এই জ্ঞানই, তত্ত্বজ্ঞান, এই জ্ঞানের উদয় হইলে, জীব

---

(১) যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমিত্যাদিঃ। গীতা, ১৩।৩০।

চিরশান্তি লাভ করে। জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভক্ত বালক প্রহ্লাদ, ইহা অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন, পরমাত্মা হইতে তাঁহার ভেদজ্ঞান লোপ হইয়াছিল, সেই জন্যই তিনি বলিতে পারিয়াছিলেন, "সেই অনন্তপুরুষ সর্ব্বব্যাপী, সুতরাং তিনিই আমি। আমা হইতেই সমুদায় উৎপন্ন, আমিই সমুদায়, আমাতেই সমুদায় আছে, এবং আমি নিত্য ও অক্ষয়। পরমাত্মাতেই আমার আশ্রয়, আমি ব্রহ্ম, আমি সৃষ্টির পূর্ব্বেও বিদ্যমান ছিলাম এবং মহাপ্রলয়ের পরেও থাকিব; আমিই পরমপুরুষ (১)।"

পরব্রহ্মের সহিত নিজ অভেদজ্ঞান অতি দূরের কথা, প্রহ্লাদের অবস্থা আমরা ধারণা করিতেও অক্ষম, তোমার আমার ন্যায় যে সকল জীব এই স্থূলশরীরকেই আমিজ্ঞান করে, যাহারা কোষস্থিত

---

(১) सर्व्वगत्वादनन्तस्य स एवाहमवस्थितः ।
मत्तः सर्व्वमहं सर्व्वं मयि सर्व्वं सनातने ॥
अहमेवाक्षयो नित्यः परमात्मात्मसंश्रयः ।
ब्रह्मसंज्ञोऽहमेवाग्रे तथान्ते च परः पुमान ॥
विष्णुपुराणम्, १ । १९ । ८५, ८६ ।

Let me tell you what's man's supreme vocation.
There was no world 'tis my creation.
It was I who raised the sun from out the Sea,
The moon began its changeful course with me.
Gœthe.

I am the owner of spheres of seven stars and solar years,
Of Lord Christ's heart and Shakespeare's strain,
Of Cæsar's hand and Plato's brain.
Emerson

কীটের ন্যায় নিজকৃত এই পঞ্চকোষের মধ্যে আবদ্ধ ও তাহাতেই আসক্ত হইয়া আছে, তাহারা ঐ জ্ঞানের অধিকারী নহে; যাহারা যতদূর অধিকারী তাহাদিগকে ততটুকু পর্য্যন্ত বলিয়া, সেই পর্য্যন্ত বুঝাইয়া, পৃথক্ পৃথক্ শাস্ত্রকারগণ শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন ও তাহাদিগকে ততটুকু পর্য্যন্ত বুঝাইয়াছেন। সদ্‌গুরু শিষ্যের শক্তি ও জ্ঞান অনুযায়ী উপদেশ দিয়া শিষ্যকে চরম লক্ষ্যের দিকে লইয়া যান, এবং তাহার নিকট আপাততঃ অপ্রীতিকর হইবে বলিয়া, কোন্ চরম ও বিশাল উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য, তাহাকে সেই অনন্ত পথে লইয়া যান, তাহাকে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে দেন না, অথচ তাঁহারই পরিচালনায় ক্রমাগত ঐ লক্ষ্যের দিকে সে অগ্রসর হয় এবং যাইতেও প্রীতি অনুভব করে। এই প্রকারে লইয়া গিয়া অবশেষে তিনি তাহাকে মুক্তিরূপ চিরশান্তি প্রদান করেন। অনন্ত সুখ বা পরমানন্দ লাভ করাই জীবের চরম উদ্দেশ্য; যাহাতে জীব তাহা পাইতে পারে, শাস্ত্রসমূহ তাহারই উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং সদ্‌গুরুও তদনুযায়ী ধীরে ধীরে শিষ্যকে সেই লক্ষ্যের দিকে লইয়া গিয়া থাকেন। তুমি, আমি, সকল জীবই সেই বিশাল পথের পথিক, সকলেই সেই চরম লক্ষ্যের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছি, আমাদের মধ্যে কেহ বা লক্ষ্য বুঝিতে পারিতেছে, কেহ বা বুঝিতে পারিতেছে না, কিন্তু সকলেই সেই দিকে যাইতেছে, যে ব্যক্তি সদ্‌গুরুর কৃপা লাভ করিতে অথবা নিজ শক্তি ও জ্ঞানের উপযোগী শাস্ত্রোপদেশ অবলম্বন করিতে না পারিবে, সে পথভ্রান্ত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট পথিকের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইবে এবং বহুজন্মজন্মান্তর ধরিয়া অনন্ত কালস্রোতে ভাসিতে থাকিবে, সুতরাং চরম লক্ষ্যস্থানে উপনীত হইতে তাহার বিলম্বও ঘটিয়া যাইবে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, কাহারও কাহারও মতে জীবাত্মা নানা, অর্থাৎ

এক একটি শরীরের অধিষ্ঠাতা এবং শরীর হইতে পৃথক্ আত্মাস্বরূপ এক একটি পুরুষ আছেন, সুতরাং তুমি আমি প্রভৃতি সকল জীব এক একটি ভিন্ন ভিন্ন আত্মা, তোমার আত্মা হইতে আমার আত্মা পৃথক্, এই প্রকার সকল জীবেরই আত্মা পরস্পর বিভিন্ন, এবং এই সকল আত্মা হইতে পরমেশ্বর বা পরমাত্মা স্বতন্ত্র। ঐ যে এক একটি প্রকৃতিসম্বলিত পুরুষ, তাঁহাদের মতে, তাহাই আমি, তাহাই তুমি, তাহাই প্রত্যেক জীব। যখন ঐ পুরুষ আপনাকে প্রকৃতির সহিত সম্মিলিত করিয়া অভেদজ্ঞান লাভ করেন, তখনই সুখদুঃখাদির উৎপত্তি হয়। পুরুষ নিজে নির্লিপ্ত, কিন্তু প্রকৃতিযুক্ত হইয়াই লিপ্তের ন্যায় ঐ সমস্ত ভোগ করেন। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই তাপত্রয় সর্ব্বদাই পুরুষকে পীড়ন করে। আধ্যাত্মিক দুঃখ দুই প্রকার, যথা শারীরিক ও মানসিক, রোগাদিজনিত যে দুঃখ, তাহা শারীরিক এবং কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয়, ঈর্ষ্যা, বিষাদ এবং প্রিয়বস্তুর অদর্শন ইত্যাদির জন্য যে দুঃখ, তাহা মানসিক দুঃখ। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, সর্প, কীট, স্থাবরাদি দ্বারা যে দুঃখ তাহা আধিভৌতিক এবং যক্ষ, রাক্ষসী, বিনায়ক গ্রহাদির আবেশনিবন্ধন দুঃখ আধিদৈবিক দুঃখ। এই তাপত্রয়ের অত্যন্তনিবৃত্তিই মুক্তি। প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদজ্ঞানই ঐ মুক্তির কারণ, সেই ভেদজ্ঞান উপস্থিত হইলে পুরুষ আর আপনাকে কর্ত্তা ও ভোক্তা মনে করেন না, সুতরাং উক্ত ত্রিবিধ দুঃখের সম্পূর্ণরূপে অবসান হয়। যতদিন পর্য্যন্ত ঐ প্রকার না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত পুরুষকে কর্ম্মফলবশতঃ পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া কষ্টভোগ করিতে হয়। ঈশ্বরের পূজা, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি দ্বারা উক্ত তাপত্রয়ের বিনাশ সাধিত হয়, তখন আর জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখত্রয় ভোগ করিতে হয় না, তাঁহাদের মতে ইহাই মুক্তি, ইহাই জীবের চরম উদ্দেশ্য।

কেহ কেহ বলেন, তুমি, আমি, সমস্ত জীব পরমেশ্বর বা পরমাত্মা হইতে স্বতন্ত্র, তাঁহাকর্ত্তৃক পৃথক্ উপাদানদ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে এবং চিরদিনই স্বতন্ত্রভাবে থাকিবে। জীব কর্ম্মফলবশতঃ পুনঃ পুনঃ ইহ সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে থাকে। এই প্রকারে বারম্বার গতাগতি এবং বিবিধ যন্ত্রণাভোগ করিতে করিতে, ঈশ্বরের উপাসনা করিতে তাহার প্রবৃত্তি হয় এবং তাঁহার উপাসনা করিতে করিতে তাঁহার প্রতি তাহার ঐকান্তিকী ভক্তি জন্মে। তখন তাহার এই প্রকার জ্ঞান হয় যে, তিনিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্বপ্রধান এবং স্বতন্ত্র, অর্থাৎ কাহারও তিনি অধীন নহেন, অপর সকলেই তাঁহার অধীন, এবং তিনি শক্তি, বিজ্ঞান, সুখাদি গুণসমূহের আধারস্বরূপ। ঐ সমস্ত সম্যক্ জানিতে পারিলে বিষয়ের প্রতি তাহার আসক্তি একবারে দূর হইয়া যায় এবং নৈরাশ্যের উদয় হয়, এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে কর্ম্মফল সম্পূর্ণরূপে লোপ হইলে, দেহান্তে সে তাঁহার সহিত একত্র বাস করিয়া তাঁহার সেবা করে, তখন তাহার সমুদায় দুঃখ দূরে যায় এবং নিত্যসুখ উপভোগ করে, আর তাহাকে জন্মগ্রহণ করিয়া অসহ্য যন্ত্রণাভোগ করিতে হয় না। ইহাই তাঁহাদের মতে পরমপুরুষার্থরূপ মোক্ষ বা মুক্তি।

জীব ও পদার্থ কি প্রকারে কালস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে।

শত বৎসর নহে, সহস্র বৎসর নহে, যুগযুগান্তর ধরিয়া—এক জন্ম নয়, শত জন্ম নয়, জন্মজন্মান্তর ব্যাপিয়া,—আমি অসীম অনন্ত কালের স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছি; যতই যাইতেছি, ততই ক্রমাগত বহিরাবরণের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইতেছে, অবশেষে পুরাতন আবরণ একবারে

ত্যাগ করিতেছি এবং ভাসমান অন্যান্য জীব হইতে অদৃশ্য হইতেছি; আবার নূতন আবরণে আবৃত হইয়া পুনরায় দৃশ্য হইতেছি (১)। এইরূপে পুনঃ পুনঃ নানাপ্রকার নূতন নূতন আবরণে আবৃত হইয়া আমি ভাসিয়া আসিতেছি ও যাইতেছি। এই প্রকার একমাত্র আমিই নহি, কত অসংখ্য অসংখ্য জীব, কত অসংখ্য অসংখ্য পদার্থ যে আমার মত ভাসিয়া যাইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। স্রোতে ভাসিয়া যাইতে যাইতে বহুবার বহুবিধ জীব, বহুবিধ বস্তু, আমার নিকট আসিতেছে, আমিও তাহাদের নিকট যাইতেছি; তাহারা কেহ কেহ আমার সহিত সংশ্লিষ্ট হইবার চেষ্টা করিতেছে, আমিও আবার তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও সহিত সংশ্লিষ্ট হইবার চেষ্টা করিতেছি। ভাসিয়া যাইতে যাইতে, ঐ প্রকারে কতকগুলির সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া, তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া চিরকালই থাকিবার জন্য বহুবার বহুকামনা করিতেছি, নানাপ্রকার আকাঙ্ক্ষা করিতেছি; কিন্তু কালের সেই প্রখর স্রোতে অধিককাল সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকিবার সাধ্য কাহারও নাই, সুতরাং সেই স্রোত উহাদিগকে বিচ্ছিন্নকরতঃ তন্মধ্যে এক একটিকে নিমজ্জিত ও অদৃশ্য করিয়া, পুনরায় নূতন আবরণে আবৃতকরতঃ উপরে

---

(১) तद्यथा तृणजलायुका तृणस्यान्तं गत्वान्यमाक्रममाक्रम्यात्मानमुपसंहरत्येवमेवायमात्मेदं शरीरं निहत्याविद्यां गमयित्वान्यमाक्रममाक्रम्यात्मानमुपसंहरति। बृहदारण्यकोपनिषत्।

যেমন তৃণজলৌকা (ছিনে জোঁক) একটি তৃণের অন্তে গিয়া অন্য আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আপনাকে টানিয়া লয়, সেই রূপ এই আত্মা এই শরীরকে ত্যাগ করিয়া অবিদ্যা-বশতঃ অন্য আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আপনাকে টানিয়া লয়।

रजौ जित्वन् पदैकेनेत्यादिः। भागवतम्, ৭।২।

वासांसि जीर्णानीत्यादिः। गीता, ২।২২

উঠাইতেছে এবং ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। অদৃশ্য হইবামাত্র কেহ বা অনতিবিলম্বে কেহ বা কিয়ৎবিলম্বে কালস্রোত কর্তৃক উত্থাপিত হইয়া, ইহ জগতের অন্যান্য ভাসমান জীবগণের দৃষ্টিপথে উপনীত হইতেছে। তাহারা পুনরায় নূতন আবরণে আবৃত হইয়া দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইবার সময়ে কিয়ৎকাল অন্য জীবের আবরণের অভ্যন্তরে অবস্থান করিয়া বহিরাগমন করতঃ, কতকগুলি তাহা হইতে পৃথগ্‌ভাবে এবং অধিকাংশই তাহার সহিত কিয়ৎকাল এক সঙ্গে স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। পূর্ব্ব সংশ্লিষ্ট অবশিষ্ট জীবগণেরও ক্রমে ক্রমে ঐ প্রকার ঘটিতেছে। যাহারা কামনারাশি লইয়া অন্তর্হিত হইতেছে, তাহাদেরই এইরূপ ঘটিতেছে, তাহারাই পুনরায় দৃশ্যমান হইতেছে। সকাম জীব যখন নূতন মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া ভাসিয়া উঠিয়া দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইতেছে, তখন সেই স্রোত পুনরায় তাহার পূর্ব্ব জন্মের কোন পরিচিত বা অপরিচিত জীবকে নিকটে আনিয়া তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট করিতেছে। এই প্রকারে আমি ও আমার ন্যায় অন্যান্য সকলেই ক্রমাগতই কালের স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে।

জীব পুনঃ পুনঃ কেন ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে।

জীব ঈপ্সিত বস্তু লাভ এবং অনীপ্সিত বস্তু ত্যাগের জন্য লালায়িত। যাহাকে তাহার কোন ইন্দ্রিয়দ্বারা গ্রহণ করিলে—যাহার সহিত তাহার কোন ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলে—সুখ হইবে মনে করিতেছে, তাহাই পাইবার যে তৃষ্ণা, তদ্দ্বারাই সে বেগে ধাবিত হইতেছে, এই তৃষ্ণাকেই

রাগ বা অনুরাগ (attraction) কহে(১)। আর যাহাকে কোন ইন্দ্রিয়দ্বারা গ্রহণ করিলে তাহার দুঃখ হইবে মনে করিতেছে, তজ্জন্ত তাহাকে ত্যাগ করিবার যে ইচ্ছা হইতেছে, সেই ইচ্ছাবশতঃ সে তাহাকে ছাড়িয়া দূরে যাইবার চেষ্টা করিতেছে। এই ত্যাগ করিবার ইচ্ছাকেই বিরাগ বা দ্বেষ (repulsion) কহে। ঐ অনুরাগ রজোগুণসমুদ্ভব এবং দ্বেষ তমোগুণোদ্ভূত। এই দুইটি হইতেই সংসার সৃষ্ট হইতেছে, এই দুইটীই যত অনর্থের মূল, ইহাতেই কেবল জীবকে ছুটাছুটি করাইতেছে, তাহাকে স্থির হইতে দিতেছে না, তাহাতেই সে পুনঃ পুনঃ দৃশ্য ও অদৃশ্য হইতেছে, কেবলই সে ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে (২)।

যাহা কোন ইন্দ্রিয়ের প্রীতিকর, তাহাই মনেতে চিন্তা করিতে করিতে, মনুষ্যের সেই বিষয়ে আসক্তি জন্মে। আসক্তি হইতে কামনা উৎপন্ন হয়, এবং কামনা হইতে ক্রোধাদি নানাপ্রকার ভাবের উদয়

---

(১) सुखाद्रागः। वैशेषिकदर्शनम्, ६।२।१०।

সুখ হইতেই অনুরাগ।

(২) रागविरागयोर्योगः सृष्टिः। सांख्यसूत्र, २य।९ सूत्र।

রাগ ও বিরাগের যোগই সৃষ্টি।

संसारो भवति राजसाद्रागात्। सांख्य, ४५।

রজোগুণপরিণাম অনুরাগের ফল সংসার।

इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे इत्यादि। गीता, ३।३४

यत् किञ्चिदुदितं लोके यन्मन्यमथवा दिवि।

तत् सर्वं प्राप्यते राम रागद्वेषपरिक्षयात्॥ योगवाशिष्ठम्।

হে রাম! ইহ লোকে যাহা কিছু প্রাপ্য, বা স্বর্গলোকে যাহা মননীয়, রাগদ্বেষ ক্ষয় হইলে তৎসমস্তই পাওয়া যায়।

হইয়া থাকে (১), একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ঐ কামক্রোধাদি রিপুগণদ্বারাই নানাপ্রকার চিত্তবৃত্তির উদয় হয়, সেই জন্যই জীবের অন্তরে আবরণের উপর আবরণ পড়ে, এবং এক একটি অন্তরাবরণ ছাড়িয়া গেলেও তৎপরিবর্ত্তে নূতন নূতন আবরণ আসিয়া সঞ্চিত হয়। ঐ চিত্তবৃত্তিরূপ অন্তরাবরণবশতঃই জীবের ক্রমাগত বহিরাবরণের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, এবং সেই জন্যই সে নিত্য নূতন মূর্ত্তিরূপ বহিরাচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হইতেছে। কোন জীব যদি কামনা সমূলে উৎপাটন করিতে পারে, তাহা হইলেই তাহার সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা ঘুচিয়া যায়, আর তাহাকে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে হয় না, সে স্থির হইয়া থাকিতে পারে, সে শান্তিলাভ করিতে পারে (২)। কামনাদিযুক্ত জীব যখন অদৃশ্য হইতেছে, তখন তাহার পুরাতন বহিরাবরণ ছাড়িয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু অন্তরাবরণ যেমনকার তেমনই থাকিতেছে। বহিরাবরণ ত্যাগ করিয়া অদৃশ্য হইলেও পরিত্রাণ নাই, একবারে অন্তরাবরণ নির্ম্মুক্ত না হইলে নিস্তার নাই। ঐ অন্তরাবরণবশতঃই সে আবার নূতন মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে, পুনরায় দৃশ্য হইয়া ছুটাছুটি করিতেছে।

যেমন বায়ু সঞ্চরণকালে পুষ্পাদি হইতে গন্ধবিশিষ্ট সূক্ষ্মাংশসকল গ্রহণ করিয়া গমন করে, তদ্রূপ জীবাত্মা দেহত্যাগ করিয়া যাইবার সময়ে মন ও ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়, তখন বহিরাবরণ পড়িয়া থাকে, দেহস্থ প্রাণাদি বায়ুসকল বাহ্য বায়ুতে মিলিয়া যায়। পূর্ব্বদেহধারণকালে শুভাশুভ কর্ম্মের ফলকামনাবশতঃ সুখদুঃখের যে প্রতিকৃতি মনে অঙ্কিত হইয়াছে, তত্তদুপযোগী বিষয় ভোগ করিবার জন্য অন্য স্থূল দেহকে আশ্রয় করিতে সে বাধ্য হয়, এবং সেই জন্য

---

(১) ध्यायतो विषयान् पुंस इत्यादि। गीता, २।६२, ६३।

(২) विहाय कामान् यः सर्वानित्यादिः। गीता, २।७१

মনোময় সূক্ষ্মশরীর লইয়া তাহাতে প্রবেশ করে ও পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত প্রকৃতির অনুরূপ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে (১)।

জীব ইন্দ্রিয়গণদ্বারা যে সকল বিষয় গ্রহণ করিতেছে, ও তজ্জন্য যে সুখদুঃখ অনুভব করায় তাহার অনুরাগ দ্বেষাদি জন্মিতেছে, সেই সকল সুখদুঃখের, এবং প্রত্যেক সুখদুঃখ যে সমুদায় বিষয়ের দ্বারা সাধিত হইতেছে, সেই সকল বিষয়ের, প্রতিকৃতি, তাহার চিত্তপটে অঙ্কিত রহিয়া যাইতেছে; ইহাকেই সংস্কার বলে। কালের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে প্রত্যেক জীব কতকাল হইতে এই সংস্কাররাশি সঞ্চয় ও ক্ষয় করিয়া আসিতেছে তাহা নির্ণয় করা কঠিন। এই সংস্কারবশেই জীব পুনঃ পুনঃ দৃশ্য ও অদৃশ্য হইতেছে এবং কালের স্রোতে ভাসিতেছে ও ছুটাছুটি করিতেছে। জীব অদৃশ্য হইতেছে, কিন্তু পূর্ব্বসংস্কাররাশিতে জড়িত থাকিয়া, পূর্ব্ব কামনাসমষ্টি কর্তৃক তাড়িত হইয়া, নূতন মূর্ত্তি গ্রহণ করতঃ দৃশ্য হইতেছে এবং পুনরায় প্রবাহে ভাসমান কোন জীব বা পদার্থের সহিত সংশ্লিষ্ট বা বিচ্ছিন্ন হইবার জন্য পূর্ব্বসংস্কারবশে ছুটিয়া যাইতেছে; শেষোক্ত প্রকারে সে পুনরায় প্রবল স্রোতের বেগে পড়ায় তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়া বহুদূরে ফেলিতেছে, কেন্দ্রস্বরূপ শান্তিময় আশ্রয় হইতে অনেক দূরে লইয়া যাইতেছে, যে শান্তিময় স্থানে যাইতে পারিলে সে স্থির হইতে পারে, সেস্থানে যাইতে পারিতেছে না।

---

(১) শরীরং যদবাপ্নোতীত্যাদিঃ। গীতা, ১৫।৮।

শান্তিময় আশ্রয় ও কালস্রোতে ভাসমান জীব।

কালস্রোতের কূলকিনারা কিছুই নাই। ইহা অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, অপ্রকাশিত অবস্থা হইতে প্রকাশমান হইয়া, অসীম হইতে সীমাবদ্ধের ন্যায় প্রতীত হইয়া, পরমাত্মাস্বরূপ চৈতন্য হইতে প্রতীয়মান হইয়া, তাঁহাকেই অবলম্বনপূর্ব্বক অনাদি হইতে আসিয়া, চতুর্দ্দিকে অনন্তে বহিয়া যাইতেছে। সেই যে পরমাত্মস্বরূপ কেন্দ্রস্থান, তাহা পৃথক্ না হউক, তথায় স্রোতের প্রখরতা ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইয়া একবারে ধীর, স্থির, শান্ত হইয়াছে। দূর হইতে বোধ হয় যে, ঐ শান্তিময় আশ্রয় এই অস্থির অশান্তিময় স্থান হইতে স্বতন্ত্র, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। জীব যখন শ্রান্ত হয়, তখনই সে শান্তি পাইবার জন্য লালায়িত হয়, এবং সেই শান্তিময় ধামে যাইবার জন্য, সেই শান্তিময় অবস্থা পাইবার জন্য, উদ্যোগ করে। সেই সময়ে প্রথমতঃ সে সেই স্থানকে স্বতন্ত্র বলিয়া অনুমান করে এবং তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে; কিন্তু যতই সে তাহার নিকটবর্ত্তী হয়, ততই, সে যাহাকে পৃথগ্‌ভাবে দেখিতেছিল, ক্রমে ক্রমে তাহার সহিত পার্থক্য অন্তর্হিত হওয়ায়, তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইয়া, সমস্তই এক দেখে, এমন কি, অবশেষে সে নিজেও এক হইয়া যায় (১)। যে বহুদূরে আছে, অস্বতন্ত্রভাবে দেখাত তাহার দূরের কথা, পৃথক্‌ভাবে মনে করিয়াও সে যে উহার কিছুই অনুভব করিতে পারিতেছে না; কেবল ছুটাছুটি করিতেই ব্যস্ত, অহরহঃ অসংখ্য অসংখ্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জীব ও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পদার্থ অন্তরে বাহিরে দেখিতেছে,

---

(১) ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি। বেদান্তসার।

ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন হইলে ব্রহ্মেই পরিণত হইয়া থাকে।

আর যে সে কিছুই দেখিতে পাইতেছে না, প্রকৃত চিন্তামণিকে তাহার অন্তর হইতে হারাইয়া, যাহা প্রকৃত নহে, তাহাকেই রত্নভ্রমে যত্নের সহিত হৃদয়ে রাখিতেছে।

জীবাত্মার প্রতি পরমাত্মার আকর্ষণী শক্তি।

পরমাত্মা হইতে জীব পৃথক্ বলিয়া বোধ হইলেও তাঁহার আকর্ষণী শক্তি জীবাত্মার প্রতি সর্ব্বদাই প্রযুক্ত হইয়া আছে, যাহা ক্ষুদ্র তাহা বৃহতের দিকে আকৃষ্ট হইয়া তদভিমুখে অগ্রসর হইয়া থাকে, ইহাই সাধারণ নিয়ম। সেই সর্ব্বব্যাপী অয়স্কান্তমণিত আমার প্রতি ক্রমাগতই আকর্ষণী শক্তি প্রয়োগ করিতেছে, তথাপি আমি আকৃষ্ট হইতেছি না কেন? তাহা হইতে দূরে গিয়া পড়িতেছি কেন? কেবলই বহুদূরে স্রোতের মুখে চলিয়া যাইতেছি—বেগে ভাসিয়া যাইতেছি কেন? আমাতে এমন কি আছে, যাহাতে সেই মহীয়সী আকর্ষণী শক্তিকেও বিফল করিতেছে? সেই মহতী আকর্ষণী শক্তি অপেক্ষা এমন কোন্ অধিকতর বলবতী আকর্ষণী শক্তি আছে, যাহাতে আমাকে বিপরীত দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে?

চুম্বক যাহাতে প্রযুক্ত হয়, তাহা যদি সমল হয়; যদি তাহা অন্য কোন ধাতুর সহিত মিশ্রিত বা কোন পদার্থ দ্বারা আবৃত থাকে, তাহা হইলে কি তাহা আকৃষ্ট হইতে পারে? আমি যদি অমল অনাবৃত লৌহসূচিবৎ হইতাম, যদি নির্ম্মল জীবাত্মা হইতাম, তাহা হইলে কি পরমাত্মাকর্ত্তৃক আকৃষ্ট না হইয়া আমি দূরে গিয়া পড়িতাম? আমি ত্রিগুণময়ী মায়ার মোহাবরণে গাঢ়রূপে আবৃত হইয়া রহিয়াছি, তজ্জনিত কামক্রোধাদিদ্বারা সমল হইয়া, সংস্কাররাশির আবরণে

আবৃত হইয়া আছি, সেই জন্যই সেই মহতী আকর্ষণী শক্তির কার্য্য বিফল হইতেছে, তাহাতে আমাকে আকর্ষণ করিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে পারিতেছে না,—সংস্কাররূপ আবরণকে সহজে আকর্ষণ করিতে পারে এমন অন্য কোন আকর্ষণী শক্তি আমার বাহ্য ও অন্তরাবরণকে আকর্ষণ করিতেছে এবং সেই সঙ্গে আমার জীবাত্মাকেও টানিয়া লইয়া যাইতেছে। স্রোতে যে সকল জীব ও পদার্থ ভাসিতেছে, তাহারাই আকর্ষণ করিয়া আমাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, ইহাতে আমি প্রবল স্রোতের মুখে গিয়া পড়িতেছি এবং শান্তিময় স্থান হইতে ক্রমশঃ দূরে চলিয়া যাইতেছি; ভাসমান জীব ও পদার্থের মধ্যে কাহাকেও বা ধরিবার জন্য ছুটিতেছি, আবার কাহাকেও বা ত্যাগ করিবার জন্য দূরে পলাইতেছি, কিন্তু যাহাকে আমি ত্যাগ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছি, সেই হয়ত আসিয়া আমার সহিত সংশ্লিষ্ট হইতেছে, অথবা যাহাকে গ্রহণ করিবার জন্য লালায়িত হইয়া বেগে ছুটিতেছি, তাহাকে হয়ত ধরিতে পারিতেছি না—উঃ তখন কি কষ্টই হইতেছে—কত দুঃখযন্ত্রণাই তখন অনুভব করিতেছি, মন একেবারে বিক্ষোভিত হইতেছে। যদি প্রিয় জীব বা পদার্থ ধরিতে পারিতেছি, তাহাতে কত সুখই অনুভব করিতেছি, এবং মনে মনে কল্পনা করিতেছি, অত্যুৎকট আকাঙ্ক্ষা করিতেছি, যে এই সুখ অনুভব করিতে করিতে, ঐ জীব ও পদার্থের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া, আমি অনন্তকাল চলিয়া যাইব; কিন্তু অহো! কি দুঃখ! যাহাকে এত কষ্ট করিয়া ধরিলাম, যাহার জন্য মনে মনে কত কল্পনাই করিলাম, তাহা হইতে হয়ত তখনই বিচ্ছিন্ন হইলাম, অথবা কিয়দ্দূর একত্র গিয়া পরস্পর বিশ্লিষ্ট হইলাম; এই প্রকার বিচ্ছিন্ন হওয়াতে আমি শোকে একবারে অধীর হইয়া পড়িতেছি। হয়ত সেই জীব বা পদার্থ আমাকে ছাড়িয়া অদৃশ্য হইয়া মগ্ন হইতেছে, অথবা আমিই অদৃশ্য

হইয়া স্রোতে নিমজ্জিত হইতেছি। যদি আমি ছাড়িয়া যাইতেছি, তাহা হইলে যে সকল প্রিয় জীব ও পদার্থকে ছাড়িয়া যাইতেছি, তাহাদিগকে দেখিয়া তাহাদিগকে মনে করিয়া, একবারে কষ্টে অভিভূত হইয়া চলিয়া যাইতেছি।

সুখদুঃখানুস্মৃতিরূপ যে সকল সংস্কাররাশি সঙ্গে লইয়া বহিরাবরণ-ত্যাগকরতঃ মগ্ন হইতেছি, সেই সকল সংস্কারের তাড়নায়, সেই প্রকার সুখ উপভোগ করিবার লালসায় এবং দুঃখ ত্যাগ করিবার কামনায়, তত্তদুপযোগী জীব বা পদার্থরূপ বিষয় গ্রহণ বা ত্যাগ করিবার জন্য ছুটিয়া ভাসমান হইয়া নূতন আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হইয়া পুনরায় আবির্ভূত হইতেছি এবং পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় ছুটাছুটি করিতেছি। এই প্রকারে ভোগের দ্বারা পূর্ব্ব সংস্কার কতকগুলি ক্ষয় করিয়া অবশিষ্টের উপরে আবার নূতন নূতন সংস্কার সঞ্চয় করিতেছি। এইরূপ সংস্কারের ভার বহিতে বহিতে কেবলই ভাসিয়া যাইতেছি। আমার ন্যায় অসংখ্য অসংখ্য জীবেরই অবস্থা এই প্রকার। যাহার সংস্কাররাশি একবারে ক্ষয় হইয়া যাইতেছে, সেই জীবাত্মা পরমাত্মাকর্ত্তৃক আকর্ষিত হইয়া তাঁহার সন্নিহিত হইতেছে, পরে একেবারে তাঁহাতেই মিশাইয়া যাইতেছে।

জীবগণের দেহাবরণের পরিবর্ত্তন এবং ভ্রূণাদিরূপে তাহার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা।

জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যবর্ত্তী কালে, অর্থাৎ যতক্ষণ জীব মগ্ন হইয়া ভাসিতে থাকে, সেই সময়ে, প্রতিনিয়তই অল্প পরিমাণে তাহার দেহরূপ বহিরাবরণের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, কিন্তু তাহা সহজে বুঝিতে পারা

যায় না ; কিয়ৎকালের পরিবর্ত্তনের সমষ্টি লইয়া দেহ ক্রমান্বয়ে ভ্রূণ, শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ় ও বার্দ্ধক্যরূপ কয়েকটি অবস্থা প্রাপ্ত হয়, এবং সেই সেই অবস্থাতে পরিবর্ত্তন সুস্পষ্টরূপে লক্ষিত হইয়া থাকে। জন্মকালে জীব সম্পূর্ণরূপ নূতন বহিরাবরণে আবৃত হইয়া দৃশ্য হয়, তৎপরে অনবরত পরিবর্ত্তন হইতে হইতে ঐ আবরণ ক্রমান্বয়ে পূর্ব্বোক্ত কয়েকটি অবস্থা অতিক্রম করিয়া যখন মৃত্যুকালে পরিবর্ত্তনের পরিণাম অবস্থায় উপনীত হয়, তখন ইহা জীবকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়, তখন আর জীবের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক থাকে না, জীব তখনই অদৃশ্য হয় ; তৎপরে আবার সে নূতন আবরণ ধারণ করিয়া দৃশ্য হয় (১)। প্রতিজীবনেই যে, সকল জীবের বহিরাবরণ ক্রমান্বয়ে ঐ কয়েকটি অবস্থা অতিক্রম করিয়া মৃত্যুরূপ পরিণাম অবস্থায় উপনীত হইবে তাহা নহে ; এই আবরণ উপরি উক্ত যে কোন অবস্থায় ছাড়িয়া যাইতে পারে, তখন জীব অদৃশ্য হইয়া যায় এবং পুনরায় নূতন আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হইয়া দৃশ্য হইয়া থাকে।

মনুষ্যরূপী জীবের বহিরাবরণ ভ্রূণাবস্থায় থাকিতে সে কঠোর যন্ত্রণাভোগ করিয়া, যথা সময়ে জননীর গর্ভ হইতে নির্গত হয়, এবং তৎপরে যখন ইহা শৈশবাবস্থায় থাকে, তখন তাহার চিত্তবৃত্তিরূপ অন্তরাবরণ সম্যক্‌রূপে পরিস্ফুট হয় না, কিন্তু তথাপি তাহার মানসিক ক্লেশের অবসান নাই, সে অহরহঃ ক্লেশভোগ করিতে থাকে।

তৎপরে ক্রমশঃ ঐ আবরণ শৈশবের সুকুমার অবস্থা অতিক্রম করিয়া কৈশোরাবস্থায় উপনীত হয়, তখনও তাহার সুখ নাই ; তাহার

---

(১) দেহিনোঽস্মিন্‌ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥
গীতা, ২।১৩।

মনে কামনার স্ফূরণ হইতে থাকে ও আশার কিরণ বিকাশপ্রাপ্ত হইতে থাকে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হয়ত নৈরাশ্যের ছায়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাকে কষ্ট দেয়। তাহার হৃদয়ে দুশ্চিন্তাকীট প্রবেশ করিয়া ক্ষণে ক্ষণে তাহাকে উদ্বেলিত করে, তাহার মনে কোন প্রকারেই শান্তি হয় না।

ক্রমে ক্রমে ঐ আবরণ উল্লাসময় যৌবনের অবস্থায় উপনীত হইয়া পূর্ণবিকাশ প্রাপ্ত হয়, ও সেই সঙ্গে চিত্তবৃত্তিরূপ অন্তরাবরণও সম্যক্ পরিস্ফুট হয় এবং অন্তঃকরণে পূর্ব্বসংস্কারানুযায়ী নানাপ্রকার ভাবের উদয় হইয়া সেই সকল যথাসাধ্য পরিপুষ্টি লাভ করে। এই অবস্থাকে সুখের অবস্থা মনে করিয়া জীব কত যে আশাই করিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু তাহার কিছুই সফল হইল না, দেখিল যে ইহা ঘোরতর দুঃখময়। তাহার পূর্ব্বসংস্কারানুযায়ী উদ্দাম কামনা, অদম্য আকাঙ্ক্ষা উদিত হইয়া, সর্ব্বদাই তাহাকে উদ্বেজিত করিতেছে, কামনার উপরে কামনা, আকাঙ্ক্ষার উপরে আকাঙ্ক্ষা আসিয়া তাহাকে সুস্থির হইতে দেয় না। কাম, ক্রোধ, লোভাদি বৃদ্ধি পাইয়া, হিংসা, দ্বেষ, অহঙ্কার আবির্ভূত হইয়া, তাহাকে অস্থির করে। এই সময়ে সে সেই ক্ষণভঙ্গুর আবরণের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হইয়া, তাহাকে সেই অবস্থায় চিরদিনই রাখিবার জন্য বিশেষ আকাঙ্ক্ষা করে; অথবা ইহা ঐ অবস্থায় চিরদিনই থাকিবে ইহাই মনে করিয়া, এই আবরণের পরিণাম কি হইবে তাহা না ভাবিয়া, এবং যে কোন মুহূর্ত্তে ইহা ছাড়িয়া যাইতে পারে, তৎসম্বন্ধেও কোন চিন্তাকে মনে একবারও উদিত হইতে না দিয়া, অন্ধ ও উন্মত্তের ন্যায় চলিতে থাকে। কেহ বা এই নশ্বর আবরণদ্বারা অন্যান্য জীবের হৃদয়মন মুগ্ধ করিবার লালসায়, তাহারই পারিপাট্যের জন্য, অথবা তাহা যে প্রকার ভাবে আছে সেইরূপ চিরকাল রাখিবার প্রত্যাশায়, কতই যে বৃথা শ্রম করে,

তাহা বলা যায় না। ইহা কর্ম্মফলবশে ব্যাধিগ্রস্ত হইলে তাহা অপনোদনের জন্যও অশেষ প্রকারে চেষ্টা করে। কিন্তু হায়! নিষ্ঠুর কালস্রোত তাহা মানে কৈ! অত সাধের আবরণেও জরাদিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া তাহাকে বিকৃতভাবগ্রস্ত করে, অথবা হয়ত তখনই পরিবর্ত্তনের পরিণাম অবস্থায় লইয়া গিয়া, ইহা হইতে সেই জীবকে উন্মুক্ত করে, এবং অদৃশ্য পথে ভাসাইয়া লইয়া গিয়া, পুনরায় নূতন আবরণে আবৃত করতঃ আবার কষ্টভোগ করিবার জন্য প্রকাশিত করিয়া দেয়।

যৌবনের প্রখরতা ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আবরণ প্রৌঢ়াবস্থায় উপনীত হইলে, ইহার শক্তি হ্রাস হইতে থাকে এবং মানসিক শক্তি-সকলের প্রবলতাও ক্রমে মন্দীভূত হইতে থাকে, ইহাতে জীব দারুণ কষ্ট অনুভব করে। দেহের প্রথমাবস্থায় জনকজননীর সহিত জীবের ঘনিষ্ঠতা থাকে, তৎপরে যতই অগ্রসর হইতে থাকে, ততই ক্রমে ক্রমে ভ্রাতা, ভগিনী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ইত্যাদি নাম দিয়া, তাহার সন্নিকটে ভাসমান কতকগুলি জীবের সহিত এবং দূরস্থিত আরও বহুতর জীবের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া প্রিয়বোধে সেই সকলে আসক্ত হয়, তাহাদের কাহারও কোনপ্রকার কষ্ট হইলে সেও দারুণ কষ্টভোগ করিয়া থাকে এবং কেহ অদৃশ্য হইলেত কথাই নাই; সে শোকে একবারে অভিভূত হইয়া পড়ে। যে সকল পদার্থে সে প্রিয়বোধে আসক্ত হইয়াছিল, তাহারও কোনটি তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে তাহাতেও সে কষ্ট অনুভব করে। উদ্দাম যৌবনে সে-যে সকল আশা করিয়াছিল, তাহাতে নিরাশ হইয়াও দুঃখ পাইয়া থাকে এবং শারীরিক ও মানসিক শক্তির হ্রাস হইতে দেখিয়া, তাহার হৃদয়ে নানাপ্রকার চিন্তার উদয় হয়, ও কখন কখন মৃত্যুর বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি তাহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া, মোহান্ধকারে আচ্ছন্নকরতঃ তাহাকে অত্যন্ত যন্ত্রণা দিয়া থাকে।

প্রৌঢ়াবস্থা অতিক্রম করিয়া যখন ঐ আবরণ ক্রমে ক্রমে বার্দ্ধক্যাবস্থায় উপস্থিত হয়, তখন তাহা জীর্ণ হইয়া আইসে। তখন পলিত-কেশ-গলিত-দন্ত-লোলিত-চর্ম্ম-বিশিষ্ট সর্ব্বাবয়বের শোভাহীনতা দর্শন-পূর্ব্বক জীব ক্ষোভে একবারে অধীর হয়। ইন্দ্রিয়াদির বল ক্ষুণ্ণ, শরীর দুর্ব্বল, এবং মন নিস্তেজ হইয়া তাহাকে দারুণ কষ্ট দিতে থাকে এবং নৈরাশ্যের অন্ধকারময়ী ছায়া আসিয়া তাহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। যাহাদিগকে প্রিয়বোধ করিয়া তাঁহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সে নানা কষ্ট সহ্য করিয়াছে, অসংখ্য যন্ত্রণাভোগ করিয়াছে, তাহাদেরই কেহ কেহ হয়ত অপ্রিয়বোধে তাহার প্রতি বিরাগ-ভাব দেখাইয়া তাহাকে ত্যাগ করিতেছে, অথবা দুর্জ্জয় কালের স্রোত ইহাদের কাহাকেও তাহা হইতে সবলে ছিন্ন করিয়া লইয়া দৃষ্টির বহির্ভূত করিতেছে, ইহাতে সে মর্ম্মবেদনায় কাতর হইয়া পড়িতেছে। ইহার উপরে আবার নিজ মৃত্যুর ভীষণ চিন্তা সর্ব্বদাই তাহার হৃদয়ে জাগরূক হইয়া তাহাকে বিত্রস্ত করিতেছে। যে সকল প্রিয় জীব ও প্রিয় পদার্থের সহিত সে সংশ্লিষ্ট হইয়াছে, যাহাদের প্রতি সে অত্যন্ত আসক্ত হইয়াছে, তাহাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে, এবং যে আবরণকে সকল অপেক্ষা প্রিয়বোধ করিয়া এত যত্নের সহিত সে রক্ষা করিয়াছে, তাহাও ত্যাগ করিতে হইবে, ইহা ভাবিয়া সে শোকে একবারে অধীর হইয়া পড়িতেছে। কেহ বা আবরণের ব্যাধিরূপ বিকারবশতঃ এবং সংসারের ঝঞ্ঝাবাতে তাড়িত হইয়া অসহ্য মানসিক বৈক্লব্যহেতু মৃত্যুকেই আশ্রয়দাতা ভাবিয়া এবং সেই আবরণত্যাগই তাহার শ্রেয়ঃ মনে করিয়া মৃত্যুরই প্রতীক্ষা করিতেছে। কিন্তু হায়! সে বুঝিতে পারিতেছে না যে, এই আবরণ ত্যাগ করিলেও পুনর্ব্বার নূতন আবরণে আবৃত ও আবির্ভূত হইয়া ইহা অপেক্ষাও হয় ত কত অধিক যন্ত্রণা তাহাকে ভোগ করিতে হইবে। যাহাতে চিরদিনের জন্য দুঃখের

হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে, তাহারই যদি পূর্ব্বে আয়োজন করিতে পারিত, তাহা হইলে চিরশান্তি লাভ করিতে পারিত, কিন্তু তাহার সে কিছুই করিল না।

যদি কেহ ক্রীড়াসক্ত হইয়া বাল্যাবস্থা, যুবতীতে অনুরক্ত থাকিয়া যৌবনাবস্থা এবং নানাপ্রকার দুশ্চিন্তামগ্ন হইয়া বৃদ্ধাবস্থা কাটাইল, তাহা হইলে যাহা প্রকৃত চিন্তনীয় তাহার সে কিছুই করিল না, যাহাতে শান্তি পাইতে পারে, তাহার কোনই অনুষ্ঠান করিল না (১)। আহা! সে কেবল অশান্তিময় জীবন অতিবাহিত করিয়া পুনরায় দৃশ্য হইয়া দুর্ব্বহ ক্লেশ ভোগ করিবে, সেই জন্যই অন্তর্হিত হইল। যাহাতে আর পুনরায় যন্ত্রণাভোগ করিতে না হয়, যাহাতে চিরশান্তি পাইতে পারে, সর্ব্বদাই তাহারই জন্য উদ্যোগ করিতে হইবে, তাহারই জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে, মনকে তজ্জন্য দৃঢ় করিতে হইবে। মৃত্যু কবে আসিবে তাহার স্থিরতা নাই, অতএব মৃত্যু যেন কেশ আকর্ষণ করিয়াছে, এই প্রকার অবস্থা সর্ব্বদা মনে রাখিয়া কার্য্য করিতে হইবে। মৃত্যু হইবে বলিয়া যে, কেহ কোন কর্ম্ম করিবে না, তাহা নহে, সে কর্ম্ম ছাড়িবে মনে করিলেও ছাড়িতে পারিবে না। কর্ম্ম না করিয়া কেহ থাকিতে পারে না, সকলেই নিজ নিজ ত্রিগুণানুসারে কার্য্য করিয়া থাকে, অতএব বিশাল উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, শাস্ত্রোপদিষ্ট বৈধ কর্ম্ম করিতে হইবে। যাহাতে মনে ভক্তির উদয় হয়, বৈরাগ্য জন্মে, অন্তঃকরণে জ্ঞানের সঞ্চার হয়, যাহাতে সঞ্চিত কর্ম্মফল লোপ প্রাপ্ত হয় এবং আর

---

(১) বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তস্তরুণস্তাবৎ তরুণীরক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবৎ চিন্তামগ্নঃ পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ॥
মোহমুদ্গরঃ।

নূতন কর্ম্মফলের সঞ্চয় না হয়, গুরূপদেশানুযায়ী তাহারই অনুষ্ঠান করিতে হইবে। মৃত্যুর ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি যাহাতে ভয় প্রদর্শন করিতে না পারে, মৃত্যুচিন্তা মনে উদিত হইলে যাহাতে মন বিক্লব না হয়, তজ্জন্ত মনকে দৃঢ় করিতে হইবে, এবং যাহাতে বর্ত্তমান জীবন শান্তিময় হইতে পারে, ও ভবিষ্যতে যাহাতে চিরশান্তিতে মগ্ন হইতে পারা যায়, তাহারই আয়োজন অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

ঋতুভেদে (১) প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা এবং ত্রিগুণের পরিবর্ত্তন।

শীত ঋতু আসিয়াছে। হেমন্ত অন্তে প্রকৃতির যেন মৃত্যু হইয়াছিল, এক্ষণে ঈষৎ জীবনের সঞ্চার হইলেও মৃত্যুলক্ষণ সমস্তই পরিদৃশ্যমান হইতেছে, এখনও মৃতবৎ অনুমিত হইতেছে। ইহাই যেন প্রকৃতির

(১) শাস্ত্রে যে যে মাস যে যে ঋতুর অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ক্রান্তি-পাতচলন (Precession of the Eqninoxes) বশতঃ অধুনা ইহার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। দুইটি ক্রান্তিপাত আছে, একটি বাসন্তিক (Vernal) অপরটি শারদীয় (Autumnal)। সূর্য্য যে দুই দিবস এই দুই বিন্দুতে গমন করে, সেই সেই দিবস দিন ও রাত্রি সমান হয়। এই দুইটি দিন বসন্ত ও শরৎ ঋতুর শেষ দিন। পূর্ব্বে সূর্য্যের মেষরাশিতে ও তুলারাশিতে সংক্রমণের সময়ে দিবা ও রাত্রি সমান হইত, এক্ষণে তাহা অপেক্ষা প্রায় ২০ দিবস পূর্ব্বে হইয়া থাকে। আরও পূর্ব্বের কথা ধরিলে আরও প্রভেদ ঘটিয়াছে। নিম্নলিখিত ইংরাজী গণনা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, দুই হাজার এক শত বৎসরে ক্রান্তিপাত এক রাশি পিছাইয়া যায়। অধুনা চৈত্র ও আশ্বিনের ৭ই কিম্বা ৮ই (21st March and 23rd September) দিন ও রাত্রি সমান হইয়া থাকে, এবং দিবামান ৭ই কিম্বা ৮ই আষাঢ় (21st June) অধিক ও

জীর্ণাবস্থা। এই সময়ে যদিও রজোগুণ এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঈষৎ

৭ই কিম্বা ৮ই পৌষ (21st December) অবস্থায়ী হয়। এই সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ ও হ্রস্ব দিবসে সূর্য্য যে স্থানে থাকে, তাহাদিগকে অয়নান্ত (Solstices) বলে এবং এই দুই দিবসের মধ্যবর্ত্তী সময়, অর্থাৎ বৎসরের প্রথমার্দ্ধ দক্ষিণায়ন কাল এবং অপরার্দ্ধ উত্তরায়ণ কাল।

"The rate of precession is $50''.24$ in one year or about 1° in 72 years. The time taken by Aries to complete one revolution of the heavens would, therefore, be about 26000 years; for

$$\frac{360^{\circ} \times 60 \times 60}{50''.24} = 26000 \text{ years.}$$

Owing to precession, the longitude of each fixed star increases at the rate of $50''.24$ each year.

At present the vernal equinoctial point, though still retaining the name "First point of Aries," is not in the constellation of Aries, but owing to precession has shifted about 30" into the neighbouring constellation Pisces. Also the autumnal equinoctial point is not now in the constellation of Libra but in Virgo."

Parker's Elements of Astronomy.

আধুনিক প্রকৃত, প্রচলিত এবং পুরাতন ঋতুবিভাগ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ঋতুর নাম।	আধুনিক প্রকৃত ঋতুবিভাগ।	প্রচলিত ঋতুবিভাগ।	পুরাতন ঋতুবিভাগ।
গ্রীষ্ম	৮ই চৈত্র—৭ই জ্যৈষ্ঠ	বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ	জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়।
বর্ষা	৮ই জ্যৈষ্ঠ—৭ই শ্রাবণ	আষাঢ়, শ্রাবণ	শ্রাবণ, ভাদ্র।
শরৎ	৮ই শ্রাবণ—৭ই আশ্বিন	ভাদ্র, আশ্বিন	আশ্বিন, কার্ত্তিক
হেমন্ত	৮ই আশ্বিন—৭ই অগ্রহায়ণ	কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ	অগ্রহায়ণ, পৌষ।
শীত	৮ই অগ্রহায়ণ—৭ই মাঘ	পৌষ, মাঘ	মাঘ, ফাল্গুন।
বসন্ত	৮ই মাঘ—৭ই চৈত্র	ফাল্গুন, চৈত্র	চৈত্র, বৈশাখ।

ঐ প্রথমোক্ত ঋতুবিভাগ, যাহা অধুনা এ দেশে প্রকৃত ঋতুবিভাগ, তাহারই উপরে লক্ষ্য রাখিয়া, এই অধ্যায় লিখিত হইয়াছে।

সত্ত্বগুণেরও সঞ্চার হইতেছে, কিন্তু তথাপি যাহারা তমোগুণাধিক

ঐ পুরাতন ঋতুবিভাগানুযায়ীই বৈদ্যশাস্ত্রের ব্যবস্থা। অন্যান্য পুরাতন শাস্ত্রেও এইরূপ বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। এই বিভাগ প্রাচীন হইলেও প্রাচীনতম নহে। ইহা প্রায় সাড়ে তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার ঋতুবিভাগ।

মাঘাদ্যৈর্দ্বাভ্যাং মাসাভ্যাং ক্রমাৎ ষড়্ ঋতবঃ স্মৃতাঃ।
শিশিরশ্চ বসন্তশ্চ গ্রীষ্মো বর্ষা শরদ্ধিমাঃ॥

চরকসংহিতা, সুশ্রুতাদিশ্চাহঃ।

মাঘ হইতে আরম্ভ করতঃ দুই দুই মাস করিয়া ক্রমান্বয়ে শিশির, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা শরৎ এবং হিম ঋতু কথিত হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতের অনুযায়ীও কার্ত্তিক মাস শরৎকাল ছিল। ঐ সময়ে রাসপূর্ণিমা ঐ ঋতুতে হইত।

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শরদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥

ভাগবতম্, ১০।২৯।১

প্রফুটিতমল্লিকা শারদীয়া রজনী দেখিয়া ভগবান্ যোগমায়া আশ্রয়পূর্ব্বক বিহার করিতে মানস করিলেন।

অমরকোষেও ঐরূপ ঋতুবিভাগ আছে।

ষড়মী ঋতবঃ পুংসি মার্গাদীনাং যুগৈঃ ক্রমাৎ।

অমরকোষম্, কালবর্গঃ, প্রথমং কাণ্ডম্।

উপরিউক্ত বিভাগ ব্যতীত নিম্নলিখিতরূপ আধুনিক প্রচলিত বিভাগও কোন কোন গ্রন্থে লক্ষিত হয়:—

গ্রীষ্মো জৈষ্ঠাষাঢ়ৌ প্রোক্তঃ প্রাবৃট্‌শ্রাবণভাদ্রকৌ।

তাহারা এই গুণে এখনও আচ্ছন্ন হইয়া আছে। দক্ষিণায়নস্বরূপ (১)

সিংহকন্যে তুলা প্রাবৃট্ তুলাবৃশ্চিকয়োঃ শরৎ।
ধনুর্ম্মকরৌ চ হেমন্তো বসন্তঃ কুম্ভমীনয়োঃ॥

ভাবপ্রকাশ, পূর্ব্বখণ্ড, ৭ম মাত্রা।

বরাহের সময়ে ৪২৭ শকে (৫০৬ খৃঃ অব্দে) ভারতে পঞ্জিকার কিয়দংশ সংস্কার হইয়াছিল, কিন্তু মাসগণনা পূর্ব্ববৎই ছিল, অর্থাৎ যে সময়ে যে মাস তাহা পূর্ব্বেকার মতই ছিল, সংশোধিত হয় নাই। ঐ সময় হইতে অধুনা ২০ দিনের অন্তর ঘটিয়াছে, সুতরাং বরাহের সময়ের ঋতুবিভাগ, যাহা আধুনিক প্রচলিত ঋতুবিভাগ, তাহা পুরাতন ঋতুর এক এক মাস পূর্ব্বে হইয়া থাকে, এবং আধুনিক প্রকৃত ঋতুসমূহ বরাহের সময়ের ঋতু হইতে প্রত্যেকটি প্রায় ২০ দিন পূর্ব্বে হইয়া থাকে, তাহা হইলে পুরাতন ঋতু হইতে আধুনিক প্রকৃত ঋতু প্রায় ১ মাস ২০ দিন পূর্ব্বে হয়। আমাদের পঞ্জিকা সংস্কারের অভাবে ঐ ভুল চলিতেছে।

স্থানভেদেও ঋতুবিভাগের তারতম্য ঘটিয়া থাকে, যেমন, কোথাও গ্রীষ্ম, কোথাও বর্ষা এবং কোথাও বা শীত অধিককাল স্থায়ী হয়, সুতরাং সেই সেই স্থানে ঋতুবিভাগও তদনুযায়ী হইয়া থাকে।

পুরাকালে প্রায় সকল জাতির মধ্যেই চান্দ্রমাস প্রচলিত ছিল, আর্য্যগণেরও তাহাই ছিল। অনেক কাল অগ্রহায়ণ আর্য্যগণের বৎসরের প্রথম মাস পরিগণিত হইত। শারদীয় ক্রান্তিপাতে সূর্য্য আসিলে এবং মৃগশিরানক্ষত্রে পূর্ণিমা হইলে, সে সময়ে আর্য্যগণ বৎসরের শেষ এবং নববর্ষের প্রথম দিন গণনা করিতেন।

উপরিউক্ত ইংরাজী গণনানুসারে এখন হইতে প্রায় তিন হাজার আট শত বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ হইত। তৎপরে যখন সৌরমাস প্রচলিত হইল, তখন হইতে বাসন্তিক বিষুব দিবস বৎসরের শেষ দিন বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিল। সে সময়ে ঐ বিষুবদ্ দিবসে সূর্য্য মেষ রাশিতে অশ্বিনী নক্ষত্রে প্রবেশ করিত।

(১) ৮ই অগ্রহায়ণ হইতে ৭ই মাঘ পর্য্যন্ত শীতকাল, ইহার প্রথমার্দ্ধ দক্ষিণায়ন এবং শেষার্দ্ধ উত্তরায়ণ। অধুনা ৭ই পৌষ (21st December) দক্ষিণায়নের শেষ দিন এবং তৎপর দিবস উত্তরায়ণের প্রথম দিন।

রজনী প্রভাত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু তথাপি তাহাদের নিদ্রার আবেশ যায় নাই, তাহারা এখনও জড়তা দূরীভূত করিতে পারে নাই। এক্ষণে সকল দ্রব্যই অপেক্ষাকৃত ঘনীভূত হইয়া তমোগুণের ধর্ম্ম কঠিনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। সমস্ত তরল দ্রব্যই গাঢ় হইয়াছে, এমন কি কোথাও কোথাও কখনও কখনও বা ইহা হিমশিলারূপে পরিণত হইয়া, রজোগুণব্যঞ্জক তরলতা হারাইয়া, তমোগুণাত্মক গাঢ়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। উদ্ভিদ্‌গণের মধ্যে, ওষধি প্রভৃতির হেমন্ত অন্তে জীবনের অন্ত হইয়াছে, বৃক্ষগুল্ম প্রভৃতি যাহারা অবশিষ্ট আছে, তাহাদের এক্ষণে জীবন সঞ্চারিত হইলেও তাহারা মৃতের ন্যায় অনুমিত হইতেছে। আর সে কিশোর বয়সের পুষ্প নাই, যৌবনের ফল নাই, প্রৌঢ়ের পক্কবীজও নাই। ইহারা বাল্যকালে যে চঞ্চলতাবশতঃ শাখাপ্রশাখারূপ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল ঘন ঘন নাচাইয়া উন্মত্তপ্রায় হইত এবং কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ় ও বার্দ্ধক্যে ক্রমশঃ যে চঞ্চলতা হ্রাস হইয়া হেমন্ত অন্তে লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছিল, এখনও তাহা সম্যগ্ রূপে পুনঃপ্রাপ্ত হয় নাই; এখন আর সে অস্থিরতা নাই, এমন কি ঐ সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঈষৎ সঞ্চালন করিবারও যেন ক্ষমতা নাই।

জঙ্গমজীবগণের নিদ্রার পরিমাণ এখনও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অবস্থাতেই আছে, আলস্যবশতঃ নিশ্চেষ্টতা অদ্যাপি যেন স্বভাবতই রহিয়া গিয়াছে, আজিও জড়ভাব নষ্ট হয় নাই। ইহাদের মধ্যে কীটপতঙ্গসরীসৃপাদির অধিকাংশই হেমন্তের শেষে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, যাহারা অবশিষ্ট আছে, তাহাদের অনেকেই নিষ্ক্রিয় হইয়া বিবরে প্রবেশ করিয়াছে, আহারাদির জন্য আর সে ছুটাছুটি নাই, আর সে ক্রিয়াশীলতাও নাই। পিপীলিকা, বৃশ্চিক, সর্পাদি একেবারে বিরল হইয়াছে, যাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা উত্ত্যক্ত হইলেও নড়িতে পারে না, তাহাদের দংশন করিবারও আর ক্ষমতা নাই।

পশুপক্ষিগণও যেন জড়বৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া নীরবে বসিয়া আছে। পিককুল প্রকৃতির বাল্যকালে যে হৃদয়োন্মাদক দিগ্‌দিগন্তব্যাপী মধুররবে অন্তঃকরণ উল্লাসিত করিত, হায়! বহুদিন হইল তাহার সেই শৈশবসুলভ মধুর উচ্চৈঃস্বর কোথায় লোপ পাইয়াছে, এমন কি, প্রকৃতির যৌবনে—বর্ষাকালে—তাহাদের যে গম্ভীরস্বর ছিল, তাহাও এখন আর শুনিতে পাওয়া যায় না। রজোগুণবশতঃ যে প্রকৃতি চঞ্চলা ও মুখরা ছিল, সে আজও জড়বৎ নিশ্চেষ্টা ও মূকভাবাপন্না হইয়া রহিয়াছে। এখনও যেন তাহাকে মৃত্যুশয্যায় শায়িতা বলিয়া বোধ হইতেছে; অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিথিল, শরীর কঠিন ও শীতল এবং রক্তহীন ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া আছে। সমস্তই আজ নীরব নিস্পন্দ ও মলিন। চন্দ্রসূর্য্যরূপ দুইটি চক্ষু এখনও যেন সম্পূর্ণরূপ উন্মীলিত হয় নাই বলিয়া বোধ হইতেছে।

শীতঋতু ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া ইহার শেষার্দ্ধে যখন দক্ষিণায়নরূপ নিশার অবসান হইয়া উত্তরায়ণকাল (১) আসিয়াছে, সেই প্রভাত সময়ে, যেন প্রকৃতি পুনরায় জন্মগ্রহণ করতঃ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রকাশমান হইল, যেন মাতৃগর্ভ হইতে মাতৃকোলে অবস্থিত হইল, ভ্রূণাবস্থা অতিক্রম করিয়া অপোগণ্ড অবস্থায় উপনীত হইল। ঈষৎ রজোগুণ বর্দ্ধিত হইয়া তমোগুণকে অভিভূত করিলেও, এখনও প্রকৃতির জড়তা সম্পূর্ণরূপ দূরীভূত হয় নাই, এখনও নিদ্রা, তন্দ্রা, আলস্য প্রভৃতি অধিক পরিমাণে রহিয়াছে।

শীত ঋতুর অবসানে বসন্ত (২) আসিয়াছে, প্রকৃতি যেন চলিতে ও কথা কহিতে শিখিয়াছে। রজোগুণ বর্দ্ধিত হইয়া তমোগুণকে

(১) অধুনা ৮ই পৌষ (22 nd December) উত্তরায়ণের প্রথম দিন।

(২) ৮ই মাঘ হইতে ৭ই চৈত্র (21st March) বসন্তকাল।

অভিভূত করায়, প্রকৃতির ভ্রূণ ও অপোগণ্ড অবস্থার জড়তা ও নিশ্চেষ্টতা দূরীভূত হইয়া, বাল্যাবস্থার চঞ্চলতা ও ক্রিয়াশীলতা জন্মিয়াছে, এবং সত্ত্বগুণ কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হওয়ায়, ঐ চঞ্চলতা ও ক্রিয়াশীলতা শীঘ্র আলস্যে ও জড়তায় উপনীত না হইয়া অধিকক্ষণ স্থায়ী হইয়া থাকে। যাহা দেখি তাহাই যেন চঞ্চল, সকলই যেন অস্থির এবং সত্ত্বগুণবশতঃ সবই যেন সদাই প্রসন্নতা, মধুরতা, ও কোমলতাময়। উদ্ভিদ্‌গণের যেন বাল্যাবস্থাবশতঃ কিশলয়রূপ অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ নূতন আবির্ভূত হইয়াছে এবং সেই সমস্ত সদাই যেন চঞ্চল। ইহারা মঞ্জরিত হইয়াছে, সেই মুকুল প্রস্ফুটিত হইলে মধুপান করিবে, এই লালসায় ভ্রমরগণ অধীর হইয়া গুণ গুণ স্বরে চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কতিপয় উদ্ভিদ্‌রাজি অকালে পুষ্পবতী হওয়ায় মধুকরগণ আনন্দধ্বনি করতঃ তাহার দিকে ধাবিত হইয়া নিস্তব্ধে বসিয়া মধুপান করিতে করিতে আত্মহারা হইয়া রহিয়াছে।

এই সময়ে প্রথমাবস্থায় বায়ু প্রায়ই মৃদুগামী থাকে, তৎপরে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কখন বা দ্রুতগামী হয় এবং কখন কখন বা ইহা যেন বালস্বভাবসুলভ ক্রীড়াপরবশ হইয়া উন্মত্তবৎ উচ্ছৃঙ্খলভাবে চলে, একদিকে যাইতে যাইতে পুনরায় অন্যদিকে যায় এবং ঘুরিয়া ফিরিয়া দৌড়িতে থাকে।

জঙ্গমজীবগণও রজোগুণবশতঃ বাল্যকালের চঞ্চলতা প্রাপ্ত হইয়াছে, বোধ হইতেছে যেন সকলেই আনন্দে আত্মহারা হইয়া সদাই ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে, এবং সত্ত্বগুণ বর্দ্ধিত হওয়ায় ঐ অস্থিরতা শীঘ্র আলস্যে পরিণত হয় না, প্রায়ই ছুটাছুটি ও খেলা করিতেছে, কিন্তু তাহাতেও ক্লান্তি বা শ্রান্তি বোধ নাই। সত্ত্বগুণবশতঃ প্রকৃতি বাল্যাবস্থার মধুরতা ও কোমলতা প্রাপ্ত হওয়ায় ইহার আকৃতি, হাবভাব, গমন, কণ্ঠস্বর সবই যেন কমনীয় ও মাধুর্য্যময় হইয়াছে।

প্রকৃতির বালকণ্ঠ হইতে শব্দ উত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিতেছে। পশুপক্ষিগণের কণ্ঠের জড়ভাব তিরোহিত হওয়ায় তাহারা যেন আর নীরবে থাকিতে পারিতেছে না। শুকসারিকা-পিককুল আজ মনের উল্লাসে দীর্ঘস্বরে মাধুর্য্য মাখাইয়া গান করিতেছে—যেন প্রকৃতি বাল্যস্বভাববশতঃ উচ্চরবকারিণী ও মধুরভাষিণী হইয়া জগৎকে মোহিত করিতেছে। আজ প্রকৃতি বাল্যাবস্থা-হেতু মুখ খুলিয়া, জ্যোতির্ম্ময় চক্ষু-উন্মীলন করিয়া, দিবসরূপ শুভ্রহাসি হাসিতেছে, আর মধ্যে মধ্যে উষারূপ মৃদুহাস্যে শৈশবের কোমল গণ্ডস্থল রক্তবর্ণ হওয়ায় সুন্দর রূপ ধারণ করিতেছে।

ক্রমে গ্রীষ্ম আসিল, তাপাধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ রজোগুণ অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল,—প্রকৃতি যেন কিশোর অবস্থায় উপনীত হইয়া নূতন রূপ ধারণ করিল। বৃক্ষসমূহে ফুল ফুটিয়াছে, কাহার কাহারও বা অকালে ফলও ফলিয়াছে, প্রকৃতি যেন পুষ্পময় হাসি হাসিতেছে এবং কৈশোরের ঈষৎ লজ্জাবশতই বুঝি এক একবার বিরল পত্রময় ক্ষীণ অবগুণ্ঠন দ্বারা হাস্যবদন ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছে, ও অস্থির বায়ুর সাহায্যে চঞ্চলা হইয়া শরীর হেলাইয়া দোলাইয়া প্রেমালাপ করিতেছে। এই সময়ে বায়ু অত্যন্ত উষ্ণ হইয়া সদাই প্রবলবেগে বহিতেছে, বোধ হইতেছে যে প্রকৃতি সতী নব প্রেমানুরাগে অধীরা হইয়াই যেন ঘন ঘন তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে।

ঐ দেখ, প্রকৃতি দীর্ঘকালব্যাপিনী উষারূপ কৈশোরসুলভ মৃদু হাস্যে রক্তিমকপোল হওয়ায়, এক একবার কেমন মনোরম রূপ ধারণ করিতেছে। এক্ষণ আর বাল্যের তত সরলতামধুরতাময় দৃষ্টিপাতও নাই, সেই স্নিগ্ধকর নির্ম্মল হাসিও নাই, এই সকলেতে কেমন যেন একটু কুটিলতা একটু তীব্রতা আসিয়াছে। সূর্য্যের উষ্ণরশ্মিযুক্ত দিবস অধিকক্ষণস্থায়ী হওয়ায় বোধ হইতেছে যে, প্রকৃতি

উজ্জ্বল চক্ষু উন্মীলন করিয়া তীব্র দৃষ্টিপাতকরতঃ মুখ খুলিয়া দীর্ঘ হাসি হাসিতেছে, কিন্তু চঞ্চল বায়ু প্রচণ্ডবেগে বহিয়া ইহাকে ধূলি-ধূসরিত করায় বোধ হয় যেন, ইহার মনেতে সরলতার মধ্যে একটু মলিনতা আসায় হাস্যেও যেন একটু কুটিলতার ছায়া পড়িয়াছে। যদিও কৈশোরের ঈষৎ লজ্জাবশতঃ বিরল মেঘরূপ অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া হাস্য লুকাইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু ধূর্ত্ত বায়ু প্রবলবেগে বহিয়া তাহাকে অপসারিত করায় বোধ হইতেছে যে, প্রকৃতি কৈশোরের চঞ্চলতাবশতঃ অধিকক্ষণ অবগুণ্ঠনবতী হইয়া থাকিতে পারিতেছে না এবং কি জানি কিসের জন্য প্রাণের হাসি হাসিতেছে, তাহা চাপিয়া রাখিতে পারিতেছে না।

নিদাঘের ঘোর উত্তাপের পর বর্ষা (১) আসিল, প্রচণ্ডতার পর যেন সমস্ত স্নিগ্ধ হইল। অত্যধিক রজোগুণের সঙ্গে সত্ত্ব গুণ ঈষৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। রজোগুণের ক্রমিক আধিক্য হেতু ভ্রূণাবস্থা হইতে প্রকৃতি ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া এইবার পরিপুষ্টির চরম অবস্থায় উপনীত হইয়া স্থিরতা প্রাপ্ত হইয়াছে; শরীর ও মনের পূর্ণবিকাশ প্রাপ্ত হওয়ার পর সেই অবস্থা কিয়ৎকাল স্থায়ী হইয়াছে। সত্ত্বগুণের স্নিগ্ধতাহেতু সবই যেন প্রফুল্ল, সবই যেন রসে টলমল, এবং রজোগুণ-বশতঃ প্রকৃতি যেন যৌবনমদে চঞ্চল হইয়াছে।

স্রোতস্বিনী শৈবলিনী আজ পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়া, যেন প্রিয়-সমাগমে যাইবার জন্য ব্যগ্র, তাই বুঝি কোন প্রকার বাধা বিঘ্ন গ্রাহ্য না করিয়া দ্রুতবেগে যাইতে চেষ্টা করিলেও পূর্ণ শরীরের ভারে এক

---

(১) ৮ই জ্যৈষ্ঠ হইতে ৭ই শ্রাবণ বর্ষাকাল, ইহার প্রথমার্দ্ধ উত্তরায়ণের এবং শেষার্দ্ধ দক্ষিণায়নের অন্তর্গত। ৭ই কিম্বা ৮ই আষাঢ় (21st June) উত্তরায়ণের শেষ দিন।

একবার মন্থরগতি হইয়া পড়িতেছে, অথবা লজ্জায় বোধ হয় তাহার ত্বরিত গমন কখন কখন মন্দীভূত হইতেছে। যে সকল নির্ঝরিণীর গাম্ভীর্য্য নাই, তাহারা যেন যৌবনের তাড়নায় উত্তেজিত হইয়া স্বৈরিণীর ন্যায় চপলা ও মুখরা হইয়া সীমা অতিক্রম করিতেছে এবং নিজ সলিল পঙ্কিল করিয়া কূলের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে।

উদ্ভিদ্‌গণেরও যৌবনবশতঃ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, প্রকৃতি আজ ফলবতী হইয়াছে, এবং যৌবনসুলভ লজ্জাবশতঃ বুঝি পত্রাচ্ছাদনে অবগুণ্ঠনবতী হইয়া রহিয়াছে। আর বাল্যের সেই চপলতা বা কৈশোরের অধীরতা নাই, প্রকৃতিসতী এক্ষণে যৌবনের তাড়নায় প্রগল্‌ভা হইলেও যেন কতকটা গম্ভীরভাব ধারণ করিতে পারিয়াছে, তাই বুঝি উদ্ভিদ্‌গণ অনেকটা স্থিরতা প্রাপ্ত হইয়া, মধ্যে মধ্যে এক একবার বায়ুর সঞ্চালনে সঞ্চালিত হইতেছে এবং কি যেন বলিতেছে। তৃণলতাদির যাহারা অল্পকালস্থায়ী, তাহারা এই সময়ে জন্মিয়া অল্প দিনের মধ্যেই পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইতেছে।

কীট, পতঙ্গ, পশুপক্ষিগণেরও অনেকেই এই সময়ে পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়া সন্তানসন্ততিবিশিষ্ট হইয়াছে এবং গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া গভীর স্বরে শব্দ করিতেছে। এক্ষণে প্রকৃতির দিবসরূপ হাস্য অধিকক্ষণ স্থায়ী হইলেও ইহা গাম্ভীর্য্যপূর্ণ এবং লজ্জাবশতই বুঝি মেঘরূপ অবগুণ্ঠনে হাসি হাসি মুখখানি প্রায়ই ঢাকিয়া রাখিতেছে, শৈশব ও কৈশোরের ন্যায় মুখ খুলিয়া প্রাণ ভরিয়া যেন হাসিতে পারিতেছে না।

যৌবনকালে কামক্রোধাদি রিপুগণ প্রবল হয়, তাই বোধ হয় প্রকৃতি মধ্যে মধ্যে ক্রোধবশতঃ বিদ্যুদ্রূপ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিঃসরণ ও বজ্রনির্ঘোষরূপ ভয়ঙ্কর শব্দ করিতেছে, অথবা কখন কখন হয়ত ঐ দুইটি প্রবল রিপুকর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া অবিরল অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতেছে। যৌবনে বেশভূষা করিয়া স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে আরও

বাড়াইবার চেষ্টা হয়, তাই বুঝি প্রকৃতিসুন্দরী নানারূপ চিত্রবিচিত্র অম্বরে আবৃত হইয়া এবং কখন কখন সর্ব্ব বর্ণে রঞ্জিত ইন্দ্রধনুরূপ অঞ্চলে মস্তক ঢাকিয়া, কি জানি কিসের জন্য সুসজ্জিত হইয়া সৌন্দর্য্যের ছটা প্রকাশ করিতেছে, আর এক একবার ক্ষণপ্রভারূপ উজ্জ্বল ও কুটিল ক্ষণিকহাসি হাসিতেছে।

বর্ষার প্রথমার্দ্ধ অবসান হইলে যেন দক্ষিণায়নরূপ (১) নিশার সায়ং সন্ধ্যা হয়। এই সময় হইতে সত্ত্বগুণ ক্ষীণ হইয়া তমোগুণ বর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ হওয়ায় প্রকৃতি যেন কিঞ্চিৎ অলসভাবাপন্ন হইতেছে, এবং নিদ্রায় ইহার চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিতেছে। তমোগুণবশতঃ এই সময় হইতেই শারীরিক অসুস্থতা এবং মানসিক নিস্তেজতা ও বিষণ্নতা প্রভৃতিও ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইতেছে।

প্রাবৃটের পর শরৎ (২) আসিল, প্রকৃতি যেন প্রৌঢ়াবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় অসংখ্য সন্তানসন্ততিতে বেষ্টিতা হইয়াছে। ওষধিলতা-বৃক্ষপ্রভৃতি উদ্ভিদ্‌গণ ফুল-ফল-পত্রভরে অবনত এবং কীট পতঙ্গাদি অসংখ্যরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। যৌবনের ন্যায় প্রৌঢ়ে আর তত লজ্জাশীলতা নাই বলিয়াই বুঝি, প্রকৃতি মেঘরূপ অবগুণ্ঠন দ্বারা মধ্যে মধ্যে যেমন মুখ ঢাকিতেছে, অমনি খুলিয়া ফেলিতেছে।

শরৎকাল দক্ষিণায়নরূপ ত্রিযামার যেন মধ্যভাগের প্রথমার্দ্ধ, এই নিশীথকালের প্রারম্ভে প্রকৃতি তমোগুণে অভিভূতা হইয়া নিদ্রায় বিহ্বল হইয়া আসিতেছে, এবং মধ্যে মধ্যে কখন কখন নিদ্রার আবেশে ঝটিকারূপ দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে। জীবজগতের তমোগুণ

(১) ৭ই কিম্বা ৮ই আষাঢ় (21st June) উত্তরায়ণ শেষ হয় এবং তৎপর দিন হইতে দক্ষিণায়ন আরম্ভ হয়।

(২) ৮ই শ্রাবণ হইতে ৭ই আশ্বিন (23rd September) শরৎকাল।

প্রবল হওয়ায় ইহার আসুরিক ভাব বর্দ্ধিত হইয়া দেবভাব যেন দমিত হইয়া আসিতেছে। অন্য গুণাবলম্বীর ত কথাই নাই, সত্ত্বগুণাধিক দেবতাগণও যেন আজ ক্ষীণশক্তি হইয়াছেন। বর্ষার শেষ ভাগে নিদ্রিত হইয়া তাঁহারাও যেন আজ গাঢ় নিদ্রায় কাতর হইয়া আসিতেছেন। রজোগুণের হ্রাস হইয়া ব্রহ্মার সৃষ্টিশক্তি মন্দীকৃত হইয়া আসিতেছে। ইন্দ্রের সে বজ্রনির্ঘোষ নাই, অবিরল বর্ষণেরও ক্ষমতা নাই। চন্দ্র, সূর্য্য, পবন, পাবন, সকলেরই যেন শক্তি হ্রাস হইয়া আসিতেছে। তাই এই অকালে—নিশীথে গভীর নিদ্রার প্রথমাবস্থায়—শক্তিময়ীকে জাগাইতে হইবে, সত্ত্বগুণকে সহায় করিয়া রজোগুণকে প্রবল করিতে হইবে, তাহা হইলেই আসুরিক ভাব বিনষ্ট এবং পাশবরত্তি দমিত হইয়া পুনরায় দেবভাব প্রাপ্ত হইবে, নতুবা প্রাতঃসন্ধ্যার পূর্ব্বে হেমন্তে তমোগুণে একবারে আচ্ছন্ন হইয়া অধঃপতিত হইতে হইবে। এই জন্যই বোধ হয়, এই সময়ে তামসিকভাববহুল দৈত্যের ভয়ে ভীত হইয়া রজোগুণময় ব্রহ্মা যোগনিদ্রারত সত্ত্বগুণময় বিষ্ণুকে জাগাইতে ব্যস্ত ও প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

শরতের অন্তে হেমন্ত (১) আসিয়াছে, প্রকৃতি যেন বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া তমোগুণপ্রবলা হইয়াছে; সুতরাং মনুষ্য-পশু-পক্ষী-প্রভৃতির আর সে স্ফূর্ত্তি নাই, সকলেতেই যেন অত্যধিক জড়তা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, সকলেরই নিদ্রা, আলস্য, অসুস্থতা, বিষণ্ণতা প্রভৃতি সাতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। প্রকৃতির উষারূপ মৃদুহাস্য ক্রমেই মলিন ও অল্পক্ষণস্থায়ী হইয়া আসিতেছে, সুতরাং শৈশব ও কৈশোরের রক্তিম গণ্ডস্থলও আর দেখিতে পাওয়া যায় না;

---

(১) ৮ই আশ্বিন হইতে ৭ই অগ্রহায়ণ হেমন্তকাল।

ইহাতে যেন কালিমার ছায়া পড়িয়াছে। দিবসরূপ হাস্যবদনও অধিকক্ষণ স্থায়ী নহে এবং এই হাস্যও যেন মলিনতাময়। বোধ হইতেছে যে, প্রকৃতি জরাগ্রস্ত এবং নানারূপ শোকতাপে জর্জ্জরিত হইয়া সদাই যেন বিষণ্ণভাবে রহিয়াছে। শ্বাস ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু এক একবার দীর্ঘ উর্দ্ধশ্বাস পড়িতেছে, তাই বুঝি কখন কখন ভীষণ বাতাবর্ত্ত বহিতেছে এবং প্রলয়কাল উপস্থিত বলিয়া মনে হইতেছে।

কমলিনীকান্তের আর সে উজ্জ্বলতা, সে প্রসন্নতা নাই; ইনি ক্ষীণপ্রভ হইয়া মলিন হওয়ায় প্রকৃতি সতী যেন পদ্মিনীরূপে রমণী-গণকে পাতিব্রত্য ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্যই বুঝি ম্লান ও শুষ্কবদন হইয়া মৃতপ্রায় হইতেছে।

হেমন্তের অন্ত হইল, প্রকৃতিও যেন অন্তিম দশায় উপনীত হইল। ওষধিতৃণাদি শুষ্ক হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, অবশিষ্ট উদ্ভিদ্‌গণও মৃতপ্রায় হইয়াছে। কীটপতঙ্গাদি বিনষ্ট হইয়াছে, অবশিষ্ট জঙ্গম-জীবগণও মৃততুল্য বোধ হইতেছে। যাহা দেখি তাহাতেই যেন মৃতের লক্ষণ অনুভূত হইতেছে। আহা! প্রকৃতি সতী যেন আজ মৃত্যুশয্যায় শায়িতা হইয়াছে।

স্বভাব ও তাহার পরিবর্ত্তন।

পূর্ব্বসংস্কারবশে প্রতিক্ষণেই তিনটি গুণের পরিমাণ ক্রমাগতই পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে; অর্থাৎ কখন ক্ষণকালের জন্ত সত্ত্বগুণ, কখন রজোগুণ এবং কখন বা তমোগুণ প্রবল হয়; কিন্তু এই প্রবলতা স্থায়ী নহে, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সাধারণ নিয়মানুসারে ক্রমশঃ তমোগুণ হ্রাস হইয়া রজোগুণ প্রবল হইয়া থাকে এবং সত্ত্বগুণও কিছু কিছু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে, আবার ক্রমে ক্রমে তমঃ ও রজোগুণ হ্রাস হইয়া সত্ত্বগুণ প্রবল হয়। এইরূপে স্থায়ীভাবে ত্রিগুণের পরিবর্ত্তন হইতে হইতে যে জীব যে প্রকার ত্রিগুণের পরিমাণ লইয়া দেহত্যাগ করে, ঠিক সেই অবস্থায় অর্থাৎ গুণত্রয়ের সেই মাত্রা লইয়া জন্মগ্রহণ করে; ঐ যে ত্রিগুণের পরিমাণ, উহাই তাহার স্বভাব (১); এই স্বভাবকে সাধারণতঃ তাহার প্রকৃতিও বলিয়া থাকে। যখন ত্রিগুণের উক্তরূপে স্থায়ীভাবে পরিবর্ত্তন হয়, তখন তাহার স্বভাবেরও পরিবর্ত্তন ঘটে, সুতরাং তাহার বুদ্ধির, মানসিক ভাবের, ইন্দ্রিয়গণের এবং স্থূল শরীরেরও পরিবর্ত্তন হয়। উপরে যে ত্রিগুণের ক্ষণিক পরিবর্ত্তনের কথা বলা হইয়াছে, সেই প্রকার পরিবর্ত্তন হইতে হইতে যখন তমোগুণ বিশেষ প্রবল হয়, তখনই জীব স্বাভাবিক নিয়মানুসারে বর্ত্তমান দেহ ত্যাগ করিয়া দেহান্তর পরিগ্রহ করে। আকস্মিক মৃত্যুকালে ক্ষণিক পরিবর্ত্তন ক্রমশঃ না ঘটিয়া একবারে উৎকটভাবে তাহার গুণের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।

গুণের ক্ষণিক পরিবর্ত্তনে, স্থায়ী পরিবর্ত্তনের ন্যায় জীবের স্বভাবের বৈলক্ষণ্য হয় না। সাধারণ নিয়মানুযায়ী ক্রমে ক্রমে উৎকৃষ্টতর

---

(১) यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु इत्यादयः। गीता, १४। १४, १५।

গুণের পরিমাণ স্থায়ীরূপে বর্দ্ধিত হইতে থাকে, সুতরাং স্বভাবেরও ক্রমশঃ উৎকর্ষের দিকে গতি হয়, জীব এইরূপে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে করিতে উচ্চ হইতে উচ্চতর জন্ম লাভ করিতে থাকে। যদিও গুণের ক্ষণিক পরিবর্ত্তনের দ্বারা সাধারণতঃ স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয় না, তথাপি যদি কোন গুণ পুনঃ পুনঃ ঘন ঘন ক্ষণিক প্রবল হয়, তাহা হইলে সেই গুণেরই স্থায়ী প্রবলতা হইয়া থাকে, সুতরাং অভ্যাসের দ্বারা ঐ প্রকার কোন কোন গুণকে স্থায়ীরূপে প্রবল করিতে এবং কোন কোন গুণ হ্রাস করিতে পারা যায়, সুতরাং স্বভাবেরও পরিবর্ত্তন করিতে পারা যায়। যেমন, যদি কেহ সত্বগুণ-বৃদ্ধিকারক দয়া, ক্রোধহীনতা, লোভহীনতা প্রভৃতির কার্য্য ক্রমাগত করে, তাহা হইলে সত্বগুণের স্থায়ীরূপে বৃদ্ধি হইয়া তাহার স্বভাবেরও উৎকর্ষের দিকে পরিবর্ত্তন হয়, এবং সেই সময়ে তাহার মৃত্যু হইলে, সে সেই স্বভাবানুযায়ী উৎকৃষ্ট জন্ম লাভ করিয়া থাকে; কিন্তু সে যদি নিকৃষ্ট কামক্রোধাদির কার্য্যে ক্রমাগত আসক্ত হয়, তাহা হইলে তাহার তমোগুণ স্থায়ীরূপে প্রবল হইয়া অপকর্ষের দিকে তাহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয়, এবং সেই সময়ে তাহার মৃত্যু হইলে, সেই তমোগুণাধিক স্বভাব লইয়া নিকৃষ্ট জন্ম লাভ করে। এইরূপ অনুশীলনের দ্বারা যে অভ্যাস জন্মে, তাহাই সাধনা, যে সাধনা উৎকর্ষ-লাভোপযোগিনী তাহাই উৎকৃষ্ট এবং যাহা অপকর্ষোৎপাদিকা তাহাই নিকৃষ্ট।

কালস্রোতে ভাসমান জীবগণের শ্রেণীবিভাগ এবং তাহাদের ক্রমোৎকর্ষ।

অধোলোক বা স্থাবর হইতে পশুজাতি পর্য্যন্ত জীব এবং তাহাদের ক্রমোৎকর্ষ।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী গুণ হইতেই এই জগৎ এবং সৃষ্টবস্তুমাত্রই ন্যূনাধিকরূপে এই তিন গুণের সংমিশ্রণ হইতে উদ্ভূত। সংমিশ্রিত গুণত্রয়ের পরিমাণ কতকগুলি জীবে প্রায় একই রকম, এই জন্য তাহাদের মধ্যে অনেকটা সাদৃশ্য লক্ষিত হয় এবং তাহারা কোন নির্দ্দিষ্ট নামে অভিহিত হইয়া একটি শ্রেণীতে পরিগণিত হয়। জীবসকল অসংখ্য শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেও তাহারা সাধারণতঃ স্থাবর ও জঙ্গম এই দুইটি বৃহৎ শ্রেণীতে প্রধানতঃ বিভক্ত হইয়া থাকে। এই দুইটি শ্রেণী আবার বহুবিধ ক্ষুদ্র শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে, এবং এই শ্রেণীসমূহ পৃথক্ পৃথক্ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ঐ সকল শ্রেণীর প্রত্যেকটি অবান্তররূপে পুনরায় অসংখ্য অসংখ্য ক্ষুদ্রতর বা ক্ষুদ্রতম শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। এই প্রকারে যতক্ষণ এক একটি জীবে গিয়া উপনীত না হওয়া যায়, ততক্ষণ ক্রমে ক্রমে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর শ্রেণীতে জীবগণকে বিভক্ত করিতে পারা যায়। গুণত্রয়ের যে পরিমাণ সংমিশ্রণে একটি জীব হইয়াছে, ঠিক সেই পরিমাণে অপরটি হয় নাই, সেই জন্য একটি জীবের সহিত অপরটির অনেকটা সৌসাদৃশ্য থাকিতে পারে, কিন্তু তাহারা ঠিক এক নহে।

সাধারণতঃ যাহা বহুল পরিমাণে তমোগুণাত্মক, তাহা সৃষ্টির অতি নিম্নতম অবস্থা. যেমন, ধাতুপ্রস্তরাদি স্থাবর (১)। ক্রমে

---

(১) ধাতু প্রস্তরাদিকে জীব বলিতে পারা যায়, কারণ ইহাদের জন্ম, বৃদ্ধি এবং মৃত্যুও আছে। ইহাদের তমোগুণ অতি প্রবল এবং রজোগুণ ক্ষীণ বলিয়া দীর্ঘকালে

ক্রমে যতই ইহাতে রজোগুণের মাত্রাধিক্য হইতে থাকে, ততই ইহার ক্রিয়াশক্তিরও বৃদ্ধি হয় এবং ততই ইহা ক্রমে ক্রমে উন্নতির একটি সোপান হইতে অপরটিতে আরোহণ করিয়া উদ্ভিজ্জাদি স্থাবরের অবস্থা প্রাপ্ত হয়। বহুলক্ষবার স্থাবররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রত্যেক জীব পুনঃ পুনঃ যতই ঘুরিয়া ফিরিয়া আইসে, ততই ক্রমাগত রজোগুণের বৃদ্ধি হওয়াতে তাহার ক্রিয়াশক্তিরও বৃদ্ধি হইতে থাকে, এইরূপে ইহা জঙ্গম অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ঐ অবস্থায় উপনীত হইয়া, প্রথমতঃ জলজরূপে বহুবার জন্মগ্রহণ করিয়া কৃমি জন্ম প্রাপ্ত হয়, এবং কীট সরীসৃপাদিরূপে পুনঃ পুনঃ ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া পক্ষিজন্ম লাভ করে। বহুলক্ষবার পক্ষীরূপে পরিভ্রমণ করিয়া পশুযোনিতে জন্মগ্রহণ করতঃ লক্ষ লক্ষবার জন্ম হইতে জন্মান্তর লাভ করে। গুণত্রয়ের মধ্যে অতি নিকৃষ্টগুণবহুল স্থাবরজন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া, প্রত্যেক জীব যতই জন্ম হইতে জন্মান্তর লাভ করে, নৈসর্গিক নিয়মানুসারে ও ক্রমোন্নতিবশতঃ ততই তাহার তমোগুণ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া আসে, ও রজোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ঈষৎ পরিমাণে সত্বগুণের মাত্রার প্রাবল্য হইতে থাকে, কিন্তু পশুযোনির শেষ জন্ম পর্য্যন্ত সত্ব ও রজোগুণের উপরে তমোগুণের প্রাবল্য ও প্রাধান্য থাকে (১)। এই পর্য্যন্ত অধোলোক, ইহারা সৃষ্টির মধ্যে তমোগুণাধিক, সুতরাং মূঢ় ও অজ্ঞান।

ইহাদের অতি সামান্য মাত্র বৃদ্ধি হয়, সুতরাং আমরা ঐ পরিবর্ত্তন অনুভব করিতে পারি না। প্রস্তর বা ধাতু মৃত্তিকা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে অকাল মৃত্যুর অবস্থা প্রাপ্তি হয়।

(১) ঊর্দ্ধং সত্ত্ববিশালস্তমোবিশালশ্চ মূলতঃ সর্গঃ।
মধ্যে রজোবিশালো ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তঃ॥

সাংখ্যকারিকা, ৫৪।

ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা ইত্যাদিঃ। গীতা, ১৪।১৮

স্থাবর জীবসকলের তমোগুণোদ্ভূত জড়তাবশতঃ ক্রিয়াশক্তি এত অল্প যে আমরা ইহাদের কোন ব্যাপারই কোন ইন্দ্রিয়দ্বারা সাধারণতঃ উপলব্ধি করিতে পারি না (১)। যদিও জঙ্গমজীবসমূহের ক্রিয়াশক্তি আমরা বুঝিতে পারি, কিন্তু ইহাদের মধ্যে নিম্নশ্রেণীর কীট হইতে পশু পর্য্যন্ত সকলেরই আহার, নিদ্রা ও মৈথুন ব্যতীত আর কোন ব্যাপারই দেখিতে পাই না, ঐ তিনটীর উদ্দেশ্যেই যাহা চেষ্টা ও কার্য্য করিতে হয়, তাহাই তাহারা করিয়া থাকে, ও সেই জন্য যতটুকু ক্ষীণ চিন্তার প্রয়োজন, ততটুকুই করিতে বাধ্য হয়, তাহার বাহিরে ইহাদের চিন্তাশক্তি যাইতে পারে না। নিকৃষ্ট জন্মাবস্থায় ইহাদিগের ভয়-প্রভৃতি তমোগুণোদ্ভূত মানসিক বৃত্তিসকলই কেবল পরিলক্ষিত হয়, তৎপরে যতই জন্ম হইতে জন্মান্তর গ্রহণ করিতে করিতে রজোগুণের মাত্রা বৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই ক্রোধাদি সুস্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত হইতে থাকে। প্রত্যেক জীব উপরিউক্ত প্রণালীক্রমে অতি নিম্নতম যোনি হইতে আরম্ভ করিয়া, আর্য্যশাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট অশীতিলক্ষ জন্ম পরিভ্রমণ করিলে, ক্রমোৎকর্ষবশে যখন তাহার রজোগুণ প্রবল হইয়া অপর দুইটি গুণ অপেক্ষা, অথবা ইহাদের মধ্যে কোন একটি হইতে অধিক-তর হয়, তখনই মানবযোনি প্রাপ্ত হয় এবং মনুষ্যরূপে চারি লক্ষ বার জন্মিয়া মনুষ্যজাতির মধ্যে উৎকৃষ্ট জন্ম লাভ করে (২)।

---

(১) तमसा बहुरूपेण वेष्टिता कर्म्महेतुना ।
अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः ॥ मनु, १।४९ ।

(२) बृहन्नारदीयपुराणम्, ९८म अध्यायः ।
स्थावरं विंशल्लक्षम् जलजं नवलक्षकम् ।
कृमिजा दशलक्षञ्च रुद्रलक्षञ्च पक्षिणः ।

মধ্যলোক বা মনুষ্য জাতি এবং তাহাদের বর্ণ বা শ্রেণীবিভাগ ও ক্রমোৎকর্ষ।

মনুষ্যজাতিকে মধ্যলোক কহে। মানবমাত্র সকলেই যে একই প্রকার গুণযুক্ত তাহা নহে, ত্রিগুণের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপ পরিমাণ লইয়া তাহারা জন্মগ্রহণ করে। ঐরূপ গুণের তারতম্যানুসারে সমগ্র মনুষ্য-জাতি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটি বর্ণ বা শ্রেণীতে বিভক্ত (১), এবং ঐ প্রত্যেক শ্রেণী আবার ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর শ্রেণীতে ক্রমান্বয়ে বিভক্ত হইয়াছে। এই প্রকারে বিভাগ করিতে করিতে ঐ বিভাগকার্য্য প্রতি মনুষ্যে গিয়া উপনীত হইয়া থাকে, তখন দেখিতে পাওয়া যায় যে, একটি মনুষ্য অপরটির সহিত সমশ্রেণীস্থ হইলেও তাহাদেরও পরস্পরের প্রকৃতি অর্থাৎ গুণত্রয়ের পরিমাণ বিভিন্ন, সুতরাং পরস্পরের কার্য্য, চেষ্টা, প্রবৃত্তি, আকৃতি ইত্যাদি সমস্তই পৃথক্।

পশবো বিংশলক্ষস্য চতুর্লক্ষস্য মানবাঃ।
এতেষু ভ্রমণং কৃত্বা দ্বিজত্বমুপজায়তে ॥

প্রাণতোষিণী, ১ম কাণ্ডঃ, ২য় পরিচ্ছেদঃ।

এই মত ব্রহ্মাণ্ড ভরি অনন্ত জীবগণ।
চৌরাশি লক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ॥
কেশাগ্র শতেক ভাগ পুনঃ শতাংশ করি।
তার সম সূক্ষ্ম জীবের স্বরূপ বিচারি॥
তার মধ্যে স্থাবর জঙ্গম দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক্ জলস্থলচর ভেদ॥
তার মধ্যে মনুষ্যজাতি অতি অল্পতর।

চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যভাগ, ১৯ পঃ।

ঐ স্থানে উদ্ধৃত শ্লোকসমূহও দ্রষ্টব্য।

(১) ঋগ্বেদসংহিতা, পুরুষসূক্ত, ১০ মণ্ডল। মনু, ১০।৪। গীতা, ৪।১৩।

মনুষ্যলোকের নিম্নতম শ্রেণী, অর্থাৎ ঠিক যখন পশুজাতি হইতে অতি অল্পই উন্নত হইয়া জীব মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াছে, তখন যদিও সত্ব ও তমঃ হইতে রজোগুণের পরিমাণ কিছু অধিক, কিন্তু তখনও তমোগুণ প্রবল থাকে। এইরূপ গুণাবলম্বী মনুষ্যগণকে শূদ্রবর্ণ কহিয়া থাকে। মনুষ্যজাতির মধ্যে শূদ্রবর্ণ ব্যক্তি তমোগুণাধিক হইলেও পশুপ্রভৃতি অধোলোক হইতে ইহার তমোগুণ কম এবং সত্ব ও রজঃ গুণ অধিক। এই শূদ্রবর্ণের নিকৃষ্টতম শ্রেণী মানবের প্রথমাবস্থা। সাধারণ নিয়মানুযায়ী জীব মনুষ্যজন্মের মধ্যে এই নিকৃষ্টতম বর্ণের অন্তর্গত ঐ নিম্নতম শ্রেণী বা জাতি হইতে আরম্ভ করতঃ পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া, ক্রমাগত উৎকৃষ্টতর গুণের আধিক্য লাভ করিতে করিতে, অবশেষে শূদ্রবর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতিতে জন্মগ্রহণকরণানন্তর, যে বর্ণে তমোগুণের কিয়ৎপরিমাণ হ্রাস হইয়াছে ও যাহাতে রজোগুণের আধিক্য আছে এবং সত্বগুণেরও কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে, সেই রজস্তমঃপ্রধান বৈশ্যবর্ণে জন্মলাভ করে; ইহাতে রজোগুণ প্রবল, তাহা অপেক্ষা তমোগুণের এবং তদপেক্ষা সত্বগুণের পরিমাণ অল্প। এই বর্ণে পুনঃ পুনঃ জন্মিয়া, ক্রমাগত উৎকর্ষ লাভ করিতে করিতে, ইহার অন্তর্গত নিকৃষ্ট শ্রেণী হইতে ক্রমাগত উচ্চতর শ্রেণীতে জন্মগ্রহণকরতঃ, অবশেষে যাহাতে তমোগুণ অত্যন্ত ক্ষীণ, রজোগুণ বিশেষ প্রবল এবং সত্বগুণও বৃদ্ধির অবস্থা প্রাপ্ত, সেই রজঃসত্বপ্রধান বর্ণে জন্মগ্রহণ করে; ইহাতে রজোগুণ প্রবল, তাহা অপেক্ষা সত্বগুণের এবং তদপেক্ষা তমোগুণের ন্যূনতা থাকে। এই শ্রেণীকে ক্ষত্রিয়বর্ণ বলে। ইহাতেও আবার উপরিউক্তরূপে নিকৃষ্টতম শ্রেণী হইতে আরম্ভ করিয়া পুনঃ পুনঃ জন্মিয়া উৎকর্ষ লাভ করিতে করিতে তদন্তর্গত উচ্চতম শ্রেণীতে জন্মলাভ করিয়া, পরে বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠবর্ণে সে জন্মগ্রহণ করে। এই সত্বগুণপ্রধান

শ্রেণীকে ব্রাহ্মণবর্ণ কহে। এই শ্রেণীর মনুষ্যে সত্ত্বগুণ প্রবল হইয়া রজঃ ও তমোগুণকে পরাভব করে, অর্থাৎ ইহাদের সত্ত্বগুণ প্রবল, তাহা অপেক্ষা রজোগুণ ন্যূন এবং তদপেক্ষা তমোগুণ অল্প। ঐ ব্রাহ্মণবর্ণের অন্তর্গত অতি নিম্ন শ্রেণী হইতে আরম্ভ করিয়া, বারংবার জন্মগ্রহণকরতঃ, ক্রমে ক্রমে উৎকর্ষ লাভ করিতে করিতে, উচ্চবর্ণের অন্তর্গত যাহা শ্রেষ্ঠ শ্রেণী—মনুষ্যজন্মের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ জন্ম—তাহাই প্রাপ্ত হয়। মনুষ্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণবর্ণে সর্ব্বাপেক্ষা সত্ত্বগুণ অধিক, তৎপরে ক্রমান্বয়ে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রে অল্প। ঐরূপ শূদ্রবর্ণে তমোগুণ প্রবলতম, তদপেক্ষা ক্রমান্বয়ে বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণে ন্যূন।

গণিতের নিয়মানুযায়ী তিনটি অঙ্ক তিন তিনটি করিয়া সন্নিবেশিত হইলে ছয়টি অঙ্ক হইয়া থাকে, ইহা হইতে অধিক বা অল্প হইতে পারে না। সেইরূপ সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিনটিকে অগ্রপশ্চাৎ করিয়া সজ্জিত করিলে, নিম্নলিখিতরূপ ছয় প্রকারের হইয়া থাকে। ঐ তিনটি গুণ আধিক্যন্যূনতাযন্থায়ী ক্রমান্বয়ে মিশ্রিত হইলে, অর্থাৎ ঐ তিনটির প্রত্যেকরূপ সংমিশ্রণে প্রথমটি হইতে দ্বিতীয়টি তদপেক্ষা তৃতীয়টি কম হইলে, নিম্নলিখিতরূপ ছয় প্রকারের সংমিশ্রণ হইয়া শ্রেণীবদ্ধ হইতে পারে :—

(১) সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ = ব্রাহ্মণবর্ণ।
(২) রজঃ, সত্ত্ব, তমঃ = ক্ষত্রিয়বর্ণ।
(৩) রজঃ, তমঃ, সত্ত্ব = বৈশ্যবর্ণ।
(৪) তমঃ, রজঃ, সত্ত্ব = শূদ্রবর্ণ।
(৫) সত্ত্ব, তমঃ, রজঃ = এ প্রকার মিশ্রণ মনুষ্যে হইতে পারে না, সুতরাং কোন বর্ণই হয় না।
(৬) তমঃ, সত্ত্ব, রজঃ = ঐ

উপরিলিখিত প্রথমোক্ত চারিপ্রকার ব্যতীত শেষোক্ত দুইপ্রকারে মনুষ্যগণে ত্রিগুণের সংমিশ্রণ হইতে পারে না। কারণ রজোগুণ অপর দুই গুণ অপেক্ষা, অন্ততঃ উহাদের মধ্যে একটি অপেক্ষা, অধিক না হইলে মনুষ্য জন্ম হইতে পারে না; মনুষ্যের মধ্যে কেহ সত্বগুণাধিকই হউক বা তমোগুণাধিকই হউক, সে ঊর্দ্ধ বা অধোলোক হইতে অধিক রজোগুণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। এই জন্যই সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে মনুষ্যকে রজোগুণাধিক বলিয়া থাকে (১)। উপরিউক্ত ৫ম ও ৬ষ্ঠ এই দুই প্রকারের সংমিশ্রণে রজোগুণ অপর দুই গুণ অপেক্ষা ন্যূন, সুতরাং মনুষ্যে এ প্রকার হইতে পারে না। শেষোক্ত দুই প্রকার সম্ভব না হওয়ার আরও কারণ এই যে, সত্ব ও তমঃ এই দুইটি সম্পূর্ণ বিপরীত গুণ, সুতরাং উভয়ই একাধারে প্রবল হইয়া থাকিতে পারে না। জ্ঞান ও অজ্ঞান, সত্য ও মিথ্যা, স্থৈর্য্য ও জড়তা, বুদ্ধি ও মূঢ়তা ইত্যাদি এক ব্যক্তিতে এক কালে প্রবল হইতে পারে না। এই জন্যই সত্ব অত্যন্ত প্রবল তদপেক্ষা তমঃ কিঞ্চিন্ন্যূন, অথবা তমঃ অত্যন্ত অধিক তাহা অপেক্ষা সত্ব কিছু কম, ইহা হইতে পারে না। ক্রমোৎকর্ষসাধনের জন্যও এইরূপ সংমিশ্রণ ঘটিতে পারে না। কেহ অধিকতম তমোগুণ হইতে একবারে সত্বগুণের আধিক্যে উপনীত হইতে পারে না। তমোগুণের প্রবলতা হইতে ক্রমে ক্রমে রজোগুণের আধিক্য হওয়া, তৎপরে ক্রমশঃ সত্বগুণের অধিকতম বৃদ্ধিপ্রাপ্তিই প্রকৃতির নিয়ম। জড়তার আধিক্য হইতে চঞ্চলতা ও কার্য্যকারিতায় এবং এই দুইটি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অন্তর্নিহিত

---

(১) মধ্যে রজোবিশালঃ! সাংখ্যকারিকা, ৫৪।

মধ্যলোক বা মনুষ্যলোক রজোবিশাল, অর্থাৎ রজঃপ্রধান।

মনুসংহিতা, ১২।৪০।

ক্রিয়াশক্তিযুক্ত ধৈর্য্যে উপনীত হওয়াই ক্রমোৎকর্ষের সাধারণ নিয়ম। এই সকল কারণবশতঃই শেষোক্ত দুই প্রকারের মিশ্রণানুযায়ী কোন বর্ণই হইতে পারে না, সুতরাং মনুষ্যগণ কেবলমাত্র প্রথমোক্ত চারি প্রকারে সংমিশ্রিত গুণানুযায়ী চারি বর্ণে বিভক্ত হইয়া থাকে এবং তদতিরিক্ত পঞ্চমবর্ণ হওয়া সম্ভবপর নহে (১)। অনেকে বলিতে পারেন যে, একই ব্যক্তিতেই এক সময়ে সত্ত্বগুণ এবং অন্য সময়ে তমোগুণ অধিক হইতে পারে, তবেত এক ব্যক্তিতে ঐ উভয় গুণই প্রবল হইতে পারে। এই প্রকার প্রবলতা ক্ষণিক পরিবর্তনমাত্র, কোন গুণের এইরূপ ক্ষণিক প্রবলতানুযায়ী বর্ণবিভাগ হয় নাই, মনুষ্যের স্বভাব বা প্রকৃতি অনুযায়ী অর্থাৎ ত্রিগুণের স্থায়ী পরিবর্তনানুযায়ীই ঐ প্রকার বর্ণবিভাগ হইয়াছে, এতৎসম্বন্ধে পূর্ব্বে বিশেষরূপে বলা হইয়াছে।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে ইহাই বুঝা গেল যে, ত্রিগুণের স্থূল সংমিশ্রণে মনুষ্যগণ স্থূল চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে, ইহা অপেক্ষা অধিক বা অল্প হইতে পারে না। এই এক একটি শ্রেণীকে বর্ণ কহিয়া থাকে। তিনটি গুণের পৃথক্ পৃথক্ পরিমাণে সংমিশ্রণে

---

(১) ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्यः कृतः ।
ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रोऽजायत ॥ ऋग्वेद, १०।९२
ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यस्त्रयो वर्णा द्विजातयः ।
चतुर्थ एकजातिस्तु शूद्रो नास्ति तु पञ्चमः ॥ मनु, १०।४।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিনটি বর্ণ (উপনয়ন সংস্কারহেতু) দ্বিজ বা দ্বিজন্ম, চতুর্থ বর্ণ শূদ্র একজন্ম অর্থাৎ দ্বিজ নহে। এই চারি বর্ণ ব্যতীত পঞ্চম বর্ণ নাই।

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः । गीता, ४।१३ ।

মনুষ্যগণ প্রত্যেক বর্ণের অন্তর্গত অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রেণীতে বিভক্ত হয়, আবার প্রত্যেক মনুষ্য অপরটি হইতে ত্রিগুণের পরিমাণের স্বতন্ত্ররূপ সংমিশ্রণে উৎপন্ন, সুতরাং একটি মনুষ্য হইতে অপরটি বিভিন্ন।

মনুষ্যগণের চারিটি শ্রেণী চারি বর্ণরূপে কথিত হয়, তাহা যে শরীরের বর্ণানুযায়ী তাহা নহে। আর্য্যগণ অকিঞ্চিৎকর স্থূল বাহ্য বর্ণের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া এই প্রকার শ্রেণীবিভাগ করেন নাই। কৃষ্ণবর্ণ চর্ম্মে আচ্ছাদিত শুভ্র সাত্ত্বিকভাব থাকিতে পারে, আবার শ্বেতশরীরের অভ্যন্তরে গভীর কৃষ্ণবর্ণ তামসিক নারকীয় চিত্ত আবৃত থাকিতে পারে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কৃষ্ণবর্ণ ও শূদ্র শ্বেতবর্ণ হইতে পারে, সুতরাং শরীরের বর্ণ, বর্ণবিভাগের লক্ষণ নহে। আভ্যন্তরিক ভাব শরীরের বাহিরে পৃথক্ পৃথক্ বর্ণে রঞ্জিত হইয়া তেজঃপুঞ্জে পরিস্ফুট হইয়া থাকে। মনুষ্যের মানসিক ভাবসমূহ পরিলক্ষিত হইয়াই শ্রেণী-বিভাগ হইয়াছে এবং সেই সকল শ্রেণীকে আর্য্যগণ বর্ণ নামে অভিহিত করিয়াছেন। সুতরাং সত্ত্বগুণবহুল ব্যক্তির শরীরের বাহিরে চতুষ্পার্শ্বের সূক্ষ্ম তেজঃপুঞ্জ শুভ্রপ্রধান বর্ণরূপে, রজোগুণবহুল ব্যক্তির রক্তপ্রধান বর্ণরূপে এবং তমোগুণবহুল ব্যক্তির কৃষ্ণপ্রধান বর্ণরূপে প্রতীয়মান হয়, এই জন্যও সত্ত্বগুণ শুভ্রবর্ণ, রজোগুণ রক্তবর্ণ এবং তমোগুণ কৃষ্ণবর্ণ। যে মনুষ্যে তমোগুণ অধিক, তদপেক্ষা রজোগুণ এবং তাহা অপেক্ষা সত্ত্বগুণ অল্প, সেই শূদ্রবর্ণ মনুষ্যের শরীরের বাহিরের সূক্ষ্ম তেজঃপুঞ্জ, অধিকতম কৃষ্ণবর্ণ, তন্ন্যূন লোহিতবর্ণ এবং তদপেক্ষা অল্প শুভ্রবর্ণে মিশ্রিত বর্ণরূপে পরিদৃশ্যমান হয়। তাহা অপেক্ষা যে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, তাহার ঐ তেজঃপুঞ্জের বর্ণ উহা হইতে কম পরিমাণে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। এইরূপে ঐ শুভ্র, রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ ক্রমান্বয়ে অধিক ও ন্যূনরূপে মিশ্রিত হইলে নিম্নলিখিত-রূপ হইয়া থাকে যথা :—

শুভ্ররক্ত কৃষ্ণ = সত্ত্বরজঃ তমঃ = ব্রাহ্মণবর্ণ।

রক্তশুভ্র কৃষ্ণ = রজঃ সত্ত্ব তমঃ = ক্ষত্রিয়বর্ণ।

রক্তকৃষ্ণ শুভ্র = রজঃ তমঃ সত্ত্ব = বৈশ্যবর্ণ।

কৃষ্ণরক্ত শুভ্র = তমঃ রজঃ সত্ত্ব = শূদ্রবর্ণ।

এই প্রকারে মনুষ্যগণ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে এবং এই কারণবশতঃই উক্ত শ্রেণীসমূহ বর্ণ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

ঊর্দ্ধলোক বা দেবলোক।

মনুষ্যজন্মের পরে জীব ক্রমোৎকর্ষবশে সত্ত্বগুণপ্রধান দেবলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে (১)। দেবলোককে ঊর্দ্ধলোক কহে, ইহাতেও গুণের তারতম্যানুসারে নানাপ্রকার শ্রেণীবিভাগ আছে (২)। ইহাতেও আবার একটি শ্রেণী হইতে অপরটিতে গিয়া অবশেষে উচ্চতম লোক প্রাপ্তির পরে ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া পরমপদ লাভ করে, তখন সে চিরশান্তি প্রাপ্ত হয়, আর তাহাকে জন্মমৃত্যুরূপ দুঃখভোগ করিতে

---

(১) যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু ইত্যাদি। ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা ইত্যাদি। গীতা, ১৪।১৪, ১৮। সাংখ্যকারিকা, ৫৩, ৫৪, ৫৫। মনু, ১২।৪০।

(২) যক্ষ, রক্ষ, ভূত, পিশাচ প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর দেবযোনি।

অমরকোষ, স্বর্গবর্গ, ১১।

হয় না (১)। সৃষ্টির উচ্চতম লোক, অর্থাৎ ব্রহ্মা হইতে নিম্নতম স্থাবর পর্য্যন্ত সকলেরই, জন্মমৃত্যু আছে, কিন্তু পরমপদ ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে পারিলে জীব উহা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া থাকে (২)।

পূর্ব্বোক্তরূপে নিকৃষ্টতম স্থাবর জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে উৎকর্ষ লাভ করাই সাধারণ নিয়ম, সকলেই এই প্রকারে ক্রমশঃ উন্নত হইতে হইতে অবশেষে চরম অবস্থায় উপনীত হয়; কিন্তু মনুষ্যগণ সাধনাদি দ্বারা এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে পারে, এতৎ-সম্বন্ধে পরে বিশেষরূপে বলা হইবে।

মনুষ্যগণ জন্মের দ্বারা কি প্রকারে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ লাভ করে।

পশু প্রভৃতি অধোলোকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্ত্রী ও পুরুষ যে জাতীয় বা যেরূপ ধর্ম্মাক্রান্ত, অর্থাৎ উভয়ে যে পরিমাণ ত্রিগুণের সংমিশ্রণ বর্ত্তমান থাকে, তাহাদের সন্তানগণও প্রায় সেই জাতীয় হইয়া, অর্থাৎ প্রায় একই রূপ ত্রিগুণের পরিমাণ লইয়া, জন্মগ্রহণ করে। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, একই জীবের পৃথক্ পৃথক্ সময়ে পৃথক্ পৃথক্ রূপে ত্রিগুণের ক্ষণিক পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, তাহার জন্যই একই স্ত্রীপুরুষের সন্তানগণের মধ্যে যদিও পরস্পর পার্থক্য ঘটিতে পারে, কিন্তু তথাপি তাহারা মাতৃপিতৃগুণাবলম্বী হইয়া এক জাতীয়ই হইয়া থাকে, কখনও সম্পূর্ণরূপ বিভিন্নজাতীয় হইতে দেখা যায় না; অর্থাৎ

---

(১) অগ্নির্জ্যোতিরহরিত্যাদি। গীতা, ৮।২৪।

(২) মামুপেত্য পুনর্জন্ম ইত্যাদি। গীতা, ৮।১৫, ১৬, ২৫।

বৃষগবীর সন্তান গোজাতীয়, ব্যাঘ্রব্যাঘ্রীর সন্তান ব্যাঘ্রজাতীয়, ঘোটক ঘোটকীর সন্তান ঘোটকজাতীয়, গর্দ্দভগর্দ্দভীর সন্তান গর্দ্দভজাতীয়, কোকিলকোকিলার সন্তান কোকিলজাতীয় ইত্যাদিরূপই হইয়া থাকে, কিন্তু বৃষগবীর সন্তান কখন মহিষ হয় না, ঘোটকঘোটকীর সন্তান কখন গর্দ্দভ হয় না, গর্দ্দভগর্দ্দভীর সন্তান কখন ঘোটক হয় না, ব্যাঘ্রব্যাঘ্রীর সন্তান কখন সিংহ হয় না, অথবা কোকিলকোকিলার সন্তান কখন বায়স হয় না। মৃত্যুকালে জীব ত্রিগুণের যেরূপ পরিমাণ লইয়া দেহত্যাগ করে, তাহার উপযোগী শরীর ধারণ করিবার জন্ত সমধর্ম্মাক্রান্ত বা সমগুণাবলম্বী পিতামাতাকে আশ্রয় করে।

পশুপ্রভৃতি অধোলোকে একটি জাতির সহিত অপরটির যেরূপ পার্থক্য, সেইরূপ মধ্যলোকে অর্থাৎ মনুষ্যগণের মধ্যেও একটি বর্ণের সহিত অপর বর্ণের পার্থক্য, এবং যেমন পশুপ্রভৃতির মধ্যে এক জাতীয় স্ত্রীপুরুষের সন্তান সেই জাতীয়ই হয়, তদ্রূপ মনুষ্যগণের মধ্যেও ঘটিয়া থাকে। ইহাদের স্ত্রীপুরুষ যেরূপ ধর্ম্মাক্রান্ত, অর্থাৎ তাহারা যে পরিমাণ ত্রিগুণযুক্ত, তাহাদের সন্তানগণও প্রায় সেইরূপই হইয়া থাকে, অর্থাৎ সত্বগুণপ্রবল স্ত্রীপুরুষের বা ব্রাহ্মণব্রাহ্মণীর সন্তান ব্রাহ্মণের গুণযুক্ত বা ব্রাহ্মণ বর্ণ, সত্বরজোগুণপ্রধান স্ত্রীপুরুষের বা ক্ষত্রিয়ক্ষত্রিয়ার সন্তান ক্ষত্রিয়ের গুণযুক্ত বা ক্ষত্রিয়বর্ণ, রজতমোগুণ-প্রধান স্ত্রীপুরুষের বা বৈশ্যবৈশ্যার সন্তান বৈশ্যের গুণযুক্ত বা বৈশ্যবর্ণ এবং তমোগুণবহুল স্ত্রীপুরুষের বা শূদ্রশূদ্রার সন্তান শূদ্রের গুণযুক্ত বা শূদ্রবর্ণ হইয়া থাকে (১)। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কোন একটি

---

(১) সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষ্বক্ষতযোনিষু।
আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যা জ্ঞেয়াস্ত এব তে॥ মনু, ১০।৫।

সকল বর্ণেতেই তুল্যবর্ণীয়া, অক্ষতযোনির অবস্থায় পরিণীতা পত্নীতে উৎপাদিত সন্তান ক্রমান্বয়ে তত্তদ্বর্ণীয় হইয়া থাকে।

গুণকে প্রধান করিয়া ত্রিগুণের নানাপ্রকার সংমিশ্রণে প্রত্যেক বর্ণে পৃথক্ পৃথক্ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রেণী হইয়া থাকে, অর্থাৎ সত্বগুণপ্রধান ব্রাহ্মণবর্ণ সত্বগুণপ্রবল ত্রিগুণের পৃথক্ পৃথক্ পরিমাণানুযায়ী নানাপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রেণীতে, এবং ঐ প্রকার নিয়মে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রবর্ণও বহুবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রেণীতে, বিভক্ত হইয়াছে।

ঐ প্রত্যেক বর্ণের অন্তর্গত ঐ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রেণীকেই আমরা সাধারণতঃ জাতি বলিয়া থাকি, কিন্তু 'জাতি' শব্দের প্রকৃত অর্থ জন্ম। 'জাতি' শব্দের দ্বারা নিত্য, সমবেত ধর্ম্মকেও বুঝায়, যেমন মনুষত্ব, ঘোটকত্ব ইত্যাদি। জন্মের দ্বারাই কতকগুলি জীবে কতকগুলি ধর্ম্ম সমান বা সাধারণ হইয়া থাকে, সেই সকল সমান ধর্ম্মযুক্ত জীবগণে যে শ্রেণী হয়, তাহাকে 'জাতি' বলে। ঐ সকল ধর্ম্মই ঐ সমুদায় জীবের বিশেষত্ব। কোন জীবে যে সকল ধর্ম্ম বিদ্যমান থাকিলে আমরা মনুষ্য সংজ্ঞা দিয়া থাকি, এবং তাহাকে অন্য জীব হইতে বিভিন্ন করিতে ও চিনিতে পারি, তাহাই মনুষ্যত্ব বা মনুষ্যের বিশেষত্ব। ঐ সকল ধর্ম্ম পশুতে বা অন্য জীবে দেখিতে পাওয়া যাইবে না। যেমন মনুষ্য প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ শ্রেণীতে কতকগুলি সমান ধর্ম্ম থাকে, ঐরূপ তদন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রেণীতেও থাকে, সেই সকল ধর্ম্ম সেই সমুদায় ক্ষুদ্র শ্রেণীর বিশেষত্ব। তাহাদ্বারাই আমরা ঐ ক্ষুদ্র শ্রেণীসমূহকে বিভিন্ন করিতে ও চিনিতে পারি। অভ্যস্ত না হইলে কোন্ জীব কোন্ ক্ষুদ্র শ্রেণীর অন্তর্গত তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। যেমন, কোন একটি ঘোটক দেখিলে উহা কোন্ শ্রেণীর ঘোটক, অভ্যস্ত না হইলে তাহা হঠাৎ বুঝিতে পারা যায় না, ঐরূপ মনুষ্যের মধ্যেও কাহাকেও হঠাৎ দেখিলে সে ব্রাহ্মণ, কিংবা অন্য বর্ণ ব্যক্তি, তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায় না, অর্থাৎ কি প্রকারের ধর্ম্মসমূহ বিদ্যমান থাকিলে ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব, বৈশ্যত্ব বা শূদ্রত্ব হয়, তাহা বিশেষরূপে

দেখিয়া অভ্যস্ত না হইলে কে কোন্ বর্ণান্তর্গত তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

ত্রিগুণের তারতম্যবশতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক শ্রেণীর পশুর মধ্যে সকলগুলির কেবল যে আকৃতিগত সাদৃশ্য থাকে তাহা নহে, তাহাদের কোন কোন রিপুরও প্রবলতা থাকে এবং প্রায় সকলেরই প্রকৃতি প্রবৃত্তি প্রভৃতি সমানরূপে লক্ষিত হইয়া থাকে। যেমন আমরা দেখিতে পাই যে, পশুগণের মধ্যে ছাগে কামের, মহিষে ক্রোধের, বানরে লোভের, উষ্ট্রে মদের, মেষে মোহের এবং মার্জ্জারে মাৎসর্য্যের আধিক্য থাকে। কোন কোন শ্রেণীতে কোন কোন সদ্‌গুণের বা দোষের আতিশয্যও দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন, গোজাতিতে ধৈর্য্য, সিংহে উদারতা, কুক্কুরে প্রভুভক্তি, শৃগালে ধূর্ত্ততা, ঘোটকে অস্থিরতা এবং গর্দ্দভে মূঢ়তা। পশুর ন্যায় পক্ষী-জাতির মধ্যেও উক্তরূপ রিপুপ্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন, পারাবতের কাম, কাকের ধূর্ত্ততা, কুক্কুটের অহঙ্কার, ময়ূরের ক্রোধ, বকের হিংসা ইত্যাদি। প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যেও আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রেণীতে সকলের মধ্যে আরও অধিক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়; যেমন, পৃথক্ পৃথক্ জাতীয় ঘোটকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গুণ বা দোষ প্রায় সমভাবে বর্ত্তমান থাকে। ইহার মধ্যে এক জাতীয় অশ্বের সহিত অপর জাতীয়ের সংমিশ্রণ হইলে উভয়ের মধ্যবর্ত্তী গুণ ও দোষ লইয়া ইহাদের সন্তান জন্মে। একই স্থানের অশ্বগণের মধ্যে অবাধ সংমিশ্রণ ঘটে বলিয়া, সেই সেই স্থানের অশ্বগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রেণীর বিভিন্নতা বুঝিতে পারা যায় না; তাহাদিগের মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়ার পর যদি এক শ্রেণীর সহিত অপর শ্রেণীর সংসর্গ না ঘটিতে পায়, তাহা হইলে প্রত্যেক শ্রেণীই বিশুদ্ধ থাকে। ভিন্ন ভিন্ন দেশের অশ্বগণের মধ্যে পরস্পর অবাধ সংমিশ্রণ সহজে ঘটে না বলিয়া,

তাহাদের মধ্যে পার্থক্য বিশেষরূপে লক্ষিত হইয়া থাকে; ইহাদের মধ্যে ঐ প্রকার সংমিশ্রণ সহজ হইলে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেশজাত অশ্বগণের পরস্পরের বিশেষ পার্থক্য লুপ্ত হইয়া প্রায় একই প্রকার সঙ্করজাত অশ্ব হইয়া থাকে। যে প্রকার অশ্বসম্বন্ধে বলা হইল, সেইরূপ অন্যান্য পশুতেও ঘটিয়া থাকে। যেমন পশুগণের মধ্যে একজাতির অন্তর্গত পৃথক্ পৃথক্ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রেণীর মিশ্রণের বিষয় বলা হইল, সেইরূপ বৃহৎ বৃহৎ শ্রেণীতেও ঘটিতে পারে। ঐ প্রকার সংমিশ্রণের কার্য্য ও ফল আমরা সচরাচর ঘোটকজাতির সহিত গর্দ্দভজাতির সংমিশ্রণে দেখিতে পাই। এইরূপে জাত সন্তান ঘোটকও নহে বা গর্দ্দভও নহে, কিন্তু তাহাদের উভয়ের কিয়ৎ পরিমাণে সাদৃশ্য লইয়াই জন্মগ্রহণ করে; তন্মধ্যে জননীর অপেক্ষা জনকের সহিতই অধিক সাদৃশ্য লক্ষিত হইয়া থাকে (১)।

---

(১) "For instance, I think those authors are right who maintain that the ass has the prepotent power over the horse, so that both the mule and the hinny resemble more closely the ass than the horse, but that the prepotency runs more strongly in the male than in the female ass, so that the mule, which is the offspring of the male ass and mare, is more like an ass than is the hinny which is the offspring of the female ass and stallion."

Darwin's 'Origin of Species'
(6th edition) Chapter IX, p. 261.

"Mules inherit to an extraordinary degree the shape and peculiarities of the sire; from the mare they derive size, but rarely her bad shape or unsoundness."

Encyclopædia Britanica,
Vol. XVII, p. 14, under the heading 'Mule.'

যেমন পশুগণের সম্বন্ধে বলা হইল, তদ্রূপ মনুষ্যগণের মধ্যেও এক একটি শ্রেণী যদি বিশুদ্ধ থাকে, অর্থাৎ যদি কোন বংশের সন্ততিগণ সমগুণাবলম্বী পৃথক্ পৃথক্ বংশের সন্ততিগণের সহিত দাম্পত্যসম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট হয়, এবং তাহারা স্বকীয় গুণানুযায়ী কার্য্যের অনুষ্ঠান এবং আচার ব্যবহারাদির নিয়ম পালন করে, তাহা হইলে ঐ সকল বংশ লইয়া যে শ্রেণী হয়, তাহার সকল ব্যক্তিতেই কেবলমাত্র যে আকৃতিগত বাহ্য সাদৃশ্য থাকে তাহা নহে, তাহাদের মানসিক ভাব, প্রকৃতি, প্রবৃত্তিপ্রভৃতিরও সাদৃশ্য লক্ষিত হয়, সুতরাং কোন রিপুর আধিক্য বা ন্যূনতা, অথবা কোন গুণ বা দোষের আতিশয্য, সকলেতেই প্রায় সমানভাবে থাকে। যেমন আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই যে, ধার্ম্মিকের বংশে ধার্ম্মিক, দাতার বংশে দাতা, কৃপণের বংশে কৃপণ, ক্রোধীর বংশে ক্রোধী, লোভীর বংশে লোভী, চোরের বংশে চোর ইত্যাদিরূপে সন্তানপরম্পরায় পূর্ব্ব পুরুষদিগের গুণ ও দোষ প্রকাশ পাইয়া থাকে (১)। এই জন্য আর্য্যশাস্ত্র বলিয়াছেন

(১) "A celebrated French writer observes, that 'physical organisation, of which moral is the offspring, transmits the same character from father to son, through a succession of ages. The Apii were always haughty and inflexible, the Catos always severe. The whole line of the Guises were bold, rash, factious; compounded of the most insolent pride and the most seductive politeness. From Francis de Guise to him who, alone and in silence, went and put himself at the head of the people of Naples, they were all, in figure, in courage, and in turn of mind, above ordinary men. I have seen whole length portraits of Francis de Guise, of the Balafré, and of his son; they are all six feet high, with the same features, the same courage and boldness in the forehead, the eye and the attitude. This continuity, this series of beings alike, is still more observable in animals; and if as much care were taken to per-

"আত্মা বৈ পুত্রো জায়তে" অর্থাৎ পিতা স্বয়ং পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন, অর্থাৎ পিতার সহিত পুত্রের আকৃতি, প্রকৃতি, মানসিক ভাব ও প্রবৃত্তি,

---

petuate fine races of men as some nations still take to prevent the mixing of the breeds of their horses and hounds, the geneology would be written in the countenance and displayed in the manners."

"Dr. King, in speaking of the fatality which attended the House of Stewart, says : 'If I were to ascribe their calamities to another cause (than an evil fate), or endeavour to account for them by any natural means, I should think they were chiefly owing to a certain *obstinacy of temper*, which appears to have *been hereditary and inherent* in all the Stewarts except Charles II,"

"Dr. John Mason Good remarks, that 'stupidity like wit, is propagable ; and hence we frequently see it run from one generation to another,.........................' ".

"It is well-known that of all the castes in Hindustan, that of the Brahmins is the highest in intelligence as well as ranks ; and it is mentioned by the missionaries as an ascertained fact, that *their* children are naturally more acute, intelligent, and docile, than the children of the inferior castes, age and other circumstances being equal".

Combe's Constitution of Man, 138.

আধুনিক ব্রাহ্মণগণের হইতে অন্যান্য বর্ণের আহারাদি কার্য্যের, এবং জীবিকার জন্য যে সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় সেই সমুদায়ের পার্থক্য নাই বলিয়া, অন্য বর্ণ হইতে ব্রাহ্মণের উপরিউক্তরূপ বিভিন্নতা ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে সমানভাবে লক্ষিত হয় না, কেবল মান্দ্রাজপ্রদেশে অধিকাংশ এবং অন্যান্য প্রদেশে কতকগুলি ব্রাহ্মণ, যাঁহারা ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করিয়া চলেন, তাঁহাদেরই অন্যান্য বর্ণ হইতে পার্থক্য বুঝিতে পারা যায়। মান্দ্রাজপ্রদেশে ব্রাহ্মণেতর বর্ণের উপরিউক্ত কার্য্যসমূহ ব্রাহ্মণের হইতে অত্যন্ত বিভিন্ন, এই কারণেও তথায় ব্রাহ্মণের পার্থক্য আরও অধিক অনুভব হয়।

এবং গুণ ও দোষ সমস্তই একরূপ হইয়া থাকে (১)। যদি ইহার তারতম্য ঘটে, অর্থাৎ যদি সন্তান পিতার ন্যায় গুণবিশিষ্ট না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, জননী জনক হইতে স্বতন্ত্ররূপ ভাবাপন্না বা ভিন্নগুণাবলম্বিনী হওয়ায়, সন্তান উভয়ের মধ্যবর্ত্তী ত্রিগুণের পরিমাণ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সুতরাং ঐ সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। অনেকে বোধ হয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, পুরুষ এবং স্ত্রী যদি উভয়েই দাতা হয়, তাহা হইলে সন্তানও দাতা হইয়া থাকে, কিন্তু একজন যদি অত্যন্ত কৃপণ হয়, তাহা হইলে সন্তান ইহাদের মধ্যবর্ত্তী হয়, অর্থাৎ দানশীলও হয় না, অথবা অত্যন্ত কৃপণও হয় না; সুতরাং ঐ সন্তান পিতামাতার মধ্যে একজন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং অপর হইতে নিকৃষ্ট গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেমন দানশীলতা ও কৃপণতাসম্বন্ধে বলা হইল, সেইরূপ অন্যান্য গুণ বা দোষ সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে এবং বস্তুতঃও তাহাই ঘটিয়া থাকে। কোন বংশ বিশুদ্ধ থাকিলে পুরুষানুক্রমে সন্তানগণও যে তদ্রূপ হইয়া থাকে, তাহার কারণ এই যে, পিতাতে ত্রিগুণ যে পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে, তাহার সহিত মাতার ত্রিগুণের পরিমাণ মিশ্রিত হইয়া, উভয়ের সাদৃশ্য লইয়াই সন্তান জন্মে (২)। যেমন পশুগণের মধ্যে দ্বৈজাতিক সন্তানে

---

(১) "Dr. James Gregory also, in treating of the temperaments, in his *Conspectus Medicinæ Theoreticæ*, Chap. I, Sect. 16, says : 'Parents frequently live again in their offspring. It is certain that children resemble their parents, not only in countenance and the form of their body, but also in their mental dispositions, in their virtues and vices,..................,"

Combe's 'Constitution of Man,' 138.

(২) "In many families the qualities of both father and mother are seen blended in the children. 'In my own case' says, a medical

পিতার সহিতই অধিকতর সাদৃশ্য লক্ষিত হয়, মনুষ্য সম্বন্ধেও তাহাই হইয়া থাকে (১)। একই পিতামাতার সন্তানগণের মধ্যেও অনেক স্থলে কিয়ৎপরিমাণে পার্থক্য লক্ষিত হইতে পারে, তাহার কারণ এই যে, সকল ব্যক্তিতেই ক্রমাগত ত্রিগুণের ক্ষণিক পরিবর্তন হইতে থাকে, সুতরাং সন্তান জন্মিবার সময়ে, অর্থাৎ গর্ভসঞ্চারকালে, পিতামাতার যে গুণের প্রবলতা বা ন্যূনতা থাকে, অর্থাৎ তাহাদের তৎকালে যে প্রকার শারীরিক ও মানসিক ভাব প্রভৃতি থাকে, তাহাই লইয়া সন্তান জন্মগ্রহণ করে, এই জন্যই পৃথক্ পৃথক্ সময়ে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবাপন্ন হইয়া এক একটি সন্তান জন্মে, সুতরাং একই পিতামাতার সন্তানগণের মধ্যেও পার্থক্য লক্ষিত হয় (২)। কখন কখন দেখিতে পাওয়া যায় যে, জনকজননী অপেক্ষা কোন কোন সন্তান উৎকৃষ্ট অথবা নিকৃষ্ট গুণাবলম্বী হইয়া থাকে. ইহারও কারণ উহাই, অর্থাৎ যে সময়ে ঐ

---

friend, 'I can trace a very marked combination of the qualities of both parents.'"

Combe's 'Constitution of Man', 139.

(১) स्त्रीष्वनन्तरजातासु द्विजैरुत्पादितान् सुतान्।
सदृशानेव तानाहुर्मातृदोषविगर्हितान्॥ मनु, १०।६

দ্বিজবর্ণত্রয়কর্তৃক (অনুলোমক্রমে) অনন্তরবর্ণজা পত্নীর গর্ভসম্ভূত সন্তানগণ মাতার হীনজাতীয়তাপ্রযুক্ত পিতৃজাতি প্রাপ্ত না হইয়া তৎসদৃশজাতি হইয়া থাকে।

(২) "The theory of the transmission of temporary mental and bodily qualities is supported by numerous facts tending to show that the state of the parents, particularly of the mother, *at the time when the existence of the child commences, has a strong influence on its talents, dispositions and health,*

Combe's 'Constitution of Man', 148.

সন্তান উৎপাদিত হইয়াছে, সেই সময়ে তাহার পিতামাতার উভয়েরই ক্ষণিক উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট গুণের প্রবলতা হওয়ায় সেই উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট গুণ লইয়া সন্তান জন্মগ্রহণ করে। এই জন্যই নীচপ্রকৃতি পিতামাতার সন্তান কিয়ৎপরিমাণে দেবভাবাপন্ন এবং দেবদেবীসদৃশ পিতামাতার সন্তানও অনেক সময় আসুরিক ভাবাপন্ন হইতে পারে (১)।

উপরিউক্তরূপ প্রকৃতির নিয়মের উপরে ভিত্তিস্থাপনে, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের আর্য্যগণ প্রত্যেক বংশের ব্যক্তিগণের আকৃতি, প্রবৃত্তি, গুণ, দোষ, আচার, ব্যবহার, ও কার্য্যকলাপ প্রভৃতি দেখিয়া, কোন্‌টিতে সত্বাদি কোন্ গুণের প্রবলতা আছে, তাহা নির্দ্ধারণপূর্ব্বক, কোন্ কোন্ বংশ কোন্ কোন্ বর্ণের অন্তর্গত তাহা নির্দ্দেশকরতঃ, আপনাদিগকে চতুর্ব্বর্ণে বিভক্ত করিয়া, প্রথমতঃ সমাজবদ্ধ হন (২)। ঐ সকল সমাজ পুরুষপরম্পরাক্রমে বর্ণের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিয়া বহুকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছিল, এবং এখনও তাহার কতকটা ছায়া হিন্দুসমাজে বর্ত্তমান আছে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। যদি কেবল এক এক বর্ণের বংশসমূহের মধ্যেই পরস্পর দাম্পত্যসম্বন্ধ সংস্থাপিত হয়, তাহা

---

(১) "On the other hand a person with an excellent moral development, may by some particular occurrence have his animal propensities roused to more than usual vigour, and his moral sentiments thrown for a time into the shade, and any offspring connected with this condition would prove inferior to himself in the development of moral organs."

Combe's 'Constitution of Man', 151.

(২) ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সমাজ সেই সেই নামে অভিহিত হইয়া চলিয়া আসিয়াছিল এবং প্রত্যেক বর্ণও সেই সেই স্থানের পরিচয়ে পরিচিত হইত। এখনও তাহার কতকটা নিদর্শন বর্ত্তমান আছে, যেমন, সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, মৈথিল, উৎকল ইত্যাদি।

হইলে যে সকল বংশ যে যে বর্ণের অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই সমস্ত বংশ সেই সেই বর্ণের অন্তর্গতই থাকিয়া যায়, এবং বর্ণসমূহও বিশুদ্ধ থাকে ; কিন্তু যদি এক বর্ণের ব্যক্তির সহিত অন্য কোন বর্ণীয় ব্যক্তির সংমিশ্রণ ঘটে, তাহা হইলে জাত সন্তান ঠিক পিতা বা মাতার ন্যায় হয় না, পরন্তু কিয়ৎ পরিমাণে উভয়ের সাদৃশ্য লইয়াই জন্মগ্রহণ করে। সে যদিও সঙ্করবর্ণরূপে জন্মে, কিন্তু তাহাকে ঐ চারিবর্ণের মধ্যে এক বর্ণের অন্তর্ভুক্ত করিতে হয়, কারণ এক একটি বর্ণের অন্তর্গত অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রেণী বা জাতি থাকিলেও ঐ চারিবর্ণ ব্যতীত পঞ্চমবর্ণ হইতে পারে না, এতৎসম্বন্ধে পূর্ব্বে বিশেষরূপে বলা গিয়াছে। আর্য্যগণের প্রত্যেক সমাজ পূর্ব্বোক্তরূপে পৃথক্ পৃথক্ সময়ে চতুর্ব্বর্ণে বিভক্ত হওয়ার পরে, তদন্তর্গত কোন কোন বংশের বা কোন কোন ব্যক্তির উৎকর্ষ বা অপকর্ষ হইয়া থাকিলে, সেই সমস্ত বিবেচনাপূর্ব্বক সেই সকলকে উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট বর্ণভুক্ত করিয়া, মধ্যে মধ্যে ঐ সকল সমাজ সত্ত্বগুণাবলম্বী স্বার্থশূন্য মহাপুরুষগণকর্ত্তৃক রাজার সাহায্যে সংস্কৃত হইয়াছে এবং কোন সমাজে আচার ব্যবহারের কোন প্রকার দোষ থাকিলেও তাহা তাঁহাদের কর্ত্তৃক সংশোধিত হইয়াছে। এই প্রকার সংস্কারকেই প্রকৃত সমাজসংস্কার বলিতে পারা যায়।

— —

নানা প্রকারে মনুষ্যগণের শ্রেণীবিভাগ।

সকল দেশে সকল সময়েই মনুষ্যগণ নানা প্রকারে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। পৃথক্ পৃথক্ দেশের নামানুযায়ী মনুষ্যগণ বিভিন্ন বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়, যেমন ভারতবাসী, ইংরেজ, ফরাসী, রোমীয়, গ্রীক ইত্যাদি। ভারত ব্যতীত অন্য কোন দেশবাসীর পরিচয়ের জন্য আর্য্যগণ কর্ত্তৃকও পুরাকালে তত্তদ্দেশের অধিবাসিগণ সেই সেই দেশের নামানুযায়ী অভিহিত হইত, যথা, চীন, পারসীক, বাহ্লীক, কাম্বোজ, রোমক ইত্যাদি। ভারতের মধ্যেও আবার পৃথক্ পৃথক্ প্রদেশের নামানুযায়ী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সমাজের নাম নির্দ্দিষ্ট ছিল, যথা, পাঞ্চাল, মাগধ, মৈথিল, দ্রাবিড়, গোড়ীয়, ঔড্র, পৌণ্ড্র, কৈকয় ইত্যাদি; এখনও আমরা দেশানুসারে ভাবতবাসিগণের বিভাগ নির্দ্দিষ্ট করিয়া থাকি, যেমন, বাঙ্গালী, বিহারী, মৈথিল, উড়িয়া, মহারাষ্ট্রীয়, মান্দ্রাজী ইত্যাদি। চরম লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেশে পৃথক্ পৃথক্ রূপ পন্থা বা ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়া আসিয়াছে, যেমন, আর্য্য, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, মুসলমান্ ইত্যাদি। যে ব্যক্তি যে পথ অবলম্বন করিয়াছে, অর্থাৎ উপরিউক্ত যে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছে, সে আপনাদিগকে একটি ও অপর সকলকে আর একটি এই দুইটি প্রধান শ্রেণীতে মনুষ্যগণকে বিভাগ করিয়াছে, যেমন, আর্য্যগণ কর্ত্তৃক আর্য্য ও অনার্য্য বা ম্লেচ্ছ, খ্রীষ্টানগণ কর্ত্তৃক খ্রীষ্টান ও অখ্রীষ্টান (Pagan) এবং মুসলমানগণ কর্ত্তৃক মুসলমান ও কাফের ইত্যাদিরূপে মনুষ্যগণ বিভক্ত হইয়াছে। ঐ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় হইয়াছে, যেমন আর্য্যগণের বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, সৌর ও গাণপত্য ইত্যাদি, বৌদ্ধগণের মহায়ন ও হীনায়ন

ইত্যাদি, খ্রীষ্টানগণের রোমান ক্যাথলিক (Roman Catholic) প্রটেষ্ট্যাণ্ট (Protestant) ইত্যাদি, মুসলমানগণের শিয়া, স্বন্নি ইত্যাদি। কেহ কেহ পৃথক্ পৃথক্ দেশের লোকের শরীরের রং, যথা, শ্বেত, কৃষ্ণ, তাম্র, পীত ইত্যাদি, নাসিকার উচ্চতার তারতম্য, মুখের আকৃতি, যেমন, লম্বা, গোল ইত্যাদি, এই প্রকার নানারকমের অঙ্গপ্রত্যঙ্গানুযায়ী পৃথিবীস্থ ব্যক্তিগণকে বিভাগ করিয়াছেন ; যেমন, ককেসিয়ান্, মোঙ্গোলিয়ান্, সেমেটিক, নিগ্রো ইত্যাদি। কোন কোন দেশের অধিবাসিগণ কর্ম্মানুযায়ী, বা ধনের তারতম্যানুযায়ী, অথবা অন্য কোন প্রকারে পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে, যেমন, ইংলণ্ডে ধর্ম্মযাজক , জমীদার, বণিক্, দোকানদার. খনিপরিচালক, শিল্পজীবী, কৃষিজীবী, দৈনিক শ্রমজীবী ইত্যাদি।

আর্য্যগণ উপরিউক্তরূপ কোন প্রকার বাহ্য উপায়ে প্রকৃত শ্রেণীবিভাগ করেন নাই, তাঁহারা সকল বিষয়েই অভ্যন্তর পর্য্যন্ত পরিদর্শন করিতেন, বাহির দেখিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না। তাঁহাদের বিভাগ শরীরের বর্ণের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, নাক, মুখ. চোখ, কাণ, হনু, ওষ্ঠ. লোম প্রভৃতি দেখিয়া তাঁহারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শ্রেণী নিরূপণ করেন নাই, কিংবা ব্যবসাকর্ম্ম, ধনের পরিমাণ ইত্যাদি বহিঃস্থিত পরিবর্ত্তনশীল শিথিল ভিত্তির উপরে স্থাপন করিয়াও বিশাল বিভাগকার্য্য সম্পাদন করেন নাই ; তাঁহারা লোকচরিত্রের অন্তস্তল পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিতেন, মানসিক ভাবের দিকে দৃষ্টি রাখিতেন। তাঁহারা ত্রিগুণের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপ তারতম্যানুযায়ী মনুষ্যগণের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছিলেন। ত্রিগুণের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপ পরিমাণানুযায়ী সদ্‌গুণ ও দোষাদির ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণে সদ্‌গুণসমূহের পরিমাণ অধিক এবং দোষের পরিমাণ কম হয়, তমোগুণে সদ্‌গুণসমূহ অল্প এবং দোষ বেশী হয়। কোন্ গুণে কি প্রকার সদ্‌গুণ বা দোষ অধিক হয়, তাহা

ত্রিগুণসম্বন্ধে বিচারকালে বিশেষরূপে বলা হইয়াছে। ঐ প্রকার দোষ, গুণ, শারীরিক ও মানসিক ভাব, এবং প্রবৃত্তি ইত্যাদির বিচার করিয়া কোন্ ব্যক্তিতে ত্রিগুণের কি পরিমাণ বিদ্যমান আছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। ত্রিগুণের নানা প্রকার পরিমাণ লইয়াই মনুষ্যগণ জন্মগ্রহণ করে, অর্থাৎ কেহ সত্ত্বগুণাধিকের বা ব্রাহ্মণের, কেহ সত্ত্বরজোগুণাধিকের বা ক্ষত্রিয়ের, কেহ রজস্তমোগুণাধিকের বা বৈশ্যের এবং কেহ বা তমোগুণাধিকের বা শূদ্রের গুণ লইয়া জন্মগ্রহণ করে, এবং তদনুযায়ীই আর্য্যদের এক একটি সমাজের ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণে প্রধানতঃ প্রথমে বিভক্ত হইয়া শ্রেণীবদ্ধ হয়; তৎপরে ব্রাহ্মণব্রাহ্মণীর সন্তান ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ক্ষত্রিয়ার সন্তান ক্ষত্রিয়, বৈশ্যবৈশ্যার সন্তান বৈশ্য এবং শূদ্রশূদ্রার সন্তান শূদ্র হইয়া জন্মলাভ করায়, উহাদের বংশসমূহ ক্রমান্বয়ে ঐরূপে চলিয়া আসায়, ব্রাহ্মণাদি বর্ণরূপে পরিগণিত হইয়া আসিয়াছিল, এবং এখনও পর্য্যন্ত আর্য্য বংশসমূহ ঐ প্রকার ধারাবাহিকরূপে কতকটা চলিয়া আসিয়াছে। কেহ উপরিউক্ত কোন বংশে জন্মিয়াও কোন কারণবশতঃ ভ্রষ্ট হইলে, অর্থাৎ সেই বর্ণের গুণযুক্ত না হইলে, কিংবা সেই জন্য কোন প্রকার নিকৃষ্ট কার্য্য করিলে, পূর্ব্বে সে নীচবর্ণভুক্ত হইত, এবং কেহ নিকৃষ্টবর্ণে জন্মিয়া উৎকৃষ্ট বর্ণের গুণযুক্ত হইলে ও তদনুযায়ী ক্রমাগত উৎকৃষ্ট কার্য্য করিলে, উৎকৃষ্ট বর্ণরূপে পরিগণিত হইত (১)। এই প্রকারে মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত হইয়া এবং ধারাবাহিকরূপে চলিয়া আসিয়া ঐ সমস্ত সমাজ পূর্ব্বে বিশুদ্ধ থাকিত, কিন্তু এক্ষণে ঐ সম্বন্ধে রাজশাসন সম্ভবপর নহে বলিয়া এবং সত্ত্বগুণাবলম্বী মহাপুরুষগণ সমাজের নেতা না থাকায়, ঐ প্রকার সংস্কার ও বিশুদ্ধি এক প্রকার অসম্ভব হইয়া

---

(১) মহাভারতে এবং অন্যান্য পুরাণাদিতে এ সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

উঠিয়াছে। নিজের স্বার্থ ভুলিয়া সমাজের হিতচিন্তায় যাঁহারা সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিতেন, সেই সকল সত্বগুণাবলম্বী সাধুপুরুষগণই রাজার সাহায্যে পূর্ব্বে সমাজস্থ ব্যক্তিগণের বর্ণবিভাগ এবং মধ্যে মধ্যে সমাজের সংস্কার ও বিশুদ্ধি সাধন করিতেন। যাহারা তমোগুণে অভিভূত, স্বার্থে অন্ধ, কাম ক্রোধ লোভাদি রিপুগণ কর্তৃক সদাই উদ্বেজিত, ধনমানাদি লাভই যাহাদের চরম উদ্দেশ্য, সুতরাং এই সকলের লালসায় সদাই ব্যতিব্যস্ত, মনুষ্যের হিতচিন্তায় ও সমাজের মঙ্গলের জন্য উৎসুক বলিয়া ভাণ করিলেও স্বকীয় শরীর এবং দারা-পুত্রাদির বাহিরে যাহাদের চিন্তা যাইতে পারে না, তাহারা সমাজের নেতা বা সংস্কারক হইতে পারে না, হইলে সেই সমাজে নানা প্রকার বিভ্রাট উপস্থিত হইয়া থাকে।

যদিও আর্য্য সমাজসমূহে পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণীর ব্যক্তিগণ পুরুষানু-ক্রমে জীবিকার জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কর্ম্ম পূর্ব্বে অবলম্বন করিত এবং এখনও অনেকেই করিয়া থাকে, কিন্তু এইরূপ কর্ম্মানুযায়ী আর্য্যগণের বর্ণবিভাগ হয় নাই, গুণানুযায়ী বর্ণবিভাগ এবং তদনুযায়ীই কর্ম্মবিভাগ হইয়াছে (১)। অর্থাৎ কোন বিশেষ গুণের প্রবলতাবশতঃ সে সেই গুণের উপযোগী কার্য্য করিতে সক্ষম হয় এবং তাহার প্রবৃত্তি বা রুচি হয়, সুতরাং সেই গুণাবলম্বীর বা সেই বর্ণের ঐ সকল কার্য্যই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এইরূপেই প্রত্যেক বর্ণের ও তদন্তর্গত জাতিসমূহের কর্ত্তব্য কার্য্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। মানুষের আকৃতি, শারীরিক ও মানসিক ভাব, প্রকৃতি, প্রবৃত্তি ও কার্য্যাদি দেখিয়াই সে কোন্ গুণাবলম্বী তাহা বুঝিতে পারা যায়, সুতরাং যখনই কোন আর্য্য সমাজে প্রথম শ্রেণীবিভাগ হইয়াছে, তখনই প্রত্যেক বংশ কোন্

---

(১) চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ। গীতা, ৪।১৩।

গুণাবলম্বী তাহার পরীক্ষার জন্য ঐ বংশের ব্যক্তিগণের প্রকৃতি, প্রবৃত্তি প্রভৃতির সঙ্গে তাহার কার্য্যও পর্য্যবেক্ষণ করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। যেমন, কেহ সত্ত্বগুণাবলম্বী কিনা তাহা জানিবার জন্য দেখিতে হইবে যে, দয়া, সত্যবাদিতা, ক্ষমাশীলতা, জিতেন্দ্রিয়তা, সরলতা, দানশীলতা, স্বার্থশূন্যতা প্রভৃতি সদ্‌গুণশ্রেণী তাহাতে বর্ত্তমান আছে কি না, কিন্তু তাহার কর্ম্ম না দেখিলে সে এই সকল সদ্‌গুণভূষিত কি না তাহাও স্থির করিতে পারা যায় না, সুতরাং কর্ম্মের দ্বারাই তাহাকে পরীক্ষা করিতে হইবে। এইরূপে কে কোন্ গুণাবলম্বী তাহা নির্দ্ধারণ করিতে তাহার কর্ম্ম দেখিবারই প্রয়োজন এবং এই অর্থেই বলিতে পারা যায় যে, কর্ম্মানুযায়ীই বর্ণ ও তদন্তর্গত শ্রেণী বা জাতি বিভাগ হইয়াছে; কেহ জীবিকার জন্য কোন উপায় বা ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছে বলিয়াই যে, সে তদনুযায়ীই কোন নির্দ্দিষ্ট বর্ণের অন্তর্গত হইয়াছে, অথবা এই প্রকারে বর্ণবিভাগ হইয়াছে, তাহা নহে। কেহ সত্ত্বাদি কোন গুণাবলম্বী বলিয়াই জীবিকানির্ব্বাহের জন্য সত্ত্বগুণানুযায়ীই কার্য্য করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইয়াছে, এবং তাহাতেই সে উৎকর্ষ সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছে, এবং তাহার সন্তানসন্ততিগণও পিতার ত্রিগুণের পরিমাণ প্রাপ্ত হওয়ায় তাহাদেরও স্বভাবতঃ ঐ পিতৃকার্য্য করিতে প্রবৃত্তি হইয়াছে, ও তাহাই করিতে তাহারা সমর্থ হইয়া থাকে। এইরূপে ঐ বংশের, এবং উহার সদৃশ গুণাবলম্বী আরও অনেকগুলি বংশ লইয়া যে এক একটি জাতি হইয়াছে তাহাদের, জীবিকানির্ব্বাহের জন্য ঐ প্রকার কর্ম্মই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, আবার এই জাতির সদৃশ অন্যান্য যে সকল জাতি আছে, তাহারাও জীবিকানির্ব্বাহের জন্য ঠিক এই রকমের কার্য্য না করুক, ইহার অনুরূপ কার্য্যেই স্বভাবতঃ প্রবৃত্ত হয়; সুতরাং ঐ সমুদায় জাতি যে বৃহৎ শ্রেণী বা বর্ণের অন্তর্গত,

সেই বর্ণীয় ব্যক্তিগণেরও ঐ সমস্ত কার্য্যই জীবিকানির্ব্বাহের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

অনেকে দেখিয়া থাকিবেন যে, পিতার কোন কার্য্যে বিশেষ দক্ষতা ও নিপুণতা থাকিলে সন্তানও স্বভাবতঃ তাহাই পাইয়া থাকে। যেমন, কোন এক শিল্পীর পুত্রকে এবং একজন বুদ্ধিমান্ ও বিদ্বান্ ব্রাহ্মণপণ্ডিতের পুত্রকে যদি জন্মের পরেই পিতামাতার নিকট হইতে লইয়া গিয়া অন্য কোন ব্যক্তির নিকট রাখা যায় এবং তাহার কয়েক বৎসর পরে যদি সেই দুই বালকের সম্মুখে কেহ উপরিউক্ত শিল্পীর শিল্পকার্য্য করে এবং অপর কেহ বিদ্যাভ্যাস ও শাস্ত্রালোচনা করে, তাহা হইলে ঐ শিল্পীর পুত্রের মন ঐ শিল্পকার্য্যের দিকে এবং ব্রাহ্মণ-পুত্রের মন অপরের দিকে স্বভাবতঃই আকৃষ্ট হইয়া থাকে, এবং তাহারা প্রত্যেকে ঐ ঐ কার্য্য করিতে ভালবাসে ও সেই সেই কার্য্যেই তাহাদের প্রত্যেকের দক্ষতা ও নিপুণতা জন্মে; ইহাদের একজন অপরের রোচক কার্য্য করিতে তৃপ্তিবোধ করে না, এবং উহা করিতে বাধ্য হইলে অতিকষ্টে এবং দীর্ঘকালে ও অতি বিশৃঙ্খলভাবে সে ঐ কার্য্য সমাধা করিয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে, ত্রিগুণের যে প্রকার সংমিশ্রণবশতঃ প্রত্যেকের পিতার ঐ ঐ কার্য্যে প্রবৃত্তি ও নিপুণতা হইয়াছিল, সেই সেই প্রকার গুণসংমিশ্রণ লইয়া, পুত্রের জন্ম হওয়ায়, স্বভাবতঃই তাহার পিতৃকার্য্যে প্রবৃত্তি এবং দক্ষতা ও নিপুণতা জন্মিয়াছে। এক জনের কার্য্য অপরকে কিয়ৎকাল করিতে বাধ্য করিলে, তাহার প্রবৃত্তির ও তৎসঙ্গে ইহার অনুযায়ী গুণেরও ক্রমে ক্রমে অতি অল্প পরিমাণে পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। এই প্রকারে তাহার গুণ উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট হইতে পারে, এবং এইরূপে সে উচ্চ বা নীচবর্ণের উপযোগী হয়। কাহারও উপরিউক্তরূপে গুণের অধিক পরিমাণে পরিবর্ত্তন হইলে, সেই সময়ে তাহার যে সন্তান জন্মে,

সে পিতার ঐরূপ পরিবর্ত্তিত গুণ লইয়া জন্মগ্রহণ করে বলিয়াই, ঐ পরিবর্ত্তিত গুণের উপযোগী কার্য্যেই তাহার প্রবৃত্তি ও নিপুণতা স্বভাবতঃই হইয়া থাকে। উপরে যে পরিবর্ত্তনের কথা বলা হইল, অযথা বলপ্রয়োগে যদি কাহারও প্রবৃত্তির এই প্রকারে সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে পরিবর্ত্তন করিয়া উৎকর্ষ সাধন করিবার চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে তাহার অধিক সময় নষ্ট ও অনিষ্টও হইয়া থাকে, এতৎসম্বন্ধে পরে বিশেষরূপে বলা যাইবে।

জন্মের দ্বারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণ নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বিশেষরূপে বলিয়াছি, তাহার স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে লোকসংঘ বা সমাজস্থ ব্যক্তিগণ প্রত্যেকে ব্রাহ্মণাদি এক একটি বর্ণের গুণ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তদনন্তর আর্য্যগণের মধ্যে এক এক প্রকারের গুণাবলম্বী মনুষ্যগণ ব্রাহ্মণাদি বিশেষ বিশেষ বর্ণে বা শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে; তৎপরে জন্মের দ্বারা, প্রত্যেক বর্ণের স্ত্রী-পুরুষের সন্তান সেই সেই পিতামাতার সদৃশ গুণ লইয়া জন্ম গ্রহণ করায় সেই বর্ণের হইয়াছে, এইরূপে ক্রমাগত সন্তান জন্মগ্রহণ করায় আর্য্যগণের মধ্যে ধারাবাহিকরূপে চতুর্ব্বর্ণ চলিয়া আসিয়াছিল, এবং মধ্যে মধ্যে ঐ সমাজ সংস্কৃত হইয়াছিল। ত্রিগুণের সমতাবশতঃ পিতার কার্য্যে পুত্রের স্বভাবতঃ প্রবৃত্তি ও দক্ষতা হয়, সুতরাং আর্যদিগের প্রত্যেক বর্ণের ব্যক্তিগণ বংশপরম্পরাক্রমে জীবিকার জন্য প্রায় সমানরূপ কর্ম্মই অবলম্বন করিত। অধুনা এই প্রকার শ্রেণীবিভাগ ও প্রত্যেক শ্রেণীর নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্বন্ধে বিশৃঙ্খলতা ঘটিয়াছে।

মনুষ্যমাত্রই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণে বিভক্ত; যে কোন ব্যক্তিই হউক ইহার মধ্যে একটি না একটি বর্ণের অন্তর্গত। সকল দেশেই সকল সমাজেই সকল বর্ণের ব্যক্তিই থাকিতে পারে। আর্য্যগণব্যতীত অন্যের মধ্যে ব্রাহ্মণবর্ণের ব্যক্তি যে থাকিতে পারে

না তাহা নহে। অন্য দেশে, অন্য সমাজে, বা অন্য ধর্ম্মাবলম্বীগণের মধ্যে এমন অনেক সত্ত্বগুণাবলম্বী অর্থাৎ ব্রাহ্মণোচিতগুণবিশিষ্ট ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহাদিগকে দেখিলে স্বভাবতঃই যেন মস্তক ভক্তিভাবে অবনত হইয়া আইসে, কিন্তু তাঁহারা অনেকেই বিশুদ্ধভাবে ঐ বর্ণধর্ম্ম রক্ষা করিয়া প্রকৃত উৎকর্ষের দিকে ধাবিত হন না; সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিকারক কার্য্য ইন্দ্রিয়গণদ্বারা না করায় ও অন্যান্য নানাকারণে, শ্রেষ্ঠবর্ণের বিশুদ্ধতা রক্ষিত হয় না, এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের সমাজে সবর্ণবিবাহের বন্ধন না থাকায় অনেকেরই নিকৃষ্ট গুণাবলম্বিনীর অর্থাৎ নীচবর্ণার সহিত সম্মিলন হওয়ায় অপকর্ষ সাধিত হইয়া থাকে, এবং ঐ বিবাহোৎপন্ন সন্তানও সঙ্করবর্ণ হইয়া নিকৃষ্ট গুণাধিক হয়। এই সকল কারণবশতঃ ঐ সমস্ত সমাজে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণাদি বর্ণ থাকিতে পারে না, এই প্রকারে ঐ সমুদায় সমাজ সঙ্কর-বর্ণ দ্বারা পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে এবং ক্রমাগতই ঐ রূপ হইয়া চলিতেছে।

যতদিন পর্য্যন্ত বিশুদ্ধা ভক্তির বা তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইয়া কাহারও ভেদাভেদবোধ লোপ না হয়, যতদিন কেহ জীবন্মুক্ত না হয়, ততদিন তাহার পক্ষে বর্ণাশ্রমবিভাগানুযায়ী চলা, বর্ণাশ্রমধর্ম্মানুযায়ী কার্য্য করা, সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য, ইহাই আর্য্যশাস্ত্রের ব্যবস্থা। সেই শাস্ত্র দ্বারা যাহারা শাসিত তাহারাই আর্য্য এবং সেই ধর্ম্মই আর্য্যধর্ম্ম। যে সকল সমাজে বর্ণবিভাগ নাই, যাহার সমুদায়ই সঙ্করবর্ণ দ্বারা পূর্ণ, সেই সমস্ত সমাজই অনার্য্য। বর্ণবিভাগসম্বন্ধে সবিশেষ বলা হইয়াছে, আশ্রমবিভাগ এবং কোন্ বর্ণের কি কি কর্ত্তব্য কার্য্য তৎসম্বন্ধে পরে লিখিত হইবে।

দৈবী ও আসুরী প্রকৃতি।

মানুষের দৈবী ও আসুরী এই দুই প্রকার সম্পদ্ বা প্রকৃতি আছে (১)। ভয়শূন্যতা, চিত্তের প্রসন্নতা, আত্মজ্ঞানের উপায়ে নিষ্ঠা, দান, ইন্দ্রিয়সংযম, আত্মধ্যান, যজ্ঞ ও তপস্যায় প্রবৃত্তি, সরলতা, অহিংসা অর্থাৎ পরপীড়াবর্জ্জন, সত্য, অক্রোধ, স্বার্থত্যাগ, শান্তি, খলতাশূন্যতা, সর্ব্বভূতে দয়া, লোভশূন্যতা, মৃদুতা, অকার্য্যপ্রবৃত্তিতে লজ্জা, অচপলতা অর্থাৎ বিনাপ্রয়োজনে বাহ্যেন্দ্রিয়াদির ব্যাপারশূন্যতা, মানসিক তেজ, ক্ষমা অর্থাৎ তিরস্কৃত হইয়া সামর্থ্যসত্বেও ক্রোধ না করা, ধৈর্য্য অর্থাৎ দুঃখাদির দ্বারা অবসাদে চিত্তের স্থিরীকরণ, বাহ্যাভ্যান্তরশুদ্ধি এবং পূজ্য বা প্রধান বলিয়া অভিমানের অভাব, এই সমস্ত গুণ দৈবী প্রকৃতি-যুক্ত বা দৈবভাবাপন্ন ব্যক্তির হইয়া থাকে ; সত্ত্বগুণাধিক্য হইলে এইরূপ প্রকৃতি হয়। ধার্ম্মিকতাপ্রকাশার্থ ধর্ম্মের আড়ম্বর, ধন, মান, বিদ্যা, বুদ্ধি, রূপ, গুণ ইত্যাদিতে সকলের শ্রেষ্ঠ এই ভাবনাদ্বারা চিত্তের গর্ব্ব, নিজের অতি পূজ্যত্বাভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা এবং অবিবেক, এই সমস্ত আসুরীপ্রকৃতিযুক্ত ব্যক্তিরই হইয়া থাকে ; রজঃ ও তমোগুণের আধিক্য হইতে এই প্রকার প্রকৃতি জন্মে।

আসুরভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ বলে যে, জগতে বা জগতের মূলে কোন সত্য সত্তার অস্তিত্ব নাই, ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ প্রতিষ্ঠা, যাহা এই জগৎব্যবস্থার হেতু, তাহাও কিছুই নাই, এবং এই জগৎ ঈশ্বরশূন্য, ও কেবলমাত্র নিকৃষ্ট কাম হইতেই ইহার উৎপত্তি, জীবের পূর্ব্বজন্ম বা পরজন্ম ইহা কেবল একটা কথার কথা, এবং ইহ জীবনেই এই রক্তমাংসময় শরীরের সঙ্গে ইহার উৎপত্তি ও অবসান। এই দেহের বাহিরে তাহাদের চিন্তাশক্তি যাইতে পারে না। এই সকল অল্পবুদ্ধি লোক এইরূপ

---

(১) গীতা ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

বুদ্ধিবশতঃ মলিনচিত্ত, উগ্রকর্ম্মা এবং অহিতকারী হইয়া জগতের ক্ষয়ের জন্য উদ্ভূত হয়।

তাহারা মরণকাল পর্য্যন্ত অপরিমিত চিন্তা আশ্রয়পূর্ব্বক কামনা-ভোগপরায়ণ হইয়া এবং এই কামনাভোগই পরমপুরুষার্থ এইরূপে কৃতনিশ্চয় হইয়া, এবং এই অট্টালিকার পরে আরও অট্টালিকা, এই উদ্যান হইয়া গেলে আরও উদ্যান নির্ম্মাণ করিব, স্ত্রীপুত্রাদিকে সুখী করিব, এই প্রকারের শত শত আশারূপ পাশ দ্বারা বদ্ধ ও তাহাদের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ও কামক্রোধপরায়ণ হইয়া, কামনাভোগের জন্য অন্যায়পূর্ব্বক অর্থ সঞ্চয় করিতে ইচ্ছা করে এবং লোভের অধীন হইয়া হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া থাকে। একটি কামনা যাইতে না যাইতে, একটি চিন্তার অবসান হইতে না হইতে, অসংখ্য অসংখ্য কামনা ও চিন্তা তাহাদের মনে উদিত হয়।

তাহাদের ধনাকাঙ্খা যেন নিবৃত্ত হইবার নহে, কেবল ধনতৃষ্ণাতেই জীবন অতিবাহিত করে; কত ধন পাইলাম, কত পাইব, আরও কি প্রকারে আসিবে, কেবল দিবারাত্রি এই প্রকার চিন্তা আসিয়া তাহাকে সুস্থির হইতে দেয় না, নিদ্রার অবস্থাতেও যেন বিরাম নাই, স্বপ্নেতেও উহাই ভাবিতেছে। তাহাদের আত্মগরিমার প্রসারেরও ইয়ত্তা নাই। তাহারা কেবল যে নিজকেই ধার্ম্মিক, বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, রূপবান্, গুণবান্, ধনবান্ ইত্যাদি মনে করে তাহা নহে, তাহারা ভাবে যে, আমার বলিবার তাহাদের যে কেহ বা যাহা কিছু আছে সকলই ভাল। তাহারা অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধ অবলম্বন করিয়া সকলের পীড়াদায়ক হয় এবং সকলেরই গুণে দোষারোপ করিয়া থাকে।

প্রত্যেক মনুষ্যে দৈবী ও আসুরী এই দুইটি প্রকৃতিতে পরস্পর ক্রমাগত যেন যুদ্ধ চলিতেছে, কখন একটি অপরটিকে পরাজয়

করিতেছে, আবার কখন বা পরাজিত হইতেছে, এই প্রকার জয়পরাজয় ক্রমাগতই হইতেছে। দৈবীপ্রকৃতি সত্বগুণবহুল, অপরটি রজঃ ও তমোগুণবহুল। মানুষের প্রথমাবস্থায়, অর্থাৎ উৎকর্ষ লাভ করিয়া যখন জীব পশুযোনি হইতে প্রথম মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হয়,তখন তমোগুণ অত্যন্ত প্রবল থাকে ও সত্বগুণের ক্ষীণ স্ফূরণ হয়, আসুরভাব তখন দৈবভাবের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকে; এই জন্যই দৈবভাব প্রথম প্রথম বড়ই নিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তৎকালে যদি কখনও দৈবভাবের ঈষৎ বিকাশ হয়, অমনই তখনই আসুরভাবের উদয় হইয়া সেই দৈবভাবকে দমন করে। এই প্রকার আসুরিক ভাব লইয়া জন্মজন্মান্তর লাভ করিতে করিতে ক্রমোৎকর্ষবশে মানুষ যখন সত্বগুণাধিক হয়, তখনই আসুরী প্রকৃতির উপর দৈবীপ্রকৃতির প্রাধান্য ঘটে। এই অবস্থায় যদি কখন একটু আসুরভাবের সামান্য স্ফূরণ হয়, তখনই দৈবভাব ইহাকে দমন করে, ইহাকে যেন পদদলিত করিয়া রাখে, আর যেন মাথা তুলিতে দেয় না। মনুষ্য-জন্মের মধ্যে এই জন্মই শেষ জন্ম, ইহাই অত্যুৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ জন্ম। এই প্রকার দৈবাসুরযুদ্ধ মনুষ্যজীবনে ক্রমাগতই চলিতেছে।

আসুরভাবাপন্ন ব্যক্তি পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া ক্রমাগত গতাগতি-দ্বারা দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিতে থাকে, এবং মুক্তি তাহার বহুদূরে থাকে। এই ভাব দমিত হইয়া যখন দৈবভাবের প্রাধান্য হয়, তখন ঐ জীব ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া উৎকৃষ্টতম জন্ম লাভ করিয়া অবশেষে মোহমায়ারূপ বন্ধনদশা হইতে মুক্ত ও পরম শান্তিময় মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

পুরুষার্থ।

শাস্ত্রানুসারে পুরুষার্থ চারি প্রকার,– কাম, অর্থ, ধর্ম্ম ও মোক্ষ। তমোগুণের লক্ষণ কামপ্রধানতা, রজোগুণের অর্থনিষ্ঠতা, সত্ত্বগুণের ধর্ম্মপ্রবনতা এবং এই তিন গুণের অতীত হইলেই মোক্ষ। ঐ চারিটি ক্রমান্বয়ে পরপর শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ কাম বা কামনা হইতে অর্থ বা প্রয়োজন, অর্থ হইতে ধর্ম্ম এবং ধর্ম্ম হইতে মোক্ষ শ্রেষ্ঠ। প্রথম দুইটি স্বভাবতঃ প্রবৃত্তির দিকে গিয়া মানুষকে ইহ জগতের সুখদুঃখের দিকে লইয়া যায়, কিন্তু ধর্ম্ম পরকা[illegible] আকাঙ্ক্ষায় এ[illegible] প্রবৃত্তির দিকে গেলেও ক্রমে নিবৃত্তির পথে অগ্রসর হয় এবং কাম ও অর্থকেও ঐ দিকে লইয়া যায়। কাম ও অর্থ মানুষকে ইন্দ্রিয়ের দাস করে, কিন্তু ধর্ম্ম ইন্দ্রিয়গণকে মানুষের দাস করে। এই প্রকারে সে ধর্ম্মের দ্বারা নিবৃত্তিমার্গে গিয়া মোক্ষের অধিকারী হয়। প্রথম তিনটি পুরুষার্থলাভের জন্য যে চেষ্টা তাহা সাধনা, কিন্তু মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য যে চেষ্টা তাহাই মুখ্য সাধনা।

মোক্ষ বা চিরশান্তির জন্য যে কামনা তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, পরজন্মের সুখের জন্য যাহা তাহা উহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট, এবং ঐহিক সুখের জন্য যে কামনা তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। প্রথমটি চিরকালের জন্য শান্তি, দ্বিতীয়টি দীর্ঘকালস্থায়ী, অথচ যাহার অবসান আছে, এই প্রকারের সুখ, এবং শেষেরটি কেবলমাত্র ক্ষণকালের জন্য নশ্বর সুখমাত্র।

পুরুষকার।

সাধারণতঃ অনেকের সংস্কার আছে যে, আর্য্যশাস্ত্র পুরুষকারের উপদেশ দেয় না, সুতরাং ইহার মতে চলিলে মানুষ জড় ও অক

করিতেছে, আবার কখন বা পরাজিত হইতেছে, এই প্রকার জয়পরাজয় ক্রমাগতই হইতেছে। দৈবীপ্রকৃতি সত্বগুণবহুল, অপরটি রজঃ ও তমোগুণবহুল। মানুষের প্রথমাবস্থায়, অর্থাৎ উৎকর্ষ লাভ করিয়া যখন জীব পশুযোনি হইতে প্রথম মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হয়,তখন তমোগুণ অত্যন্ত প্রবল থাকে ও সত্বগুণের ক্ষীণ স্ফূরণ হয়, আসুরভাব তখন দৈবভাবের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকে; এই জন্যই দৈবভাব প্রথম প্রথম বড়ই নিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তৎকালে যদি কখনও দৈবভাবের ঈষৎ বিকাশ হয়, অমনই তখনই আসুরভাবের উদয় হইয়া সেই দৈবভাবকে দমন করে। এই প্রকার আসুরিক ভাব লইয়া জন্মজন্মান্তর লাভ করিতে করিতে ক্রমোৎকর্ষবশে মানুষ যখন সত্বগুণাধিক হয়, তখনই আসুরী প্রকৃতির উপর দৈবীপ্রকৃতির প্রাধান্য ঘটে। এই অবস্থায় যদি কখন একটু আসুরভাবের সামান্য স্ফূরণ হয়, তখনই দৈবভাব ইহাকে দমন করে, ইহাকে যেন পদদলিত করিয়া রাখে, আর যেন মাথা তুলিতে দেয় না। মনুষ্য-জন্মের মধ্যে এই জন্মই শেষ জন্ম, ইহাই অত্যুৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ জন্ম। এই প্রকার দৈবাসুরযুদ্ধ মনুষ্যজীবনে ক্রমাগতই চলিতেছে।

আসুরভাবাপন্ন ব্যক্তি পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া ক্রমাগত গতাগতি-দ্বারা দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিতে থাকে, এবং মুক্তি তাহার বহুদূরে থাকে। এই ভাব দমিত হইয়া যখন দৈবভাবের প্রাধান্য হয়, তখন ঐ জীব ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া উৎকৃষ্টতম জন্ম লাভ করিয়া অবশেষে মোহমায়ারূপ বন্ধনদশা হইতে মুক্ত ও পরম শান্তিময় মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

পুরুষার্থ।

শাস্ত্রানুসারে পুরুষার্থ চারি প্রকার,— কাম, অর্থ, ধর্ম্ম ও মোক্ষ। তমোগুণের লক্ষণ কামপ্রধানতা, রজোগুণের অর্থনিষ্ঠতা, সত্ত্বগুণের ধর্ম্মপ্রবনতা এবং এই তিন গুণের অতীত হইলেই মোক্ষ। ঐ চারিটি ক্রমান্বয়ে পরপর শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ কাম বা কামনা হইতে অর্থ বা প্রয়োজন, অর্থ হইতে ধর্ম্ম এবং ধর্ম্ম হইতে মোক্ষ শ্রেষ্ঠ। প্রথম দুইটি স্বভাবতঃ প্রবৃত্তির দিকে গিয়া মানুষকে ইহ জগতের সুখদুঃখের দিকে লইয়া যায়, কিন্তু ধর্ম্ম পরকালের সুখের আকাঙ্ক্ষায় এবং দুঃখনিবারণের জন্য প্রবৃত্তির দিকে গেলেও ক্রমে নিবৃত্তির পথে অগ্রসর হয় এবং কাম ও অর্থকেও ঐ দিকে লইয়া যায়। কাম ও অর্থ মানুষকে ইন্দ্রিয়ের দাস করে, কিন্তু ধর্ম্ম ইন্দ্রিয়গণকে মানুষের দাস করে। এই প্রকারে সে ধর্ম্মের দ্বারা নিবৃত্তিমার্গে গিয়া মোক্ষের অধিকারী হয়। প্রথম তিনটি পুরুষার্থলাভের জন্য যে চেষ্টা তাহা সাধনা, কিন্তু মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য যে চেষ্টা তাহাই মুখ্য সাধনা।

মোক্ষ বা চিরশান্তির জন্য যে কামনা তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, পরজন্মের সুখের জন্য যাহা তাহা উহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট, এবং ঐহিক সুখের জন্য যে কামনা তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। প্রথমটি চিরকালের জন্য শান্তি, দ্বিতীয়টি দীর্ঘকালস্থায়ী, অথচ যাহার অবসান আছে, এই প্রকারের সুখ, এবং শেষেরটি কেবলমাত্র ক্ষণকালের জন্য নশ্বর সুখমাত্র।

পুরুষকার।

সাধারণতঃ অনেকের সংস্কার আছে যে, আর্য্যশাস্ত্র পুরুষকারের উপদেশ দেয় না, সুতরাং ইহার মতে চলিলে মানুষ জড় ও অক[illegible]

হইয়া থাকে। বস্তুতঃ তাহা নহে, ইহাতে জড়কে ক্রিয়াশীল করে, অর্থাৎ পশুভাবাপন্ন তমোগুণাধিক মনুষ্যকে প্রকৃত মনুষ্য করে; আবার অত্যন্ত ক্রিয়াশীল, চঞ্চল, অস্থির, রজোগুণাধিক ব্যক্তিকে ক্রিয়াসংযমী, নিশ্চল ও স্থির করে, অর্থাৎ মনুষ্যভাবাপন্ন ব্যক্তিকে ক্রমে ক্রমে সত্ত্বগুণবহুল করিয়া দেবভাবাপন্ন করে। যাহার তমোগুণ প্রবল, সে মনে করে, যে ব্যক্তি তমোগুণের কার্য্য করে না, অর্থাৎ আহারনিদ্রাদি পশুবৃত্তিসকলের অনুসরণ করিয়া সর্ব্বদা তাহাতেই ব্যাপৃত থাকে না, সে প্রকৃত কার্য্য করে না। যাহার রজোগুণ প্রবল সে ভাবে, যে ব্যক্তি রজোগুণের কার্য্য করে না, সে কিছুই করিল না, তাহার জীবনই বৃথা হইল; অর্থ, প্রভুত্ব, ঐশ্বর্য্য, মান, সম্ভ্রম, যশ ইত্যাদির জন্য যে লালায়িত হইয়া ছুটাছুটি না করে, তাহাকে সে ভাবে যে, ঐ ব্যক্তি ইহজীবনে প্রকৃত কার্য্য না করিয়া অকারণে সময় অতিবাহিত করিল। আবার যে সত্ত্বগুণাবলম্বী, সে দয়াদাক্ষিণ্যাদির কার্য্য এবং ঈশ্বরচিন্তা প্রভৃতি সত্ত্বগুণের কার্য্যেই ব্যাপৃত থাকে; সে অপর কোন গুণাবলম্বীর কার্য্যকে বৃথা কার্য্যই মনে করে। যে ব্যক্তি যে গুণাবলম্বী সে সেই গুণের কার্য্য করাকেই পুরুষকার মনে করে; কিন্তু আর্য্যশাস্ত্র তাহাকে পুরুষকার বলে না, কারণ সেই কার্য্যত সে স্বভাববশতঃ করিবেই, ক্ষণিক অন্য ভাবের উদয় হইয়া তাহার ঐ কার্য্য করিতে ইচ্ছা না থাকিলেও তাহার যে গুণ প্রবল তাহাতে তাহাকে সেই গুণের কার্য্যে প্রবর্ত্তিত কবিবেই করিবে (১); ইহাতে তাহার কিছুমাত্র

---

(১) স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ॥

গীতা, ১৮।৬০।

পুরুষকার নাই। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, কোন গুণের কার্য্য দ্বারা ক্ষণিক সেই গুণের আধিক্য হয় এবং ঐরূপ কার্য্য ক্রমাগত করিতে করিতে সেই গুণ স্থায়ীরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সুতরাং স্বভাবেরও পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। এইরূপে স্বভাবের যে পরিবর্ত্তন, তাহাই পুরুষকার এবং এই প্রকারে উৎকৃষ্ট গুণের দিকে যে অগ্রসর হওয়া, তাহাই প্রকৃত পুরুষকার।

তমোগুণাবলম্বীর যাহাতে তমোগুণ ক্ষীণ হইয়া, রজঃ ও স্বত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয়, সেই প্রকার কার্য্য করাই উচিত; রজোগুণপ্রবল ব্যক্তির এই প্রকার কার্য্য করাই উচিত, যাহাতে তাহার এই গুণের হ্রাস হইয়া সত্ত্বগুণের আধিক্য হয়, এবং যাহার সত্ত্বগুণ অধিক তাহার এইরূপ কার্য্য করা উচিত, যাহাতে সে অধিকতর সত্ত্বগুণ লাভ করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে; অর্থাৎ নিজ স্বভাব পরিবর্ত্তন করিয়া তমোগুণাবলম্বীর রজঃ ও সত্ত্বগুণের দিকে, রজোগুণাবলম্বীর সত্ত্বগুণের দিকে, এবং সত্ত্বগুণাবলম্বীর সাম্যাবস্থা বা শান্তির দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হওয়াই, তাহাদের পক্ষে প্রকৃত পুরুষকার।

কোন কার্য্যসিদ্ধির জন্য যে যত্ন ও চেষ্টা করা যায়, তাহাই সাধনা, কিন্তু উপরিউক্তরূপ পুরুষকারের জন্য যাহা করা যায়, তাহাই উৎকৃষ্ট সাধনা এবং যে ঐ প্রকার সাধনা করে, সেই প্রকৃত সাধক। উৎকৃষ্ট সাধনার জন্য, অর্থাৎ উৎকৃষ্ট গুণবৃদ্ধির জন্য, যে সকল কর্ম্ম আর্য্যশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা পরে ক্রমশঃ বিবৃত হইবে।

ভাসমান জীব কি প্রকারে শান্তিময় অবস্থায় উপনীত হয়।

সকল জীবইত সুখের জন্য লালায়িত, সেই সুখ ক্ষণিক না হইয়া যাহাতে স্থায়ী হয়, তাহার জন্যওত সকলে আকাঙ্ক্ষা করিতেছে, কিন্তু যে প্রকারে সেই আকাঙ্ক্ষিত সুখ স্থায়ী হইতে পারে, যাহাতে সেই সুখ অনন্ত হইতে পারে, যাহাতে চিরশান্তি লাভ করিতে পারা যায়, তাহার অনুষ্ঠান সকলে অবগত নহে এবং অবগত থাকিলেও নানা কারণে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেছে না, নিজ নিজ প্রকৃতির তাড়নায় তাহাদিগকে অন্যদিকে লইয়া যাইতেছে (১)। কেহ বা বৈষয়িক সুখ সম্মুখে দেখিয়া তাহাই পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছে, কিন্তু শেষে দেখিতেছে, ইহা সুখ নহে, ইহা দুঃখ, যদিও সুখ অনুভব করিতেছে, তাহাও আবার ক্ষণিক, কোন প্রকারেই সে স্থায়ী সুখ পাইতে পারিতেছে না। ত্রিগুণের মধ্যে যে গুণ যে সময়ে তাহার প্রকৃতিতে আধিপত্য করিতেছে, সেই গুণের উপযোগী সুখের জন্য সে ধাবিত হইতেছে। যে জীবের জন্মান্তরীণ সংস্কারবশে কোন সময়ে তমোগুণের প্রাধান্য হইতেছে, তখন সে তাহারই উত্তেজনায় মোহে অভিভূত হওয়ায়, তাহার ইন্দ্রিয়-গণ তত্তদ্‌বিষয়ে ভ্রান্তপথে বিচরণ করিতেছে এবং সে নিদ্রা, আলস্য প্রভৃতিতে সুখ অনুভব করিতেছে ও তাহারই জন্য লালায়িত হইতেছে।

---

(१) सुखार्थाः सर्व्वभूतानां मताः सर्व्वाः प्रवृत्तयः।
सुखञ्च न विना धर्म्मात् तस्माद्धर्म्मपरो भवेत्॥

अष्टाङ्गहृदय, दिनचर्य्या।

ইহাই তামস সুখ (১)। এ সুখ স্থায়ী নহে, কারণ ক্ষণকালপরেই হয়ত তাহার রজোগুণ অপর দুই গুণকে পরাজয় করিতেছে, সে তখন মনে করিতেছে যে আকাঙ্ক্ষিত বিষয়সকলকে আয়ত্ত করিতে পারিলে—ইন্দ্রিয়দ্বারা ঐ সমস্ত গ্রহণ করিতে পারিলে,—সুখী হইবে, ইহাই মনে করায় তাহার ইন্দ্রিয়গণ সেই সেই বিষয়ের দিকে ধাবিত হইতেছে, ইন্দ্রিয়ের সহিত ঐ বিষয়ের সংযোগ হইলে, হয়ত সুখ অনুভব করিতেছে, কিন্তু ক্ষণকাল পরেই তাহা হলাহলময় দুঃখরূপে পরিণত হইতেছে; ইহা রাজস সুখ (২)। আবার যখন সত্ত্বগুণের প্রাধান্য হইতেছে, বাহিরের বিষয় হইতে তাহার ইন্দ্রিয়গণ অন্তর্মুখীন হইতেছে, তখন সে আভ্যন্তরীণ প্রসন্নতা অনুভব করিয়া আনন্দলাভ করিতেছে; ইহাই সাত্ত্বিক সুখ (৩)। এই সুখই স্থায়ী হইতে পারে, কিন্তু তাহার পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ পুনরায় অন্য কোন গুণ প্রাধান্য লাভ করিয়া, তাহাকে তদুপযোগী সুখের প্রলোভন দিয়া আকর্ষণ করিয়া আনিয়া, তত্তদ্‌গুণের কার্য্য করাইতেছে। এই প্রকারে এক গুণ হইতে গুণান্তরে যাওয়াতেই তাহাকে স্থির হইতে দিতেছে না এবং সে স্থায়ী সুখও পাইতে পারিতেছে না। যদি তাহার সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হইতে হইতে ক্রমে ক্রমে সে সাম্যাবস্থা পাইতে পারে, তাহা হইলেই সে চিরশান্তি উপভোগ করিতে পারে, এবং তখন তাহার ছুটাছুটিরও নিবৃত্তি হইয়া যায়; কিন্তু তাহা সে করিতে পারিতেছে না। ক্রমাগত ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়া জীব যখন অবসন্ন হইয়া পড়ে, যখন সকলেরই

(१) यदग्रे चानुबन्धे च इत्यादि । गीता, १८।३९।

(२) विषयेन्द्रियसंयोगादित्यादि । गीता, १८।३८।

(३) यत्तदग्रे विषमिव इत्यादि । गीता, १८।३७।

ক্ষণস্থায়ীত্ব বোধ এবং ক্রমাগত নিরাশ হইতে হইতে যখন সকল মিলনেরই অস্থায়িত্ব অনুভব করে, তখনই অন্যান্য ভাসমান জীব বা পদার্থের দিকে আকর্ষণীশক্তি কমিয়া যায়, এবং সে সেই মহতী আকর্ষণী শক্তি দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তখনই ক্ষণিক সুখ ত্যাগ করিয়া স্থায়ী শান্তি পাইবার আশায় সেই শান্তিময়ের দিকে যাইবার জন্য মন লালায়িত হয়, তখন হইতেই ক্রমে ক্রমে সে সেই দিকেই অগ্রসর হইতে থাকে এবং উজান বহিয়া চলিয়া যাইতে সক্ষম হয়; পরে সেই অসীমশক্তিশালিনী ত্রিগুণময়ী মায়ার অধিকার ছাড়াইয়া, প্রবল বেগবান্ কালের স্রোত হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, পরমানন্দময়, পরমাত্ম-স্বরূপ, মায়াতীত, সচ্চিদানন্দ, পরব্রহ্মের নিকট উপনীত হইয়া, পরমানন্দ ভোগ করিতে করিতে, সেই পরমানন্দেই বিলীন হইয়া যায় (১)। এই প্রকারের গতিই চরম অবস্থায় উপনীত হইবার

---

(১) তদ্যথাস্মিন্নাকাশে শ্যেনো বা সুপর্ণো বা বিপরিপত্য শ্রান্তঃ সংহত্য পক্ষৌ সন্নয়ায়ৈব ধ্রিয়ত এবমেবায়ং পুরুষ এতস্মা অন্তায় ধাবতি যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি।

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ।

যেমন এই আকাশে শ্যেন পক্ষী, অথবা সুন্দর পর্ণযুক্ত মহাপক্ষী, বহুদূর ভ্রমণপূর্ব্বক শ্রান্ত হইয়া উভয় পক্ষ সংহত করিয়া বিশ্রাম করে, সেইরূপ এই পুরুষ অন্তের দিকে ধাবিত হয়, যেখানে গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া কিছুই কামনা ও করে না, কোন স্বপ্নও দর্শন করে না।

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।

মুণ্ডকোপনিষৎ।১।২।১২

কর্ম্মলব্ধ স্বর্গাদিলোকের দোষ-গুণ পরীক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণ তাহা হইতে বিরত হইবেন, যেহেতু অনিত্য বস্তু দ্বারা নিত্যবস্তু লাভ হয় না।

একটি সাধারণ নিয়ম। সকল জীবই এই সাধারণ নিয়মে চরমকালে শান্তিময়ের শান্তিরাজ্যে উপনীত হইয়া তাঁহাকেই লাভ করিবে,—পরমশান্তিময় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইবে।

ঐ সাধারণ নিয়মানুযায়ী, এই ছুটাছুটি হইতে নিবৃত্ত হইতে এবং আকাঙ্ক্ষিত স্থানে উপনীত হইতে, অনেক সময় লাগে। ক্রমান্বয়ে এক একটি বিষয়ে স্থায়ী সুখপ্রাপ্তিতে নিরাশ হইয়া, ক্রমে ক্রমে সমস্ত বিষয়ের অস্থায়িত্ব উপলব্ধিপূর্ব্বক তাহাতে বীতস্পৃহ হইয়া সেই সমুদায় ত্যাগ করিতে এবং পরমাত্মার দিকে ধাবিত হইতেত মনুষ্যরূপী জীবের পক্ষেও আরও অসংখ্য জন্মের প্রয়োজন। আবার, পরমাত্মার দিকে ধাবিত হইয়াও যে, কেহ অনায়াসে তথায় চলিয়া যাইতে পারিবে তাহারও কোন নিশ্চয় নাই, সে বহুদূর অগ্রসর হইয়াও পুনরায় ফিরিয়া আসিতে পারে, তাহা হইলে আবার অনেক বিলম্ব হইয়া গেল।

যদি কেহ ভাবে যে, স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া, যেমন ক্রমে ক্রমে উন্নতি হইতেছে, সেইরূপ উৎকর্ষ লাভ করিতে করিতে একটি সোপানোপরি অপর সোপানে আরোহণ করিয়া, একটি বর্ণে পুনঃ পুনঃ জন্মিয়া, উচ্চতর বর্ণে জন্মলাভকরতঃ ক্রমাগত চলিয়া গিয়া, ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া, যতকালেই হউক নিশ্চয়ই সেই আকাঙ্ক্ষিত পরমপদে উপনীত হইবে এবং চিরশান্তি লাভ করিবে, সুতরাং ঐ জন্য আর চেষ্টার প্রয়োজন কি ? কিন্তু ঐ প্রকারে চলিলে যে বহু বিলম্ব ঘটিবে তাহাও ভাবিয়া দেখা উচিত। তদ্ব্যতীত বরাবর যে ঐ রকম ক্রমাগত অগ্রসর হইয়া চলিয়া যাইবে বা যাইতে পারিবে, তাহারও স্থিরতা নাই, কারণ মধ্যে পদস্খলন হইবার এবং পুনরায় ফিরিয়া পশ্চাদ্‌গমন করিবারও যে আশঙ্কা আছে, তাহা যদি ঘটে, তাহা হইলেইত সর্ব্বনাশ হইল ; কারণ যতদূর ফিরিয়া গেল, সেই সঙ্গে সঙ্গে ততটুকু উৎকর্ষ নষ্ট হইল। জীবসকল সাধারণ নিয়মে ক্রমা-

উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতর গুণের আধিক্য লাভ করিতে করিতে শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতর শ্রেণীতে অগ্রসর হইতে পারে বটে, কিন্তু যতদিন সে শেষাবস্থা প্রাপ্ত না হয়, যতদিন সে ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে না পারে, ততদিন তাহার অধোগতি হইবার আশঙ্কা থাকে (১), কারণ ঐ সময়ের মধ্যে সে যদি পাপাচারে রত হইয়া নিকৃষ্ট গুণের বৃদ্ধি করে, তাহা হইলে তাহার অধোগতি নিশ্চিতই হইয়া থাকে এবং সে পুনরায় নিকৃষ্ট শ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে (২)। তখন আবার সেই অবস্থা হইতে ক্রমে ক্রমে তাহাকে উন্নতি লাভ করিতে হয়, ইহাতে তাহার বহু সময় নষ্ট হইয়া যায়। কেহ কেহ বা কামনাযুক্ত ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা মানবজন্মে ক্ষীণ পুণ্য সঞ্চয় করিয়া দেবলোক প্রাপ্ত হইয়াও ঐ পুণ্য ক্ষয় হইয়া গেলে, পুনরায় মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করে (৩); তৎপরে আবার ক্রমোৎকর্ষবশে দেবলোক প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মত্ব লাভ করে।

উপরিউক্ত সাধারণ নিয়মসমূহের ব্যতিক্রম করিয়া মনুষ্য যে কোন বর্ণ হইতে ক্রমোৎকর্ষের অপেক্ষা না করিয়া, যাহাতে একবারে অধিকতর উৎকর্ষ লাভকরতঃ অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে উচ্চশ্রেণীতে উঠিয়া, তৎপরে আবার তাহা হইতে ক্রমে ক্রমে উন্নতিলাভ করিতে পারে, অথবা মধ্যবর্ত্তী কতিপয় অবস্থা প্রাপ্ত না হইয়া যাহাতে একবারেই পরমপদ লাভ করিতে পারে, যাহাতে পুনরায় অধোগমন

---

(১) आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्त्तिन इत्यादिः । गीता, ৮।১৬।

(২) तानहं द्विषतः क्रूरानित्यादिः । गीता, ১৬।১৯।

(৩) त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा इत्यादयः ।
গীতা, ৯।২০, ২১।

করিবার আশঙ্কা না থাকে, যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র চরম শান্তিময় অবস্থায় উপনীত হইতে পারে, তাহারও উপায় আছে; সেই উপায়ই সাধনা, তাহাই উদ্ভাবন করিয়া, আর্য্যশাস্ত্র নানা পথ দেখাইয়া দিয়াছে। অন্যান্য দেশেও তথাকার লোকদের শক্তি, সামর্থ্য, প্রকৃতি, প্রবৃত্তি, দেশ ও কাল ইত্যাদির উপযোগী নানা সময়ে নানা প্রকার শাস্ত্র প্রচারিত হইয়াছে। আর্য্যশাস্ত্রসম্মত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মপদপ্রাপ্তিই চরম শান্তি ও পরম সুখের আস্পদ বলিয়া তাহারই বিষয় বিবৃত করা গেল। দেশান্তরপ্রচলিত বা অন্য ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রচারিত শান্তির কথার বিচার করা এস্থলে নিস্প্রয়োজন।

প্রকৃত সুখের অনুসন্ধান করিতে হইবে।

যদি কেহ বলে যে, আহার নিদ্রা বা কামরিপুচরিতার্থতা হইতে যে সুখ জন্মে, পশুর বৃত্তি অবলম্বন করিয়া যে সুখ হয়, সে সেই সুখে মোহিত নহে, তাহার জন্য লালায়িতও নহে, সে কেবল ধন, মান, যশ, ঐশ্বর্য্য ও প্রভুত্বের জন্যই ব্যগ্র। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলেও ত সে সুস্থির হইতে পারিল না, তাহার মন যেমন উদ্বেলিত হইতেছিল, সেই রূপই হইতে থাকিল; যাহাকে সুখ বলিয়া ভাবিতেছিল, যখন দেখিল যে তাহা প্রকৃত সুখ নহে, তাহা দুঃখময়, অমনি তাহার মন অন্য কোন বিষয়ে সুখ পাইবে বলিয়া ধাবিত হইল; যদিও সে ইহাতে কিছু সুখ অনুভব করিল, কিন্তু তাহা অতি ক্ষণস্থায়ী, এবং তাহা পাইবার জন্যও যে কত দুঃখ অনুভব করিল, তাহারও ইয়ত্তা নাই। যদি বল যে, তুমি আহারনিদ্রাদি সুখের জন্য ব্যগ্র নহ, ধনমান ঐশ্বর্য্যাদির জন্যও লালায়িত নহ, কেবল বিদ্যোপার্জ্জন, বাহ্যবিষয়ের জ্ঞানলাভ, অথবা পরোপকারাদিদ্বারা মনের প্রসন্নতাপ্রাপ্তির জন্যই

তোমার আগ্রহ, সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য আহারাদি করিবার যে আবশ্যকতা তাহাই করিয়া এবং ধনাদির যাহা প্রয়োজন তাহাই প্রাপ্ত হইয়া, তুমি সন্তোষ লাভ কর। যদিও সেই মানসিক প্রসন্নতারূপ সুখ অন্যান্য সুখ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, কিন্তু ইহাও ত চিরস্থায়ী নহে। যাহাতে নিরবচ্ছিন্ন সুখ হয়, তাহাই আকাঙ্ক্ষণীয়, একবারে চিরকালের জন্য যাহাতে দুঃখদ্বারা অসংস্পৃষ্ট সুখ পাইতে পার, যাহাতে চিরশান্তি লাভ করিতে পার, যাহাতে আর বারংবার অদৃশ্য হইয়া পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইয়া স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে ছুটাছুটি করিতে না হয়, সেই অবস্থাই ত বাঞ্ছনীয়। যাহাতে এই দুস্তর কালের স্রোত হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সেই আকাঙ্ক্ষণীয় সুখময় স্থানে উপস্থিত হইতে পার, সেই ঈপ্সিততম বস্তু লাভকরতঃ শান্তিময় হইতে পার, যাহাতে তুমি চরমসুখের অবস্থা পাইতে পার, তাহারই উপায় করিতে হইবে। তথায় যাইবার,—সেই অবস্থা পাইবার,—কোন পথ আছে কি না, থাকিলে তোমার পক্ষে কোন্‌টি সহজ পথ তাহাই তোমাকে অনুসন্ধান করিতে হইবে, তাহাই জানিয়া তোমাকে সেই পথে চলিতে হইবে। নানাপ্রকার পথ যিনি বিদিত আছেন, যিনি অনেক দূর চলিয়া গিয়াছেন, ঐরূপ কোন ব্যক্তি কৃপা করিয়া, যদি তোমার উপযোগী পথ দেখাইয়া দেন, তাহা হইলে তাহাই অবলম্বন করিয়া অবিচলিতভাবে চলিয়া যাইবে।

শান্তিময় স্থানে উপনীত হইবার পথ কে বলিয়া ও দেখাইয়া দেন।

জীবকে পথ বলিয়া দিবার জন্য ঈশ্বরের নিত্য, সত্য, অক্ষয়,

অভ্রান্ত ও অনাদি বেদরূপ বাণী ক্রমাগত নিঃসৃত হইতেছে (১)। সেই সুস্পষ্ট ও গভীর স্বর সর্ব্বত্র বিস্তীর্ণ হইয়া থাকিলেও আমরা ভ্রমপ্রমাদবশে, সকলে তাহা শুনিতে পাই না, বা বুঝিতে পারি না। ঈশ্বর ও তাঁহার বাক্য আমাদের অন্তরে অধিষ্ঠিত থাকিলেও অজ্ঞানরূপ মলরাশি আমাদিগকে মলিন ও মোহিত করিয়া রাখায়, তাঁহা হইতে যেন অনেক দূরে পড়িয়া গিয়াছি, তজ্জন্য মনে হয় তাঁহাকে দেখিবার বা তাঁহার বাক্য শুনিবার ক্ষমতা যেন আদৌ আমাদের নাই। যতই অজ্ঞানতা তিরোহিত হইবে, ততই দূরত্বও ক্রমে ক্রমে কমিয়া যাইবে। যে সৌভাগ্যশালী জীবের মায়ারূপ অজ্ঞানাবরণ অপসারিত হওয়ায় দূরত্ব তিরোহিত হইয়াছে, সেই প্রকৃত শব্দ শুনিতে পাইয়াছে, তাহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছে, এবং তাহাদ্বারা একবারে বিমোহিত হইয়া নিজ অস্তিত্ব পর্য্যন্ত তাহাতে লোপ করিয়াছে। তখন তাহার পক্ষে ঈশ্বর ও তাঁহার বাণী এবং তাহার নিজ অস্তিত্ব সমস্তই এক হইয়া গিয়াছে। ব্রজাঙ্গনামধ্যে প্রধান সাধিকাগণ একদা এই শব্দ শুনিতে পাইয়াছিলেন, শুনিয়া তাহার ভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন; সেই জন্য তাঁহারা সমস্ত বিষয়সুখ অকিঞ্চিৎকর জ্ঞানে তাহাতে জলাঞ্জলি দিয়া, স্বামীপুত্রাদির স্নেহমমতারূপ সুদৃঢ় শৃঙ্খল বিচ্ছিন্ন করিয়া, লজ্জা, মান, ভয় প্রভৃতি সমস্ত উপেক্ষা করিয়া, ইন্দ্রিয়গণের বহির্ব্যাপার ত্যাগ করিয়া, সেই মধুর, অস্ফুট ও অপূর্ব্ব শব্দকে লক্ষ্যকরতঃ হৃদয়নাথ আত্মারাম উদ্দেশে, তাঁহাকে লাভ করিবার প্রত্যাশায়, উন্মত্তার ন্যায় ছুটিয়াছিলেন। যে সাধিকা তাহাকে জানিয়াছে,

---

(১) अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा।
आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्व्वाः प्रवृत्तयः॥

म: भा:, ११, ८५०४।

তাঁহাতে যাহার মন মজিয়াছে, তুচ্ছ বিষয়সুখে কি তাহার মনকে আকর্ষণ করিতে পারে? নশ্বর স্বামীপুত্রের স্নেহমমতা কি তাহাকে বাধা দিতে পারে? যাহার ইন্দ্রিয়গণ বহির্ব্যাপার ত্যাগ করিয়া অন্তর্মুখীন হইয়া আত্মার ব্যাপারে ব্যাপৃত হয়, সে আত্মাতেই রমণ করে, তাঁহারই সঙ্গলাভ করিয়া সে জীবন্মুক্ত হয়, আর তাহার মন নশ্বর গৃহে ফিরিয়া আসিয়া পতিপুত্রাদির মায়ায় আবদ্ধ হয় না, আর তাহার ইন্দ্রিয়গণ বহির্ম্মুখীন হইয়া বিষয়ব্যাপারে আসক্ত হয় না। ব্রজের ঐ গোপীগণের এই প্রকার অবস্থা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য যে ব্রজবালাগণ ঐ শব্দ শুনিয়াছিলেন, তাঁহারা পতিপুত্রের স্নেহরূপ দৃঢ় শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিলেন, সুতরাং পরমাত্মার প্রতি তাঁহাদের চিত্ত সর্ব্বদা নিবিষ্ট থাকিলেও তাঁহারা জীবন্মুক্ত হইতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহারা গুণময় দেহ ত্যাগ করিয়া তৎপরে তাঁহাকে লাভ করিয়াছিলেন (১)। আর্য্যশাস্ত্রের এই প্রতিধ্বনি পাশ্চাত্য দেশীয় এক মহাপুরুষের হৃদয়কন্দরে আঘাত করিয়াছিল, তাই তিনি বলিয়াছিলেন যে, যে ব্যক্তি তাহার পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা, ভগিনী, এমন কি নিজ জীবনের প্রতি আসক্ত, সে তাঁহার শিষ্যের উপযোগী নহে; যে ঈশ্বর অপেক্ষা ঐ সকলকে অধিক ভাল বাসে, কিংবা তাঁহার জন্য ঐ সকল ত্যাগ করিতে অসমর্থ হয়, সে ঈশ্বরকে পাইবার অধিকারী নহে (২)। ব্রজবালাগণের প্রেমকে আদর্শ করিয়া অন্য এক পাশ্চাত্য ভক্ত মহাপুরুষ প্রেমের স্বরূপ কি তাহা

---

(১) निशम्य गीतं तदनङ्गवर्द्धनमित्यादयः।

भागवतम्, १०।२९।४—११।

(২) Luke, XIV, 26; Mathew, X, 37; XIX, 29.

গাহিয়াছিলেন এবং প্রকৃত ভক্ত সাধকের ঈশ্বরের প্রতি গাঢ় অনুরাগ জন্মিলে কি প্রকার অবস্থা হয় তাহা বলিয়া গিয়াছেন (১)।

অতি প্রাচীন ও প্রবীণ আর্য্যঋষিগণ মনুষ্যগণের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে ঈশ্বরের সন্নিকট হইয়াছিলেন। যখন ঈশ্বরের সহিত তাঁহাদের অস্তিত্ব প্রায় একযোগ হইয়াছিল, সেই সময়ে সেই ঈশ্বরবাণীর অপূর্ব্ব ধ্বনি সর্ব্বপ্রথম তাঁহাদের হৃদয়কন্দরে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। সেই প্রতিধ্বনির প্রতিধ্বনি ক্রমান্বয়ে পরবর্ত্তী আর্য্যঋষিগণের হৃদয়ে আঘাত করায় তাঁহারাও ঐ প্রতিঘাত শব্দ শুনিয়া প্রকৃত শব্দ শুনিবার জন্য মনের আবেগে কালস্রোতের বিপরীত দিকে ছুটিয়া গিয়া সেই লক্ষ্য স্থানে উপনীত হইয়াছেন। এখনও যে কত ব্যক্তি প্রকৃত শব্দ শুনিতে পাইতেছেন এবং আকাঙ্ক্ষণীয় স্থানে উপনীত হইতেছেন, তাহা বলিতে পারা যায় না। প্রতিস্রোতে যাইবার সময়ে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রতিঘাত শব্দ পুনরায় প্রতিধ্বনিত করিয়া গিয়াছেন, কেহ কেহ বা সেই শব্দের সহিত নিজ শব্দ মিশাইয়া উহা বিক্ষিপ্ত করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, আবার কেহ কেহ ঐ শব্দ গ্রহণ করিয়া, তাহাকে আর প্রতিধ্বনিত হইতে না দিয়া, নিজের গুপ্ত আধারে তাহাকে রক্ষা করিয়া, আর তাহা হইতে ইহাকে নির্গত হইতে না দিয়া, তাহাতেই একবারে বিভোর হইয়া, মূল বাণী শুনিবার জন্য উজান বহিয়া উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া গিয়াছেন, এবং লক্ষ্যস্থানে উপস্থিত হইয়া, কি জানি কি শুনিয়াছেন, একবারে যেন তাহাতেই মগ্ন হইয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার অস্তিত্বও তাহাতে মিশাইয়া দিয়াছেন।

একেত নানাপ্রকার আধারে প্রতিধ্বনি গৃহীত হওয়ায় উহার স্বভাবতঃ তারতম্য ঘটিয়াছে, তাহার উপরে আবার কেহ কেহ নিজ

---

(১) The song of Solomon, Old Testament.

শব্দ উহার সহিত মিশ্রিত করায়, উহা অসংখ্য হইয়া পড়িয়াছে, এই জন্যই অনন্ত শাস্ত্ররূপে অসংখ্য শব্দ আর্য্য সাধুগণের হৃদয়কন্দর হইতে উত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। কোন কোন ব্যক্তি তাঁহার উপযোগী শাস্ত্র শুনিতে শুনিতে ও বুঝিতে বুঝিতে নির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিয়া নিঃশব্দে চলিয়া যাইতেছেন, কাহাকেও কিছু বলা কহা নাই, কাহারও প্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই, আপন মনেই চলিয়াছেন। অনেকে তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁহারই গন্তব্য পথে গমন করিতেছেন, আবার কেহ কেহ বা শাস্ত্রের মর্ম্ম না বুঝিয়া, কিংবা নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী বিকৃতভাবে তাহার মর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক প্রকৃত কোন পথ অবলম্বন করিতে না পারিয়া, ভয়ানক কোলাহল-করতঃ, পরস্পর কলহ করিতেছে এবং তাহা হইতে কতই যে বিকৃত শব্দ উত্থিত হইতেছে তাহার সীমাসংখ্যা নাই। তাহাদের বিকট চীৎকারে বধির কর্ণকে 'যেন আরও বধির করিয়া দিতেছে। তাহারা কলহ করিতে করিতে নিজের সামর্থ্য ক্ষয় করিয়া, কোন প্রকার অবলম্বন না থাকায় দৃঢ়রূপে কিছু ধরিতে না পারিয়া, একবারে অবশ ও সামর্থ্যহীন হইয়া স্রোতের প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে এবং লক্ষ্যস্থান হইতে বহুদূরে গিয়া পড়িতেছে। আরও নানা জীব নানা প্রকার উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য প্রকৃত শব্দকে অথবা নিজের বিকৃত শব্দকে শাস্ত্রনামে অভিহিত করিয়া, তাহাই অপরকে শুনাইবার জন্য ব্যগ্র হইতেছে। কেহ কেহ বা নিজ ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে নানাপ্রকার শাস্ত্রের সামঞ্জস্য করিতে না পারিয়া, সমস্তই ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ মনে করিয়া বিকৃতস্বরে বীভৎসরূপে চীৎকার করিতেছে। আবার কেহ কেহ শাস্ত্রের মর্ম্ম সুস্পষ্টরূপে বুঝিয়া, ইহার সামঞ্জস্য উপলব্ধি করিয়া, কি প্রকার সামর্থ্যযুক্ত হইলে কোন্ পথে যাইলে সুবিধা হয়, তাহা বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়া, নিজ নিজ উপযোগী শাস্ত্র অবলম্বনপূর্ব্বক নিজারব্ধ

পথে ক্রমাগত অগ্রসর হইয়া, অতিবেগে চলিয়া যাইতেছেন; এবং অন্যান্য জীবগণকেও তাহাদের নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী পৃথক্ পৃথক্ শাস্ত্র শুনাইতেছেন ও বুঝাইয়া দিতেছেন, ও তাহাদের প্রত্যেকের উপযোগী পথ বলিয়া দিতেছেন এবং প্রয়োজন হইলে কাহাকেও বা নিজে হাত ধরিয়া, তাহার সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়া, চালাইয়া লইয়া যাইতেছেন। তাহারা তাঁহারই বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া, তাঁহারই ক্ষমতার উপর অন্ধ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, তাঁহার পদবিক্ষেপাদি অনুকরণ করিয়া, তাঁহাকেই অনুসরণ করিতে করিতে স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইতেছে এবং নির্ব্বিঘ্নে সেই অভীপ্সিত স্থানে উপস্থিত হইতেছে।

শাস্ত্ররূপ সত্যবাণী সদাই বিদ্যমান রহিয়াছে, মানবদেহধারী গুরুর উপদেশে সেই শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া মনুষ্যগণ অবলীলাক্রমে শান্তিময়ের শান্তিনিকেতনে উপনীত হইতে পারে। আবার ভক্তের পক্ষে ভগবদ্-রূপী ঈশ্বর মনুষ্যবিশেষের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতিবলে তাহার প্রতি করুণা করিয়া পরাৎপর গুরুরূপে তাহার দিকে তাঁহার কৃপারজ্জু নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। সেই ব্যক্তি তখন সুমধুর দৈববাণী শুনিতে পায় এবং তাহাই শুনিতে শুনিতে, সেই রজ্জু অবলম্বনপূর্ব্বক এই দুস্তর স্রোত হইতে উত্তীর্ণ হয়। কখন কখন আবার ভক্তবৎসল সেই লীলাময় ভগবান্ মনুষ্যকে পরিত্রাণ করিবার জন্য স্বয়ংই লীলা করিতে করিতে, এই লীলাক্ষেত্রে,—তাঁহারই স্রোতে,—তাঁহারই মায়ার অধিকারে,—আসিয়া প্রকাশমান হইয়া ভাসিতে থাকেন (১), কিন্তু মায়াতে তাঁহাকে আবদ্ধ করিতে পারে না—তাঁহার উপর কালস্রোতের আধিপত্য

---

(১) পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ গীতা, ৪।৮।

করিবার ক্ষমতা নাই (১)। তিনি লীলা করিতে করিতে, কতকগুলি ব্যক্তিকে মুক্তিপ্রদান করিয়া এবং পরবর্ত্তীগণের জন্ত পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া অন্তর্হিত হন। এই প্রকারে তিনি নানারূপ শরীর পরিগ্রহ করিয়া বহুবার অবতীর্ণ হইয়াছেন, বহুবার স্বয়ং জীবের ন্যায় আচরণ করিয়া সকলকে শিক্ষাপ্রদান করিয়া গিয়াছেন এবং তাহাদের জন্ত বহুবার বহুপথ দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন (২)।

শান্তিময় আশ্রয়ে যাইবার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পথ।

মূল প্রকৃত বাণী এক হইলেও তাহা যে আধারে প্রতিঘাত হওয়ায় প্রতিধ্বনি উত্থিত হইতেছে, সেই আধারের তারতম্যানুসারে প্রতি-ধ্বনিরও তারতম্য ঘটিতেছে এবং তাহার সহিত আবার নূতন নূতন ধ্বনি মিশ্রিত হওয়াতে, অসংখ্য অসংখ্য শব্দ পৃথক্ পৃথগভাবে উৎপন্ন হইতেছে। আর্য্যগণ! তোমরা যে স্থানে আছ, সেই স্থান হইতে যাঁহারা

---

(১) ये चैव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये।
मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि॥

গীতা, ৭।১২।

(২) রাগমার্গে ভক্ত ভক্তি করে যে প্রকারে।
তাহা শিখাইব লীলা আচরণ দ্বারে॥
আপনি না কৈলে কর্ম্ম শিক্ষা নাহি হয়।
আপনি করিয়া কর্ম্ম লোকেরে শিখায়॥

চৈতন্ত চরিতামৃত। আদিলীলা

তোমাদের অগ্রে স্রোতের বিপরীত দিকে গমন করিয়াছেন, তাঁহারা নানাপ্রকার শাস্ত্ররূপ শব্দ বিকীর্ণ করিয়া ঐ দিকে যাইবার নানাপ্রকার পথ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। স্রোতের প্রতিকূলে গমনকে নিবৃত্তি এবং যাহা ইহার অনুকূলে তাহাকে প্রবৃত্তি কহে। শেষোক্ত দিকে যাওয়া বড় সহজ, স্রোতে গা ঢালিয়া দিলেই হইল, মনুষ্য সহজেই এই দিকে যাইতে চাহে ও পারে, কিন্তু তাহা হইলেত শান্তি পাওয়ার জন্ত সে গেল না, ইহাতে সে শান্তিময়ের শান্তিনিকেতন হইতে বহুদূরে গিয়া পড়িবে। নিবৃত্তির দিকে গেলেই চরম লক্ষ্যস্থানে যাইতে পারা যায়, কিন্তু ঐ দিকে যাওয়া বড়ই কষ্টকর, যাহাতে অল্পশক্তিমান্ ব্যক্তি স্রোতের অভিমুখে যাইতে কষ্ট অনুভব না করে, শ্রান্ত হইয়া না পড়ে, সুখে ও স্বেচ্ছায় যাইতে পারে, সেই জন্ত সদ্‌গুরু তাহাকে মধ্যে মধ্যে এক একবার প্রবৃত্তির দিকে অতি অল্পদূরে লইয়া গিয়াই ফিরাইয়া আনেন।

পূর্ব্ববর্ত্তী মহাপুরুষগণ চরম লক্ষ্যস্থানে যাইবার জন্ত যে সকল পন্থা নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন, কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান এই তিনটিই তাহাদের মূল। ঐ পথত্রয় হইতে অসংখ্য বর্ত্ম নির্গত হইয়াছে; তাহারই কোনটি বা কর্ম্মমার্গে যাইতে যাইতে ভক্তিমার্গে উপনীত হইয়া তখনই জ্ঞানমার্গে চলিয়া গিয়া পুনরায় ভক্তিমার্গে ফিরিয়া আসিয়াছে, আবার কোনটি অন্ত রকম ভাবে চলিয়াছে; কখন কখন বা আবার এমন হইতে থাকে যে, তিনটিই একটিতে মিশ্রিত হইয়া যায়, তখন তাহাদিগকে পরস্পর পৃথক্ বলিয়া বোধ হয় না। এই প্রকারে অসংখ্য মার্গ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ঈপ্সিততম বস্তুর অন্বেষণকারী ব্যক্তি, স্বীয় গুরুর উপদেশানুযায়ী স্ব স্ব প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি অনুসারে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পথে স্রোতের বিপরীত দিকে যাইতে যাইতে, সেই বস্তু প্রাপ্ত হয়। অনেকগুলি মনুষ্যের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি

অনেকাংশে তুল্য হইয়া থাকে, এই জন্ত তাহারা প্রায় একই রকম পথ অবলম্বন করিয়া চলিয়া যায়; এই সকল ব্যক্তির সমষ্টিকেই এক একটি সম্প্রদায় বলে। এইরূপে মনুষ্যগণ নানাপ্রকার সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে। চরমলক্ষ্যস্থানে যাইবার পথ অসংখ্য হইলেও জ্ঞান, ভক্তি, ও কর্ম্ম, এই তিনটি মূল মার্গের কোনটির সহিত যাহার অধিক সাদৃশ্য, সেইটি তত্তৎ মূল মার্গ নামে অভিহিত হইয়া থাকে, কিংবা তাহারই শাখারূপে পরিগণিত হইয়া থাকে।

কর্ম্মমার্গ।

কর্ম্ম কি ?

বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং শ্রবণ, স্পর্শন, দর্শন, রসনা ও ঘ্রাণ এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়। ঐ পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং উভয়াত্মক মন, এই একাদশটি ইন্দ্রিয়দ্বারা আমরা কর্ম্ম করি। আকাশ, বায়ু, তেজঃ, অপ্ ও ক্ষিতি এই পাঁচটি ভূত এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটি ঐ পঞ্চভূতের গুণ, অর্থাৎ ঐ পঞ্চভূত এই পঞ্চগুণের আধার। ঐ পঞ্চভূত ও তাহাদের পাঁচটি গুণ এই দশটিকে বিষয় বলে। ঐ বিষয় কয়েকটির মধ্যে যাহা যে ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করিতে পারা যায়, তাহা সেই ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয়। এই সমস্ত পূর্ব্বে বিশেষরূপে বলা হইয়াছে।

যদিও ইচ্ছাদ্বেষসুখদুঃখজ্ঞানাদির অভিব্যক্তির আশ্রয়স্বরূপ শরীর, চিত্ত, অহঙ্কাররূপ কর্ত্তা বা ভোক্তা, করণ বা ইন্দ্রিয়গণ, প্রাণাপান প্রভৃতি বায়ুর ব্যাপার এবং সর্ব্বপ্রেরক অন্তর্য্যামীরূপ দৈব, এই

পঞ্চবিধ কারণ সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মেরই হেতুভূত (১)। কিন্তু কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তদুপযোগী কোন বিষয় গ্রহণ করা, অর্থাৎ কোন ইন্দ্রিয়ের সহিত তদ্গ্রাহ্য কোন বিষয়ের সংযোগ হওয়াকেই, সাধারণতঃ কর্ম্ম বলিয়া থাকে। যেমন, দর্শনেন্দ্রিয় বা চক্ষু কর্ম্ম করিল বলিলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, চক্ষু তদ্গ্রাহ্য বিষয়, অর্থাৎ তেজ, গ্রহণ করিল, তাহাতেই সেই তেজের আধার যে বস্তু, তাহারই রূপ অনুভূত হইল। পরে ইহার প্রতিকৃতি মস্তিষ্কে প্রতিভাত হইয়া মনে নীত হইলে যদি ইহাতে কোন মনোবৃত্তির উদয় হয়, তাহা হইলে মনে ঐ প্রতিকৃতি অঙ্কিত হইল এবং পরিশেষে মন তাহাতে সুখ বা দুঃখ অনুভব করিল। এইরূপ সুখদুঃখভোগই ঐ কর্ম্মের ফল।

ঐপ্রকার সুখদুঃখ অনুভবের পরেও যদি মন নিবারিত না হয়, তাহা হইলে উহা রজোগুণবশতঃ ক্রমাগত নিম্নলিখিতরূপ কর্ম্ম করিতে থাকে। যদি ঐ ইন্দ্রিয়ের উপরিউক্ত কার্য্যে সুখ অনুভব হয়, তাহা হইলে তাহা পুনরায় পাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা হয়, এবং যদি দুঃখ অনুভব হয়, তাহা হইলে তাহা ত্যাগ করিবার জন্য ইচ্ছা হয়, তদনন্তর তাহা হইতে কামনা ক্রোধ প্রভৃতি নানাপ্রকার মানসিক ভাবের উদয় হয়, এইরূপে মন ক্রমাগত কর্ম্ম করিতে থাকে, ও সেই সকল কর্ম্মের আবার নানাপ্রকারের সুখদুঃখরূপ ফল সঞ্চিত হয় এবং ঐ সকল সুখদুঃখের প্রতিচ্ছবিরূপ সংস্কারসমূহ মনে অঙ্কিত হইতে থাকে। যেমন দর্শনেন্দ্রিয়সম্বন্ধে বলা হইল, অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণসম্বন্ধেও সেইরূপ হওয়ায়, মনে বহুবিধ সংস্কাররাশি সঞ্চিত হইয়া থাকে। ভবিষ্যতে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয় সেই সেই ইন্দ্রিয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট না হইলেও পূর্ব্বসংশ্লেষের দ্বারা যে নানাপ্রকার মনোবৃত্তির বিকাশ এবং

(১) অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তেত্যাদয়ঃ। গীতা, ১৮।১৪।১৫।

সেই জন্য যে সকল সুখদুঃখের ছবি মনে অঙ্কিত হইয়াছিল, সেই সমস্ত স্মৃতিপথে আবির্ভূত হইয়া পুনরায় মন এবং তাহারই ইঙ্গিতে অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ সেই প্রকার সুখপ্রাপ্তির এবং দুঃখত্যাগের বাসনায় কার্য্য করিতে থাকে; এই প্রকারে আবার পূর্ব্ববৎ নানাপ্রকার নূতন নূতন মনোবৃত্তির এবং সঙ্গে সঙ্গে সুখদুঃখের উদয় হয়; এইরূপ সুখদুঃখভোগই পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফলস্বরূপ। যদি এই সুখদুঃখ কেবলমাত্র ভোগ করা যায়, অর্থাৎ ঐ সুখে যদি আসক্তি না জন্মে, বা ঐ দুঃখ ত্যাগ করিবার বাসনা না হয়, তাহা হইলে সেই সুখদুঃখের প্রতিকৃতি আর মনে অঙ্কিত হয় না, সুতরাং মনে আর নূতন সংস্কার সঞ্চিত হয় না; কিন্তু যদি উপরিউক্তরূপ আসক্তি বা বাসনা জন্মে, তাহা হইলে সুখদুঃখের প্রতিকৃতি মনে অঙ্কিত হইয়া পরে উদয় হইতে থাকে এবং জীব এইরূপে কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে করিতে ক্রমাগত চলিতে থাকে।

এ জীবনে কামনাদিরূপ ভিন্ন ভিন্ন মনোবৃত্তিবশতঃ উপরি-উক্তরূপে সুখদুঃখের যে সকল ছবি অন্তঃকরণে অঙ্কিত হয় এবং যাহাকে সংস্কার বলে, বর্ত্তমান দেহ ত্যাগ করিলেও সেই সমস্ত থাকিয়া যায়। সেই সকল সংস্কারবশে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় এবং পরজন্মে সেই সকল সুখদুঃখানুযায়ী মনে সঙ্কল্পের উদয় হয় ও তাহারই তাড়নায় ইন্দ্রিয়গণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, অর্থাৎ তদনুযায়ী বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইবার জন্য চেষ্টা করে এবং কখন কখন ইহার সহিত সংশ্লিষ্টও হইয়া থাকে; এই প্রকারে ইন্দ্রিয়গণ কার্য্য করিতে থাকে এবং এইরূপে সুখদুঃখ ভোগ করিয়া জীব পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে থাকে। সাধারণতঃ ভোগের দ্বারা, এবং কখন কখন নিজ সুকৃতিবলে ঈশ্বরানুগ্রহে কর্ম্মফলের তারতম্য বা ক্ষয়বৃদ্ধি হয়। জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত যে সকল কর্ম্মফল ভুক্ত হয় নাই বা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়

নাই, সেই সমস্ত বা অবশিষ্ট কর্ম্মফল এবং ইহজীবনের অর্জ্জিত কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য জীবকে পুনরায় দেহ ধারণ করিতে হয়।

কর্ম্মবিভাগ এবং কর্ম্মানুযায়ী সত্ত্বাদিগুণের তারতম্য।

ইন্দ্রিয়গণদ্বারা যে কর্ম্ম করা যায় তাহাকে ইন্দ্রিয়কর্ম্ম, শরীরস্থ বায়ুর ব্যাপারকে প্রাণকর্ম্ম এবং চিন্তাসমূহকে মানসকর্ম্ম বলিতে পারা যায়। দর্শনশ্রবণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের, আদানগমনাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের এবং উন্মেষ-নিমেষজৃম্ভণাদি প্রাণাদি বায়ুর কর্ম্ম। বাগিন্দ্রিয় দ্বারা যে কর্ম্ম করা যায় তাহা বাচনিক কর্ম্ম, তদ্ব্যতীত অন্যান্য ইন্দ্রিয়কর্ম্ম ও প্রাণকর্ম্মকে কায়িক কর্ম্ম এবং ঐ সকল কর্ম্মকে মনে মনে চিন্তা করাকে মানস-কর্ম্ম বলে। এই প্রকার বিভাগ ব্যতীত কর্ম্মসমূহ বৈধ ও অবৈধভেদে দ্বিবিধ।

শরীররক্ষার্থ অথবা অন্য কোন প্রয়োজনবশতঃ যে কর্ম্ম করা যায় এবং যাহা না করিলে অনিষ্ট ঘটে, অথচ যাহা করিলে স্বকীয় শরীর, মন ও আত্মার উৎকর্ষ সাধিত হয়, এবং অপরের কোন অনিষ্ট না হয়, তাহাই বৈধ, এবং যাহাতে শরীর, মন ও আত্মার অবনতি হয়, অথবা ইহাদের উৎকর্ষের ব্যাঘাত জন্মে, তাহাই অবৈধ কর্ম্ম। যে ব্যক্তি যে গুণাবলম্বী তাহার পক্ষে তাহার নিজগুণানুযায়ী কর্ম্ম, অথবা উৎকৃষ্ট গুণের কর্ম্ম বৈধ কর্ম্ম এবং নিকৃষ্ট গুণের কর্ম্ম অবৈধ কর্ম্ম, অর্থাৎ সত্ত্বগুণাবলম্বীর রজঃ ও তমোগুণের কর্ম্ম, রজোগুণাবলম্বীর তমোগুণের কর্ম্ম এবং তমোগুণাবলম্বীর অধিকতর তমোগুণের কর্ম্ম অবৈধ; সুতরাং একজনের পক্ষে যাহা বৈধ, অপরের পক্ষে তাহা অবৈধ হইতে পারে। যদিও উৎকৃষ্ট গুণের কর্ম্ম বৈধ, কিন্তু অধিকতর উৎকৃষ্ট গুণের

কর্ম্ম তাহার উপযোগী নহে, বরং তাহাতে অনিষ্ট ঘটিবারই সম্ভাবনা, এই জন্য তাহার পক্ষে ইহা বৈধ নহে। যেমন, তমোগুণাবলম্বীর পক্ষে অধিকতম সত্ত্বগুণের কার্য্য বৈধ নহে, রজোগুণের কার্য্য এবং সঙ্গে সঙ্গে সামান্যমাত্র সত্ত্বগুণের কার্য্যই তাহার পক্ষে বিধেয়। বৈধ কর্ম্মই কর্ত্তব্য এবং অবৈধ কর্ম্ম অকর্ত্তব্য।

বৈধ কর্ম্মকেও দুই প্রকারে বিভক্ত করিতে পারা যায়, যথা, স্বাভাবিক বা লৌকিক এবং আনুষ্ঠানিক। যে বৈধ কর্ম্ম সচরাচর প্রয়োজনবশতঃ করা যায়, তাহা স্বাভাবিক এবং যে সকল বৈধ ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইলে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে অধিকতর আত্মোৎকর্ষলাভের সহায়তা করে, তাহাই আনুষ্ঠানিক কর্ম্ম, অর্থাৎ যে ব্যক্তি যে গুণাবলম্বী তাহার পক্ষে সেই গুণের কর্ম্ম স্বাভাবিক বা লৌকিক এবং তাহার উপযোগী অথচ অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট গুণের কর্ম্ম, যাহা সচরাচর স্বভাবশতঃ সম্পন্ন না হইয়া চেষ্টাপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হয়, তাহা আনুষ্ঠানিক।

অবৈধ কর্ম্মের দ্বারা আত্মার অবনতি বা পতন হয় বলিয়া, ইহাকে পাতক এবং আনুষ্ঠানিক বৈধ কর্ম্মদ্বারা শরীর ও মন পবিত্র হইয়া আত্মার উৎকর্ষ সাধিত হয় বলিয়া, ইহাকে পুণ্যকর্ম্ম বলে। পাতককে পাপকর্ম্মও বলিয়া থাকে। স্বাভাবিক বা লৌকিক কর্ম্ম পাপকর্ম্মও নহে পুণ্যকর্ম্মও নহে।

পাপকর্ম্ম কায়িক, বাচনিক ও মানসিক ভেদে ত্রিবিধ। চৌর্য্য, অর্থাৎ যে বস্তু কেহ দান করে নাই, তাহা না বলিয়া গ্রহণ করা, হিংসা, অর্থাৎ অপরকে বৃথা কষ্ট দেওয়া, এবং ব্যভিচার প্রভৃতি, এই সমস্ত শরীর-দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া, কায়িক পাপকর্ম্ম। পরুষ বা অপ্রিয় বচন, অসত্য, পৈশুন অর্থাৎ পরোক্ষে অপরের দোষপ্রকাশ, অসম্বদ্ধ প্রলাপ অর্থাৎ বৃথা বাক্য বলা, এই সমস্ত বাগিন্দ্রিয়দ্বারা সম্পাদিত হয় বলিয়া, বাচনিক পাপকর্ম্ম। পরদ্রব্যে অভিধ্যান, অর্থাৎ পরদ্রব্যে লোভবশতঃ

মনে মনে তাহারই বিষয় আলোচনা, অন্যের অনিষ্টচিন্তন, বিতথাভি-নিবেশ, অর্থাৎ অসত্য বস্তুর পুনঃ পুনঃ ভাবনাপ্রভৃতি পাপের বিষয় মনে মনে চিন্তা করাকে মানসিক পাপকর্ম্ম বলে। (১)

স্বাভাবিক বা লৌকিক কর্ম্ম।

যদিও শরীররক্ষাদির জন্য স্বভাববশতঃ নিজ নিজ গুণানুযায়ী লোকে স্বাভাবিক কর্ম্ম করিয়া থাকে, কিন্তু যদি কেহ নিজ গুণোপযোগী স্বাভাবিক কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে সম্ভবমত অপেক্ষাকৃত উচ্চগুণের কর্ম্ম অভ্যাস করে, তাহা হইলে সাধারণতঃ ক্রমোৎকর্ষবশে তাহার যে উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে, তদপেক্ষা সে ইহাতে অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে, সুতরাং এই লৌকিককর্ম্ম দ্বারাও অলক্ষিতভাবে তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতি হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তি যে প্রকার গুণাবলম্বী, তদনুযায়ী তাহার ইন্দ্রিয়গণ তত্তদ্‌গ্রাহ্য বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট হইতে প্রীতিবোধ করে। যেমন, সত্ত্বগুণাবলম্বীর দর্শনেন্দ্রিয় কোন বিশেষ বর্ণ বা আকৃতি দেখিতে, শ্রবণেন্দ্রিয় কোন বিশেষ শব্দ বা স্বর শুনিতে, ঘ্রাণেন্দ্রিয় কোন বিশেষ গন্ধ আঘ্রাণ করিতে, রসনেন্দ্রিয় কোন বিশেষ বস্তুর আস্বাদ গ্রহণ করিতে, অর্থাৎ পানভোজনাদি করিতে, বাগিন্দ্রিয় কোন বিশেষ শব্দ উচ্চারণ করিতে এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণও তত্তদনুরূপ কোন কোন বিষয় গ্রহণ করিতে সুখবোধ করে, কিন্তু অন্য গুণাবলম্বীর ঐ ঐ প্রকার বিষয়ে প্রীতিবোধ হয় না। যদি কেহ সত্ত্বগুণাবলম্বীর প্রীতিপ্রদ উপরিউক্তরূপ বিষয়সমূহ ইন্দ্রিয়গণদ্বারা গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহার

(১) মনু, ১২। ৫, ৬ ৭।

সত্বগুণের ক্ষণিক কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হয়, এবং উক্তৎ কার্য্য ক্রমাগত করিতে করিতে, সেই গুণের স্থায়ীরূপে ঈষৎ পরিমাণে আধিক্য হইতে থাকে। সত্বগুণসম্বন্ধে যে প্রকার বলা হইল, রজঃ ও তমোগুণ সম্বন্ধেও তদ্রূপ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি যে প্রকার গুণাবলম্বী, সেই গুণের পরে ঠিক যে গুণ উৎকৃষ্ট, তাহারই কার্য্য কিয়ৎ পরিমাণে করিলে, সেই উৎকৃষ্ট গুণ বর্দ্ধিত হইয়া তাহার উৎকর্ষ হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার পক্ষে যাহা অত্যুৎকৃষ্ট গুণ, তাহার কার্য্য করিলে তাহার অপকারই সাধিত হয়। ঐ সমস্ত অতি সূক্ষ্মভাবে বহুকাল প্রণিধান করিয়া না দেখিলে সম্যগ্‌রূপে অনুভব করিতে পারা যায় না, কিন্তু কয়েকটি ইন্দ্রিয়ের কার্য্যে কয়েকটি বিষয়সম্বন্ধে রজঃ বা তমোগুণ বর্দ্ধিত হওয়া সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

আর্য্য ঋষিগণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ ও তত্ত্বনির্দ্ধারণ করিয়া তাঁহাদের দিব্য দৃষ্টি ও বুদ্ধিতে ঐ সমস্ত দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন এবং কোন্ ইন্দ্রিয়ের কি প্রকার কার্য্যে কোন্ গুণের বৃদ্ধি হয়, তাহা সম্যগ্‌রূপে জানিয়া ঐ সকল সম্বন্ধে বিধি ও নিষেধ বাক্য বলিয়া গিয়াছেন। সদ্‌গুরু ঐ সকল অনুযায়ী প্রত্যেক শিষ্যের গুণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহাকে উপদেশ দেন ও ক্রমশঃ উন্নতির পথে লইয়া যান। আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে ঐ সমস্ত বুঝিতে না পারিয়া অবহেলা করিতেছি এবং ক্রমেই অধঃপতিত হইতেছি। যে যে ইন্দ্রিয়ের যে যে প্রকার কার্য্যে যে যে গুণের হ্রাস বা বৃদ্ধি আমরা সহজে বুঝিতে পারি, নিম্নে পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে বলিবার সময় তাহাদের মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করা যাইবে।

জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ ও তাহাদের কর্ম্ম।

ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও তাহার কর্ম্ম।

পঞ্চভূতের মধ্যে ক্ষিতির বিশেষ গুণ গন্ধ। অপর ভূতচতুষ্টয়কে অবলম্বন না করিয়া ক্ষিতি থাকিতে পারে না, সুতরাং আমরা যাহা আঘ্রাণ করি, তাহাতে পাঁচটি ভূতই বিদ্যমান থাকে। কোন বস্তু হইতে তেজের সাহায্যে ক্ষুদ্র ক্ষিতিকণাসকল পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইলে, ঐ সমস্ত বায়ুকর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া, নাসিকামধ্যে প্রবেশ করিয়া, সূক্ষ্ম স্নায়ুসকলের সহিত সংলগ্ন হইবামাত্র, ইহারা স্পন্দিত হইয়া মস্তিষ্কে আঘাত করে, তৎপরে মনে উহার অনুভূতি হইলে, আমরা আঘ্রাণ প্রাপ্ত হই এবং মনে ঐ অনুভূতির প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত হয়। যদি মনে উহার অনুভূতি না হয়, তাহা হইলে আমরা ঐ আঘ্রাণ প্রাপ্ত হই না।

ঘ্রাণের পৃথক্ পৃথক্রূপ দ্রব্যের দ্বারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গুণের আধিক্য বা হ্রাস হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণের হ্রাস বা বৃদ্ধি আমরা সহজে বুঝিতে পারি না, কিন্তু রজঃ বা তমোগুণের বৃদ্ধি অনেকস্থলে সহজেই অনুভব করিতে পারা যায়; যেমন, Hydrocyanic acid অথবা Chloroform আঘ্রাণ করিবামাত্র তমোগুণের বৃদ্ধি হয়, এমন কি উহা কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে বা অধিকক্ষণ আঘ্রাণ করিলে তমোগুণের চরম অবস্থা মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়; Carbonate of Ammonia (Smelling Salt) আঘ্রাণ করিলে রজোগুণ বর্দ্ধিত হয়, সুতরাং ইহাতে নিদ্রা মূর্চ্ছা প্রভৃতি তমোগুণের অবস্থা দূরীভূত হয়।

সাধারণতঃ ক্ষিতিকণার আধিক্যেই তমোগুণের বৃদ্ধি হয়। সামান্য তেজের দ্বারা যাহার সূক্ষ্ম অংশসকল সহজে বিশ্লিষ্ট হইতে না পারায়, বায়ু কর্ত্তৃক চালিত হইতে পারে না, সুতরাং ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের

সাহায্যে ঐ সমস্ত অংশ শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না, সেই বস্তুর আঘ্রাণে তমোগুণ অধিক বর্দ্ধিত হইতে পারে না।

যে সকল দ্রব্যের আঘ্রাণ অতি সহজে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে যাহা সত্বগুণবৃদ্ধিকারক তাহা সাত্বিক, রজোগুণবৃদ্ধিকারক রাজসিক এবং তমোগুণবৃদ্ধিকারক তামসিক। কি প্রকার গন্ধ কোন্ সময়ে কি প্রকার গুণের বৃদ্ধি করে, শাস্ত্রকারগণ তাহা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহারা পুষ্পচন্দনাদি গন্ধদ্রব্য, ধূপাদির ধূম এবং অন্যান্য সুগন্ধ দ্রব্যসমূহের প্রত্যেকের কোন্‌টিতে কি প্রকার গুণ বৃদ্ধি করে, কোন্ সময়ে কোন্ কার্য্যের জন্য উহা ব্যবহার্য্য এবং কোন্ গুণাবলম্বীর পক্ষেই বা উহার কোন্‌টি উপযোগী, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নানা প্রকার বিধান করিয়া গিয়াছেন এবং এই জন্যই পৃথক্ পৃথক্ গুণাবলম্বীর জন্য গন্ধদ্রব্যসম্বন্ধে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্ররূপ পূজার উপকরণ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন এবং পূজা ব্যতীত অন্য কোন কার্য্যের জন্যও কাহার পক্ষে কোন্ সময়ে কি প্রকার গন্ধ উপযোগী বা অনুপযোগী তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, তাঁহারা নানাপ্রকার বিধি ও নিষেধ বাক্যও বলিয়া গিয়াছেন।

রসনেন্দ্রিয় ও তাহার কর্ম্ম।

রসনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য কোন বিষয় ঐ ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করিলে আহার করা হয়, অর্থাৎ পানভোজনাদি কার্য্য সম্পন্ন হয়। পঞ্চভূতের মধ্যে অপ্ বা রস রসনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয়। আকাশ, বায়ু ও তেজ ব্যতীত অপ্ বিদ্যমান থাকিতে পারে না, সুতরাং আমরা যাহা আহার করি, তাহাতে ঐ সকল বর্ত্তমান থাকে এবং তদ্ব্যতীত ক্ষিতিকণাসমূহও ন্যূনাধিকরূপে মিশ্রিত থাকে। সকল কার্য্য অপেক্ষা আহারের দ্বারা ত্রিগুণের বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে; যদিও তাহা

আমাদের সহজে উপলব্ধি হয় না, কিন্তু ইহা দ্বারা শারীরিক ও মানসিক ভাবের যে পরিবর্ত্তন হয়, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কেবল-মাত্র জীবনধারণের জন্যই আহারের প্রয়োজন, সুতরাং ইহাই বিবেচনা করিয়া ইহাতে মানুষ যতই সংযমী হইতে পারে, ততই ভাল। এই সকল কারণবশতঃ শাস্ত্রকারগণ আহারসম্বন্ধে নানাপ্রকার বিধান করিয়া গিয়াছেন।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, পানভোজনের দ্বারা সত্ত্বাদি ত্রিগুণের তারতম্য কি প্রকারে ঘটিবে, ইহার সহিত মানসিক ভাবের কি সম্বন্ধ, যাহা ভাল লাগিবে তাহাই খাইতে হইবে। ইহা কখনই ঠিক নহে। আহারের সহিত মানসিক ভাবের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, ইহাতে ত্রিগুণের বিশেষ-রূপে পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে (১)। যেমন আমরা দেখিতে পাই যে, মদ্য-পান করিলে ক্ষণিক রজোগুণের আধিক্য হয়, তখন ইন্দ্রিয়গণ অসংযত এবং রিপুগণ প্রবল হইয়া উঠে; তৎপরে তমোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তখন জ্ঞানের বিপর্য্যয়, বুদ্ধিভ্রম, প্রমাদ, আলস্যাদি আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং ইন্দ্রিয়গণ শিথিল হইয়া সুচারুরূপে কার্য্যকরণে অক্ষম হয়। ঐ প্রকার ক্রমাগত মদ্যপান করিতে করিতে স্থায়ীরূপে তমোগুণের বৃদ্ধি হইয়া থাকে, এই জন্য প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাহারা অধিক পরিমাণে মদ্যপান করে, তাহাদের কাহারও বা কোন ইন্দ্রিয় অবশ ও কার্য্যাক্ষম হইয়াছে, কাহারও বা কোন অঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়াছে, কেহ বা উন্মাদরোগে আক্রান্ত হইয়াছে এবং কেহ কেহ বা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অবসাদে একবারে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। মদ্য ব্যতীত অন্যান্য অনেক দ্রব্য আহারেও গুণের ঐরূপ পরিবর্ত্তন আমরা সহজেই বুঝিতে পারি।

সাধারণতঃ আহার করিবামাত্র তমোগুণ, তৎপরে ক্রমান্বয়ে রজঃ

---

(১) নিম্নের ১৪০ পৃষ্ঠার "১" নোট দ্রষ্টব্য।

ও সত্ত্বগুণ প্রবল হয়। যে তমোগুণাধিক তাহার রজোগুণের পরে সত্ত্বগুণ কখন কখন অতি ক্ষীণভাবে উদিত হইতে পারে, কিন্তু এই প্রকার অধিকাংশ ব্যক্তিতেই রজঃ ও তমোগুণ পর্য্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আহার করিতে না করিতেই পুনরায় ইহাদের বুভুক্ষা জন্মে, কিছুতেই যেন ক্ষুধার শান্তি হয় না। এই জন্যই সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে, পশুগণ কখন বা নিদ্রাতন্দ্রাদি দ্বারা অভিভূত হইয়া আছে, আবার পরক্ষণেই আহারের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িতেছে।

ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চভূতময় দ্রব্য আহার দ্বারা জীব তাহার পাঞ্চভৌতিক দেহের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। ত্রিগুণের পরিমাণানুযায়ী ক্ষিত্যাদির যে প্রকার সংমিশ্রণদ্বারা যে ব্যক্তি যে প্রকার দেহধারণ করিয়াছে, সে তদুপযোগী আহারই করিয়া থাকে, কিন্তু অভ্যাসদ্বারা ধীরে ধীরে তাহার উপযোগী আহার্য্য দ্রব্যের পরিবর্ত্তন করিলে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার শরীরের ও মনেরও পরিবর্ত্তন হয়, এবং সে উৎকর্ষ বা অপকর্ষের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া থাকে। ক্ষিতি হইতে আকাশ পর্য্যন্ত পঞ্চভূতে তমোগুণের পরিমাণ ক্রমশঃ একটি হইতে অপরটিতে কম। ক্ষিতি সর্ব্বাপেক্ষা তমোগুণাধিক, সুতরাং ভারত্ব-বিশিষ্ট; যাহাতে অধিক পরিমাণে ইহার অংশ আছে, তদ্রূপ আহারই তমোগুণাবলম্বীর প্রিয় এবং ঐ প্রকার আহার করিলে তমোগুণই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। যাহার যতই তমোগুণের লাঘব হইতে থাকে, তাহার ততই ক্ষিতিকণার পরিমাণের হ্রাস হইতে থাকে। যাহাদের তমোগুণের পরিমাণ অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়াছে, তাহারা জলীয় অংশও ন্যূন করিয়া তেজঃ প্রভৃতি ত্রিভূতময় আহারীয় দ্রব্য কেবলমাত্র শ্বাসদ্বারা গ্রহণ করিয়া দেহধারণ করিতে পারে।

আমরা যে কোন দ্রব্য পান বা ভোজন করিয়া থাকি, তাহা প্রাণ-বায়ুর ক্রিয়াদ্বারা উদরে প্রবেশ করিয়া, তথায় সমান বায়ুর সাহায্যে

জঠরাগ্নিকর্ত্তৃক পক্ক হইয়া থাকে। ভুক্তদ্রব্য পক্ক হইয়া ইহার সারাংশ রসরূপে এবং ইহার কিট্ট বা মল বিষ্ঠায় পরিণত হইয়া থাকে। রস পক্ক হইয়া ইহার সূক্ষ্ম সারাংশ রক্তরূপে এবং ইহার মল কফরূপে পরিণত হয়। এই প্রকারে রক্ত পক্ক হইয়া মাংসে ও পিত্তে, অস্থি, মজ্জায় ও লোমে এবং মজ্জা, শুক্রে ও স্নেহে, এইরূপে ক্রমান্বয়ে প্রত্যেকের সূক্ষ্ম-সারাংশ ও কিট্টাংশ পরিণত হইয়া থাকে। ঐ সমস্ত রসাদি দ্রব্য পরিপক্ক হইলে, তাহাদের স্থূল সারভাগ সেই সেই দ্রব্যরূপে রহিয়া যায়, অর্থাৎ রসের স্থূলাংশ রসে পরিণত হয় এবং এই প্রকার অন্যান্য দ্রব্যের ও হইয়া থাকে। শুক্র পরিপক্ক হইলে, ইহার স্থূলাংশ শুক্ররূপে অবস্থিতি করে এবং সূক্ষ্মাংশ ওজোরূপে পরিণত হইয়া সর্ব্ব শরীরে ব্যাপ্ত হয়; ইহার মল নাই (১)।

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক আহার।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে, মনুষ্যগণ সাধারণতঃ যে সকল দ্রব্য আহার করিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে কোন কোন দ্রব্যের এই প্রকার শক্তি আছে যে, তাহা আহার করিলে সত্ত্বগুণের, কোন দ্রব্য রজোগুণের এবং কোন কোনটি বা তমোগুণের বৃদ্ধি করে এবং ঐ ঐ প্রকার আহার করিতে করিতে, ঐ ঐ গুণের ঈষৎ পরিমাণে স্থায়ীরূপে বৃদ্ধি হইতে থাকে। এইজন্য শাস্ত্রকার-গণ সমস্ত আহার্য্যকে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন প্রকারে বিভাগ করিয়াছেন।

---

(১) রসাদ্রক্তং ততো মাংসমিত্যাদয়ঃ।

চরকসংহিতা, চিকিৎসাস্থানম্, ১৪।১৫—১৮।

যে আহারের দ্বারা পরমায়ুর বৃদ্ধি হয় ও বলের সঞ্চার হয়, যাহাতে রোগ জন্মে না, যাহাতে চিত্তের প্রসন্নতা হয় ও রুচি বর্দ্ধিত হয়, যাহা রসযুক্ত ও ঘৃতাদিবৎ স্নেহযুক্ত, যাহার সারাংশ দেহে অধিকক্ষণ স্থায়ী হয়, অর্থাৎ যাহার শক্তি দেহে অধিককাল পর্য্যন্ত ক্রিয়া করিতে থাকে এবং যাহার দৃষ্টিমাত্রেই চিত্তে পরিতোষ জন্মে, সেই আহারই সাত্বিকগণের প্রিয় (১) এবং ঐ প্রকার দ্রব্য আহার করিতে করিতে সত্বগুণের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আহার্য্য দ্রব্যের রস বা স্বাদ ষড়্‌বিধ, যথা, মিষ্ট, অম্ল, তিক্ত, লবণ, ঝাল ও কষায়। এই সকল স্বাদের তীব্রতা যাহাতে যতই কম হয়, ততই তাহা সাত্বিক আহার। শুক্রই দেহের সারাংশ, সুতরাং যে আহার্য্যের অধিকাংশই শুক্ররূপে এবং অতি কম পরিমাণ কিট্ট বা মলরূপে পরিণত হয়,তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সত্বগুণের আহার। ঐরূপ যাহার অধিকাংশ মজ্জা, অস্থি, মাংস, ইত্যাদিরূপে ক্রমান্বয়ে নিকৃষ্ট সারাংশে এবং যথাক্রমে অধিক পরিমাণে ইহাদের কিট্টরূপে পরিণত হয়,তাহাই ক্রমান্বয়ে সত্বগুণের নিকৃষ্ট হইতে নিকৃষ্টতর আহার। যাহা পক্ক হইয়া সারাংশে পরিণত হইতে ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রয়োজন হয় না এবং যাহা আহারদ্বারা শরীরস্থ প্রাণাদি বায়ুসমূহ চঞ্চল না হইয়া স্থিরতা প্রাপ্ত হয়, সুতরাং স্নায়ু ও রক্ত প্রভৃতি এবং ইন্দ্রিয়গণ উত্তেজিত হইয়া চঞ্চল হয় না, ও রিপুগণ সংযত হয়, তাহাই সত্বগুণের আহার। গব্য দুগ্ধ ও ঘৃত, শ্বেতসারযুক্ত আতপান্ন, যব, মুগ, শর্করা, সুমিষ্ট ফল মূল প্রভৃতি যে সমস্ত হবিষ্যান্ন, তৎ-

(১) আয়ুঃ সত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্বিকপ্রিয়াঃ ॥
গীতা, ১৭।৮

সমুদায়ই সাত্ত্বিক আহার, ইহাই সত্ত্বগুণাবলম্বীর আহার, অর্থাৎ প্রকৃত ব্রাহ্মণের উপযোগী আহার। সাত্ত্বিক আহারে শরীরের অংশসকল অতি কম পরিমাণে ক্ষয়প্রাপ্ত এবং ইহার অধিকাংশই সারাংশে পরিণত হয় বলিয়া, ইহাতে ক্ষুৎপিপাসা কম হইয়া থাকে। সিদ্ধ তণ্ডুলের সার নিষ্কাশিত হয় বলিয়া, ইহা আহার করিলে ইহার অধিকাংশই কিট্টরূপে পরিণত হয়, এই জন্য ইহা সত্ত্বগুণের আহার নহে। মাষকলায় আহার করিলেও অধিকাংশ কিট্টরূপে পরিণত হয়, সুতরাং ইহাও সাত্ত্বিক আহার নহে। সাত্ত্বিক আহারের অধিকাংশই সারভাগে পরিণত হইয়া ওজোরূপে সর্ব্ব শরীরে ব্যাপ্ত হয়, এইজন্য শরীর ও মনের উৎকর্ষ সাধিত হইয়া থাকে।

যাহাতে শরীরাভ্যন্তরস্থ বায়ু উত্তেজিত হইয়া চঞ্চল হয়, সুতরাং রক্তাদি এবং মন ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণও চঞ্চল হয় এবং রিপুগণ প্রবল হইয়া অসংযত হয়, তাহাই রজোগুণের আহার। রাজসিক আহার্য্য দ্রব্যের মধ্যে কোন কোনটি অভ্যন্তরে পক্ক হইয়া, মজ্জা ও শুক্ররূপ উৎকৃষ্ট সারাংশে পরিণত হইলেও, তাহা সত্ত্বগুণের আহার্য্য দ্রব্য অপেক্ষা অনেক কম পরিমাণে হইয়া থাকে। সাত্ত্বিক আহার্য্য দ্রব্য অপেক্ষা রাজসিক দ্রব্যের অধিক ভাগ কিট্টরূপে পরিণত হয়। এই আহারে অন্তরস্থ বায়ু অত্যন্ত উষ্ণ ও চঞ্চল হয় বলিয়া, ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস হইয়া থাকে এবং ঐ দ্রব্য পক্ক করিবার জন্যও এইরূপ শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রয়োজনও হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণবৃদ্ধিকারক দ্রব্য অপেক্ষা রাজসিক দ্রব্য আহারে শরীরের অংশসকল শীঘ্র শীঘ্র ক্ষয়প্রাপ্ত হয় বলিয়া, ইহাতে উহা অপেক্ষা ঘন ঘন ক্ষুৎপিপাসা হইয়া থাকে। যাহা অতি কটু যেমন নিম্বাদি, অতি অম্ল, অতি লবণাক্ত, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ যেমন মরিচাদি, অতি রুক্ষ বা কষায়, এবং অতি বিদাহী যেমন সর্ষপাদি, সেই সকল দুঃখ, মনস্তাপ ও রোগ উৎপাদক দ্রব্য রাজস

ব্যক্তিগণের প্রিয় আহার (১), এবং ঐ প্রকার আহারে রজোগুণ বর্দ্ধিত হয়।

তামসিক দ্রব্য আহারে শরীর ভারযুক্ত ও অলস বোধ হয় এবং ঘন ঘন ও দীর্ঘ শ্বাসপ্রশ্বাস হইয়া থাকে। যে কোন দ্রব্যই হউক, এমন কি সাত্ত্বিক দ্রব্যও, যদি প্রচুর পরিমাণে আহার করা যায়, তাহা হইলেও তমোগুণ অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেই সময়ে ঐ প্রকার শরীরের অবস্থা এবং দীর্ঘ ও কষ্টকর শ্বাসপ্রশ্বাস হওয়া অনেকেই অনুভব করিয়া থাকিবেন। তবে সাত্ত্বিক দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে আহারে শরীরের ঐ প্রকার অবস্থা অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না, কিন্তু তামসিক দ্রব্য আহারে হইয়া থাকে। তমোগুণের আহার্য্য দ্রব্যের অধিকাংশই মলমূত্রাদি কিট্টরূপে পরিণত হইয়া বহির্গমন করিয়া যায় এবং ইহার কোন অংশ মেদ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সারাংশে পরিণত হইলেও অতি সামান্য পরিমাণে হইয়া থাকে, ও এই জন্যই প্রচুর পরিমাণে ঘন ঘন আহার করিবার প্রয়োজন হয়। তামসিক আহারে রক্ত, স্নায়ু, পেশিপ্রভৃতির ক্রিয়াশক্তি কম হয় এবং ইন্দ্রিয়গণও শীঘ্রই নিস্তেজ ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। তামসিক আহারে অতি অল্প পরিমাণে শুক্র উৎপন্ন হয় এবং যাহা হয় তাহাও ধারণের শক্তি থাকে না।

যাহা অগ্নিতে পক্ক হইবার পরে এক প্রহর থাকিয়া শৈত্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া শুষ্করস হইতে আরম্ভ হইয়াছে, যাহা তদূর্দ্ধ কাল থাকায় একবারে শুষ্করস হইয়াছে, যাহা তাহা অপেক্ষাও অধিক সময় থাকায় দুর্গন্ধ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, যাহা তদপেক্ষাও অধিককাল এক অহোরাত্র থাকায় পচিয়া দুর্গন্ধ হইয়াছে, যাহা উচ্ছিষ্ট অর্থাৎ অন্যের

---

(১) कट्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः ।
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ गीता, १७।९।

ভুক্তাবশিষ্ট, যাহার সারভাগ নিষ্কাশিত হইয়াছে (যেমন মথিত দুগ্ধাদি), যাহা স্বাভাবিক দুর্গন্ধ (যেমন পলাণ্ডু লশুনাদি), এবং যাহা অপবিত্র (যেমন মলমূত্র শ্লেষ্মা বসা প্রভৃতির সহিত সংসৃষ্ট বস্তু), সেই সব দ্রব্য তামসিক আহার এবং তামস ব্যক্তিগণের প্রিয় (১), এবং এই সমস্ত আহারে তমোগুণ বৃদ্ধি করে। উপরিউক্ত তামসিক আহারে শরীর অলস ও অবসন্ন হয়, তাহা অনেকেই অনেক সময়ে অনুভব করিয়া থাকিবেন।

অগ্নিপক্ব বস্তু যতই অধিকক্ষণ থাকে, ততই তাহা অধিকতর তামসিক আহার। রস শুষ্ক হইলে গুরুপাক হয় এবং ক্রমে যতই অধিকক্ষণ থাকে, ততই ইহা পচিয়া বিস্বাদ হইয়া, মাদকতা উৎপাদন করে। ভুক্তাবশিষ্ট বস্তুতে ভোজনকারীর মুখ ও হস্তের ক্লেদ সংসৃষ্ট হওয়ায়, ঐ ব্যক্তি নিকৃষ্ট গুণাবলম্বী হইলে, সেই গুণ সেই দ্রব্যে সঞ্চারিত হয়, এবং তাহার কোন পীড়া থাকিলে, সেই পীড়ার বীজও ইহাতে সংক্রমিত হইতে পারে, এই জন্য ইহার ভোজন নিষিদ্ধ।

কোন কোন মৎস্য ও মাংস রজোগুণের বৃদ্ধি করে, কিন্তু অধিকাংশই তমোগুণের আধিক্য করিয়া থাকে। মদ্যপানে ক্ষণিক রজোগুণ বর্দ্ধিত হইয়া পরে তমোগুণে পরিণত হয় (২)। মদ্য, মাংস ও মৎস্য কিয়ৎপরিমাণে রজোগুণ বৃদ্ধি করে বলিয়া, জড়তা নষ্ট করিয়া ক্ষণিক

---

(১) যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥

গীতা, ১৭।১০।

(২) বুদ্ধিং লুম্পতি যদ্দ্রব্যং মদকারি তদুচ্যতে।
তমোগুণপ্রধানঞ্চ যথা মদ্যং সুরাদিকম্॥

ভাবপ্রকাশ, পূর্ব্বখণ্ড ১, ৪, ২১৮।

রজোগুণ বৃদ্ধি করিতে তামসিক ব্যক্তিগণ অধিক পরিমাণে এই সমস্ত পানভোজন করিয়া থাকে এবং তাহাদের ইহার প্রয়োজনও হইতে পারে, কিন্তু এই সকল আহারে সত্ত্বগুণ নষ্ট করে বলিয়া, সত্ত্বগুণাবলম্বীর পক্ষে এই সমস্ত নিষিদ্ধ (১)।

আহার্য্য দ্রব্য ষড়্বিধ, যথা চুষ্য (যেমন ইক্ষু দাড়িম্বাদি), পেয়, লেহ্য, ভোজ্য) যেমন ভাত দাইল ব্যঞ্জনাদি), ভক্ষ্য (যেমন লড্ডুক মোদকাদি), এবং চর্ব্ব্য (যেমন ভর্জ্জিত চিপিটক তণ্ডুল ও চণকাদি শুষ্ক

---

(১) It is evident, however, that the character of the walking and the talking must be more or less dependent upon the character of the foodstuffs out of which it is made. Our very thoughts and impulses are born of what we eat. Nutrition is thus the fundamental thing in human experience. To control nutrition means the control of all vital processes, the moulding and modifying of all human impulses.

Liebig, the greatest German chemist of the last century, recognized this, and tells of an interesting observation which proved it. In the museum at Giesen was kept a bear, the keepers of which had discovered the influence of diet upon character. They amused themselves and the public by changing the character of the animal at will. On a vegetable diet it was peaceful and playful as a kitten. On a diet of meat it became so ferocious that care was needful to prevent its doing damage. Liebig also observed that hogs fed on a diet of flesh, became so savage that they sometimes would actually attack their herders.

The explanation of this influence of a flesh diet upon the character is found in the following statement by Gautier, the greatest living authority upon diet :—

"On a flesh diet these toxic bodies (urea, uric acid, ammoniacal salts, etc,) accumulate and acidify the blood, excite the heart intoxicate the subject, disturb the functions of the skin, lungs, liver or kidneys."

বস্তু); ইহারা ক্রমান্বয়ে গুরু (১)। লঘুদ্রব্য সত্ত্বগুণবর্দ্ধক এবং গুরুদ্রব্য তমোগুণবর্দ্ধক (২), সুতরাং ইহারা পর পর ক্রমশঃ অধিকতর তামসিক আহার।

Here is the secret fully laid bare. A meat diet "intoxicates" the subject. An intoxicated man behaves differently from a man who is not intoxicated. The larger the amount of intoxicant which a man swallows, the deeper is his intoxication. The character of his intoxication depends upon the nature of the intoxicant, and in a measure upon the peculiarities or idiosyncrasies of subject. But no intoxicated man, whatever the nature or the amount of the intoxicant, can be regarded as a normal man.

If more evidence were needed than the repulsive appearance and the inhuman and abhorrent procedures necessary in the preparation of flesh foods, this testimony as to its intoxicating character should be sufficient to settle the question of its adaptability to human sustenance. A diet which "disturbs the functions of the skin, lungs, liver, and kidneys" certainly cannot be a desirable source of nutriment. A true food, a wholesome nutriment, must be a substance which supports the bodily functions, which reinvigorates the wasted energies, not one which disturbs and intoxicates.

Extract in the "Statesman" of August 30, 1910, from a Vegetarian paper.

(১) आहारं षड्विधं चूष्यं पेयं लेह्यं तथैव च ।
भोज्यं भक्ष्यं तथा चर्व्व्यं गुरु विद्यात् यथोत्तरम् ॥

भावप्रकाश, पूर्व्वखण्ड, १।४।१६९—१११ ।

(২) लघु पथ्यं प्रोक्तं कफघ्नं शीघ्रपाकि च ।
गुरु वातहरः पुष्टि श्लेष्मकृच्चिरपाकि च ॥

भावप्रकाश, पूर्व्वखण्ड, १९९ ।

অনেকে সত্বগুণের সহিত তমোগুণের গোলযোগ করে, সুতরাং আহারাদিসম্বন্ধে তাহারা নানাপ্রকার ভ্রমে পতিত হয়। ঐ প্রকার ভ্রমযুক্ত ধারণাবশতঃ তাহারা মনে করে যে, হবিষ্যান্নপ্রভৃতি সত্বগুণের আহারে ইন্দ্রিয়গণ শিথিল এবং ইহাদের শক্তি হ্রাস হইয়া, কার্য্যকরণে অক্ষম হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, বরং ইহাতে ইন্দ্রিয়গণের শক্তি বর্দ্ধিত হয় এবং সেই সঙ্গে ইন্দ্রিয় ও রিপুগণ দমিত, সংযত ও স্থির হইয়া থাকে এবং অকারণ চঞ্চল হয় না। যাহা তমোগুণের আহার, তাহাতেই ইন্দ্রিয়গণ শিথিল হয় এবং ইহাদের শক্তির হ্রাস হয়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে রজোগুণ অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইলে হয় সত্বগুণে না হয় ত তমোগুণে পরিণত হয়; সুতরাং যাহারা কিছু কিছু সত্বগুণের কার্য্য করিয়া ক্রমশঃ এই গুণকে বর্দ্ধিত না করে, তাহারা রজো-গুণাধিক্যের পরে তমোগুণে উপনীত হয়, অতএব যাহারা স্বভাবতঃ রজোগুণাবলম্বী তাহাদের অধিক পরিমাণে রজোগুণবৃদ্ধিকারক দ্রব্য আহার করা উচিত নহে, কারণ তাহা হইলে তাহাদের রজোগুণ আরও বর্দ্ধিত হইয়া তাহাদিগকে শীঘ্রই তমোগুণে লইয়া যায়। এই জন্যই তমঃপ্রধান দেশের লোকের প্রচুর পরিমাণে রাজসিক আহার করিবার প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু সত্বপ্রধান বা রজঃপ্রধান দেশের লোকের ঐ প্রকার অধিক পরিমাণে রাজসিক আহারের প্রয়োজন হয় না।

যাহা আহার করিলে কোন বিশেষ রোগের শান্তি হয়, অথবা যাহা ব্যক্তিবিশেষের উপযোগী, কিংবা যাহা শরীরের অবস্থাবিশেষে কোন বিষয়ে উপকারী, তাহাই সকল অবস্থাতেই সকলের পক্ষেই উপযোগী, ইহাই কাহারও কাহারও ধারণা এবং সেই জন্যই তাহারা বহুবিধ তামসিক অমেধ্য দ্রব্য আহার করিয়া নিজ উৎকর্ষের ব্যাঘাত

জন্মাইয়া দারুণ অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে। গুণানুযায়ী শরীরের অবস্থাভেদে স্বীয় উপযোগী আহার করা, অর্থাৎ যে প্রকার আহার-দ্বারা সে ক্রমে ক্রমে উৎকৃষ্ট গুণের বৃদ্ধি করিতে পারে, সেইরূপ আহার করাই কর্ত্তব্য। এক জনের পক্ষে যাহা উপযোগী, অন্যের পক্ষে হয় ত তাহা অনুপযোগী, শরীরের এক অবস্থায় যাহা উপকারী অন্য অবস্থায় হয়ত তাহা অনিষ্টজনক, ইহা স্মরণ রাখিয়া, এবং কেবলমাত্র রসনার তৃপ্তিসাধন বা উদরপূরণ করে বলিয়াই, যে কোন দ্রব্য আহার করা কর্ত্তব্য নহে, ইহাই মনে রাখিয়া, সকলের আহার্য্য দ্রব্য নির্ব্বাচন করা উচিত।

সৃষ্ট বস্তুমাত্রই তিনটি গুণযুক্ত, কেবলমাত্র একটি গুণযুক্ত বা একটি গুণবৰ্দ্ধক কিছুই হইতে পারে না, সেই জন্য যাহা আহার করা যায় তাহা একটি গুণযুক্ত বা একটি গুণবর্দ্ধক নহে, তবে কোন কোন দ্রব্যে কোন গুণ অধিক কোন কোন দ্রব্যে কোন গুণ অল্প হয়; এমন কি সত্ত্বগুণবহুল বায়ু সেবন করিলে তাহাতেও তিনটি গুণই সঞ্চারিত হয়। যে সকল দ্রব্য আহার করা যায় তাহার কোনটিতে তিনগুণের মধ্যে কোন গুণ অত্যন্ত বৃদ্ধি করে, তদপেক্ষা অল্প পরিমাণে অপর একটি গুণের আধিক্য করে এবং তাহা অপেক্ষা আরও কম পরিমাণে অবশিষ্ট গুণ বর্দ্ধিত করে; সুতরাং যে দ্রব্যে যে গুণ অত্যধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা সেই গুণেরই আহার বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। এই প্রকারেই আহার্য্য দ্রব্যসকল সত্ত্বাদিগুণানুযায়ী তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে।

নিয়মিত আহার উপযুক্ত সময়ে করিলে সত্ত্বগুণ বর্দ্ধিত হয়, ইহার ব্যতিক্রম হইলে তমোগুণাধিক্য হয়। অধিক ভোজন করা এবং ক্ষুধা হইলেও একবারে অনাহারে থাকা, এই উভয়েই তমোগুণের

বৃদ্ধি হয় (১)। অসময়ে ভোজন করিলেও তমোগুণ বর্দ্ধিত হয় (২)। সাধারণতঃ এক প্রহর বেলার মধ্যে এবং দ্বিপ্রহরের পরে এবং সায়ংকাল ও প্রাতঃকালে আহার নিষিদ্ধ, ইহাতেও তমোগুণের আধিক্য হয় (৩)।

---

(১) আলস্যগৌরবাটোপসাদাংশ্চ কুরুতেঽধিকম্ ।
হীনমাত্রং তনোঃ কার্শ্যং করোতি চ বলক্ষয়ম্ ॥

ভাবপ্রকাশ, পূর্ব্বখণ্ড, ৭।৪।১৪৮।

অধিক ভোজন করিলে আলস্য, শরীরের গুরুতা, আটোপ (পেট ফাঁপা) ও অবসাদ জন্মে। অল্প ভোজন করিলে শরীরের কৃশতা ও বলক্ষয় হয়।

(২) অপ্রাপ্তকালে ভুঞ্জানোঽপ্যসমর্থতনুর্নরঃ ।
তাংস্তান্ ব্যাধীনবাপ্নোতি মরণঞ্চাধিগচ্ছতি ॥

ভাবপ্রকাশ, ৭।৪।১৪৯।

(৩) যামমধ্যে ন ভোক্তব্যং যামযুগ্মং ন লঙ্ঘয়েৎ ।
যামমধ্যে রসোৎপত্তির্যামযুগ্মাদ্ বলক্ষয়ঃ ॥
সায়ং প্রাতর্মনুষ্যাণামিত্যাদি ।

ভাবপ্রকাশ, ৭।৪।১৫৫,১৫৬।

দর্শনেন্দ্রিয় ও তাহার কর্ম্ম।

সত্ত্বগুণ শুভ্র, রজোগুণ লোহিত ও তমোগুণ কৃষ্ণবর্ণ এবং শুভ্র বলিলে যে কেবলই শ্বেতবর্ণ বুঝায় না, এ সমস্ত পূর্ব্বে বিশেষরূপে বলা হইয়াছে। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গুণাবলম্বী পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ দেখিতে ভালবাসে এবং যে গুণের যে বর্ণ তাহাই দেখিতে দেখিতে মনুষ্যের সেইগুণ বর্দ্ধিত হয়। চক্ষুর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্ররূপ সন্নিবেশের দ্বারাও পৃথক্ পৃথক্ গুণের হ্রাস বা বৃদ্ধি হইয়া থাকে ; যেমন আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে, যখন নিদ্রা আসিতেছে তখন চক্ষু মুদ্রিত করিতে ও অন্ধকারময় ঘরে থাকিতে, প্রীতি বোধ করা যায়, এবং শয়ন করিয়া ঐ প্রকার অবস্থায় থাকিলে নিদ্রারও সহায়তা করে, সুতরাং ঐরূপ অবস্থায় তমোগুণেরই বৃদ্ধি হয় ; চক্ষু ইতস্ততঃ চালনা করিলে এবং আলোকময় স্থানে থাকিলে, শীঘ্র নিদ্রা আসিতে পারে না এবং মনও চঞ্চল হয়, সুতরাং ইহাতে রজোগুণের বৃদ্ধি হয় ; এবং চক্ষু উন্মীলন করিয়া বাহিরের কোন নির্দ্দিষ্ট বস্তুর প্রতি স্থির করিয়া রাখিলে, কিংবা ইহা মুদ্রিত করিয়া মনে মনে কোন একটি বস্তুর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তারাদ্বয় নিশ্চলভাবে রাখিলে, নিদ্রাও আসিতে পারে না, এবং মনও চঞ্চল হয় না, সুতরাং ইহাতে সত্ত্বগুণেরই বৃদ্ধি হয়। কোন্ বর্ণ কোন্ সময়ে দেখিলে, এবং কখন কি অবস্থায় কি প্রকারে চক্ষু সন্নিবেশিত করিলে, কোন্ গুণের আধিক্য বা হ্রাস হয়, আর্য্যঋষিগণ তৎসমুদয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা ও অনুসন্ধান করিয়া, কি প্রকার গুণাবলম্বী ব্যক্তি কোন্ বর্ণের দ্রব্য কোন্ সময়ে কি প্রকারে দেখিলে এবং চক্ষুর তারাদ্বয় কখন কি ভাবে রাখিলে, তাহার ক্রমিক উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে নানাপ্রকার বিধান করিয়া গিয়াছেন। কোন্ গুণাবলম্বী ব্যক্তির কোন্ বর্ণের পুষ্প, চিত্র বা অন্য কোন দ্রব্য

কোন্ সময়ে দেখা উচিত, সেই সকল সম্বন্ধে তাঁহারা যে সমস্ত নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, গুণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই তৎসমুদয়ের ব্যবস্থা বিধান করিয়া গিয়াছেন।

স্পর্শনেন্দ্রিয় ও তাহার কর্ম্ম।

পৃথক্ পৃথক্ বস্তু স্পর্শ করিলে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গুণের হ্রাস বা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যেমন আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই যে, অত্যন্ত গ্রীষ্মের সময়ে শীতল জলে স্নান করিয়া শয়ন করিলে, নিদ্রাকর্ষণ হইয়া থাকে, কিন্তু অগ্নিসেবন করিলে রজোগুণের বৃদ্ধি হইয়া নিদ্রা দূরীভূত হয়। তমোগুণের বৃদ্ধিবশতঃ শরীরের জড়তা হইলে, যন্ত্রদ্বারা ঈষৎ তাড়িতশক্তি পরিচালনা করিলে, ঐ জড়তা নষ্ট হইয়া রজোগুণের বৃদ্ধি হয় এবং ইন্দ্রিয়গণ চঞ্চল হইয়া পড়ে, আবার অনিয়মিতরূপ তাড়িতপ্রয়োগে তমোগুণের পূর্ণাবস্থা মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে। কোন্ বস্তু কোন্ সময়ে কি ভাবে কোন্ অঙ্গের দ্বারা কতক্ষণ স্পর্শ করিলে কোন্ গুণের বৃদ্ধি হয়, তাহাও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ঋষিগণ পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন এবং তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই মানবগণের কর্ত্তব্য কার্য্য নির্দ্ধারণসম্বন্ধে নানাপ্রকার বিধি ও নিষেধ বাক্য বলিয়া গিয়াছেন। এই জন্যই সমস্ত শরীর অথবা ইহার কোন কোন অংশ, কখন বা জলদ্বারা ধৌত বা শীতলকরণের, কখন বা সূর্য্যকিরণে অথবা অগ্নিসন্তাপে উত্তপ্তকরণের, কখন বা উহাতে মৃত্তিকা ভস্ম চন্দনাদি লেপনের, অথবা রঞ্জিত বা শুভ্র, কার্পাসনির্ম্মিত বা অন্য কোন প্রকারের বস্ত্রদ্বারা ইহা আচ্ছাদনের, কিংবা কুশাসন, অজিন, কম্বল বা অন্য

কোন প্রকার দ্রব্যের উপরে ইহাকে স্থাপনের, অথবা ইহাতে তুলসী প্রভৃতি কাষ্ঠের বা গুঞ্জা রুদ্রাক্ষ পদ্ম প্রভৃতির বীজের মালা, স্বর্ণাদি ধাতু এবং মণি মুক্তা স্ফটিক শঙ্খ প্রবালাদি রত্ন ধারণের নানাপ্রকার বিধি-ব্যবস্থা, শাস্ত্রকারগণ সম্যগ্‌রূপে আলোচনা করিয়া, সত্ত্বাদি গুণানুসারী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অধিকারীর পক্ষে পৃথক্ পৃথক্ সময়ের বা পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যের জন্য, প্রত্যেকের উপযোগিতানুসারে এবং তাহার উৎকর্ষের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। উপরিউক্ত নানা-প্রকার দ্রব্য কি প্রকার ভাবে কখন কোন্ অঙ্গের দ্বারা স্পর্শ করিলে কোন্ গুণের বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং কি উদ্দেশ্যে শাস্ত্রকারগণ ঐ সকল সম্বন্ধে নানাপ্রকার বিধি ও নিষেধ বাক্য বলিয়া গিয়াছেন, তৎসমুদয় সম্যগ্‌রূপে পর্য্যালোচনা করা এস্থলে সম্ভবপর নহে, তবে সামান্যত কয়েকটির উল্লেখ করা যাইতেছে।

রেসমের ও পশমের বস্ত্র এবং রক্তবর্ণ বস্ত্র শীতকালে, কষায় বস্ত্র (অর্থাৎ রক্তপীতমিশ্রিত বর্ণে রঞ্জিত বস্ত্র) গ্রীষ্মকালে, এবং শুক্লবস্ত্র বর্ষাকালে পরিধেয় (১)। শুক্লবস্ত্রে সত্ত্বগুণ, রক্তবস্ত্রে রজোগুণ, এবং কৃষ্ণবস্ত্রে তমোগুণ বর্দ্ধিত হয়। নীলবস্ত্রে তমোগুণ বর্দ্ধিত হয় বলিয়া

(১) কৌশেয়মৌর্ণিকঞ্চৈব রক্তবস্ত্রং তথৈব চ।
বাতশ্লেষ্মহরং তত্তু শীতকালে বিধারয়েৎ॥
মেধ্যং সুশীতং পিত্তঘ্নং কষায়ং বস্ত্রমুচ্যতে।
তদ্ধারয়েদুষ্ণকালে তচ্চাপি লঘু শস্যতে॥
শুক্লন্তু শুভদং বস্ত্রং শীতাতপনিবারণম্।
ন চোষ্ণং ন চ বা শীতং তত্তু বর্ষাসু ধারয়েৎ॥
ভাবপ্রকাশ, পূর্ব্বখণ্ড, ৭।৪।৮৮—৯০।

ইহা পরিধেয় নহে (১)। সত্ত্বগুণাবলম্বীর এবং সত্ত্বগুণের কার্য্যকালে অন্যান্য ব্যক্তিরও অত্যন্ত রজোগুণবর্দ্ধক উৎকট রক্তবর্ণ ও তমোগুণবর্দ্ধক নীলবর্ণ বস্ত্র একবারেই নিষিদ্ধ (২)। গৈরিক বসনে অভ্যন্তরস্থ তেজ অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, সুতরাং ইহা সন্ন্যাসী ব্যতীত অন্যে সহ্য করিতে পারে না, অতএব অপরের পরিধেয় নহে।

কৃষ্ণ অগুরু ও কুঙ্কুমমিশ্রিত চন্দন শীতকালে, কর্পূর ও বালা মিশ্রিত চন্দন গ্রীষ্মকালে এবং কুঙ্কুম ও মৃগনাভিযুক্ত চন্দন বর্ষাকালে শরীরে লেপন করা কর্ত্তব্য (৩)। ভস্ম অপরিচালক, সুতরাং ইহা লেপন করিলে শরীরাভ্যন্তরস্থ তেজ বহির্গমন করিতে না পারায় অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়, সুতরাং সকলে সহ্য করিতে পারে না, এই জন্য সন্ন্যাসী ব্যতীত গৃহস্থের উপযোগী নহে।

---

(১) नीलीवस्त्रं न स्पृशेत्तु नीलीमनिरयं व्रजेत् ।

मात्स्ये प्रायश्चित्ताध्यायः ।

(২) न रक्तमुल्वणं वासो न नीलञ्च प्रशस्यते ।

नरसिंहपुराणम् ।

(৩) कुंकुमञ्चन्दनञ्चापि कृष्णागुरु च मिश्रितम् ।
उष्णं वातकफघ्नं हि शीतकाले तदिष्यते ॥
चन्दनं घनसारेण वालकेन च मिश्रितम् ।
सुगन्धि परमं शीतमुष्णकाले प्रशस्यते ॥
चन्दनं कुङ्कुमोपेतं मृगनाभिसमायुतम् ।
न चोष्णं न च वा शीतं वर्षाकाले तदिष्यते ॥

भावप्रकाश, ४.५२—५४ ।

শ্রবণেন্দ্রিয় ও তাহার কর্ম্ম।

বিশেষ বিশেষ শব্দ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গুণের বৃদ্ধি বা হ্রাস করিয়া থাকে। আমরা দেখিতে পাই যে, একই প্রকার অতি মৃদু মৃদু শব্দ শ্রবণ করিতে করিতে নিদ্রাকর্ষণ হয়, সুতরাং তমোগুণের ক্ষণিক বৃদ্ধি হয়; ইহাতে নিদ্রার সহায়তা করে বলিয়াই শিশুগণকে ঘুম-পাড়ানর স্বর এই প্রকারই হইয়া থাকে। নিকটে ঢক্কানিনাদের ন্যায় উচ্চ শব্দ হইলে রজোগুণের আধিক্য হইয়া নিদ্রা দূরীভূত হয়। শঙ্খ ঘণ্টা প্রভৃতির শব্দও রজোগুণবর্দ্ধক ও চিত্তাকর্ষক এই জন্যই পূজার পর দেবদেবীর আরতির সময় এই সকল বাদ্য প্রয়োজনীয় (১)। রজোগুণ প্রবল করিয়া সৈন্যগণকে উত্তেজিত ও তাহাদের বীররসের উদ্রেক করিবার জন্যই রণক্ষেত্রে রণবাদ্য করিবার ব্যবস্থা। অনেকে অনুভব করিয়া থাকিবেন, কোন কোন শব্দ শুনিলে সংসারের জ্বালাযন্ত্রণা ভুলিয়া মন যেন কেমন একটা আনন্দরসে আপ্লুত ও স্থির ভাবাপন্ন হয়; এই শব্দে সত্ত্বগুণের উদ্রেক হয় বলিয়াই ঐ প্রকার হইয়া থাকে। এই প্রকার ঈশ্বরাসক্তিবর্দ্ধক, শোকনাশক, সত্ত্বগুণ-বৃদ্ধিকারক, মধুর শব্দ জগন্মোহন শ্রীকৃষ্ণের বেণু হইতে উত্থিত হইয়া একদিন ভক্তগণের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল। পৃথক্ পৃথক্ রাগ-রাগিনীতে মন নানাসময়ে নানাপ্রকার ভাবাপন্ন হয় তাহাও অনেকেই অনুভব করিয়া থাকিবেন।

যে ব্যক্তি যে প্রকার গুণাবলম্বী সে তদনুযায়ী শব্দ শুনিতে ভাল বাসে; আবার পৃথক্ পৃথক্ সময়ে প্রত্যেক ব্যক্তিতে সত্ত্বাদিগুণের

---

(১) বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে শঙ্খের শব্দে কীটাণু নষ্ট হইয়া দূষিত বায়ু পরিষ্কৃত হয়।

ক্ষণিক পরিবর্ত্তন হইতেছে বলিয়া, সকল সময়ে এক রকমের শব্দ শুনিতে ভাল লাগে না। যেমন, কোন সময়ে কাহারও তমোগুণ অধিক হইয়া নিদ্রা আসিতেছে, এমন সময়ে তাহার কাণের নিকট যদি কেহ ঢাকের শব্দ করে, তাহার কি তাহা ভাল লাগে? আবার ঐ ঢাকের শব্দই অন্যের, অথবা যে নিদ্রা যাইতেছে তাহারই অন্য সময়ে, ভাল লাগিতে পারে। নিদ্রা আসিবার সময়ে শুষ্ক পত্রের উপরে এক এক ফোঁটা করিয়া জল পড়ার শব্দের ন্যায় একঘেয়ে অতি মৃদু মৃদু শব্দ শুনিতে মধুর বোধ হয়; কিন্তু অন্য সময়ে হয় ত ভাল লাগে না; যেমন, কোন সময়ে মন স্থির হইয়া যদি কোন একটি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হয়, সেই সময়ে ঐ প্রকার টপ্ টপ্ শব্দে বিরক্তি বোধ হয়।

কাহার পক্ষে কোন্ সময়ে কি প্রকার শব্দ উপযোগী এবং উৎকৃষ্ট গুণবৃদ্ধিদ্বারা তাহার উৎকর্ষের সহায়কারী, তৎসম্বন্ধে তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যালোচনাকরতঃ শাস্ত্রকারগণ নানাপ্রকার বিধান করিয়া গিয়াছেন। ঐ কারণবশতই কাহারও কাহারও পক্ষে কোন কোন ভাষা শ্রবণ করা অনিষ্টকর বিবেচনা করিয়া, তাহাকে তাহা শুনিতে, তাঁহারা নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। তমোগুণাবলম্বীর পক্ষে সত্ত্বগুণব্যঞ্জক বেদবাক্য শ্রবণ কেন নিষিদ্ধ, তাহার অন্যান্য নানাকারণের মধ্যে ইহাও একটি বিশেষ কারণ হইতে পারে।

কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ ও তাহাদের কর্ম্ম।

বাগিন্দ্রিয় ও তাহার কর্ম্ম।

জিহ্বা, কণ্ঠ, তালু, মূর্দ্ধা, দন্ত ও ওষ্ঠ এই কয়েকটি বাগিন্দ্রিয়ের যন্ত্র। ইহাদের মধ্যে একটি বা ততোধিক সঞ্চালিত হইলে, শরীরমধ্যস্থ উদান বায়ু স্পন্দিত হইয়া কণ্ঠদেশ দিয়া বহির্গত হইলে যে শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহাকেই বর্ণ কহে। বর্ণসমূহ উচ্চারণ করিতে উদান বায়ু উত্থিত হইয়া নাভিদেশ, হৃদয় বা মূর্দ্ধা হইতে পৃথক্ পৃথক্ স্বর উৎপাদন করে। মূলাধারস্থিত বর্ণসকলের বহিরাবির্ভাবের নামই উচ্চারণ। মনের ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য যে সকল বর্ণ সংযোজিত হয়, তাহাই ভাষা। গুণভেদে বর্ণ, স্বর ও ভাষার বিভিন্নতা হইয়া থাকে। পশুপক্ষী প্রভৃতির ভাষা আছে, তাহা আমরা শুনিতে পাই, কিন্তু বুঝিতে পারি না। যেমন পশুপক্ষীগণের এক জাতির শব্দ হইতে অপর জাতির শব্দের বিভিন্নতা অনুভূত হয়, সেইরূপ মনুষ্যগণের মধ্যেও গুণানুযায়ী চতুর্ব্বর্ণভেদে বর্ণ, স্বর ও ভাষার পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারা যায়। জলবায়ুর পার্থক্য অর্থাৎ শৈত্য ও উষ্ণতা-জনিত অবস্থায় মনুষ্যের বাগ্‌যন্ত্রের বা বাগ্‌যন্ত্রসকলের উচ্চারণশক্তির প্রভেদ বেশ বুঝিতে পারা যায়। স্থানভেদে গুণভেদ হয়, সুতরাং স্থানভেদবশতঃ ভাষাদিরও তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়, এই জন্য একস্থানের লোকের বর্ণ স্বর ও ভাষার সহিত অন্য স্থানের লোকের বর্ণাদি এক নহে। অধুনা চতুর্ব্বর্ণের বিভিন্নতা বিশুদ্ধভাবে না থাকায় এবং একস্থানের লোক অপর স্থানে যাতায়াত বা স্থায়ীরূপে বাস করায় ও রাজশক্তিতে রাজার ভাষা প্রচলিত হওয়ায়, পৃথক্ পৃথক্ স্থানে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সঙ্কর ভাষার উৎপত্তি হইয়া, উহা সেই সেই স্থানের লোকের ভাষা হইয়াছে। একই স্থানের অধিবাসিগণের মধ্যেও ভিন্ন

ভিন্ন গুণাবলম্বী মনুষ্যগণের বর্ণ, স্বর ও ভাষার তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাকালে আর্য্যগণের মধ্যে চতুর্ব্বর্ণের যে প্রকার বিশুদ্ধতা ছিল,এখন যদিও সেইরূপ না থাকায় পৃথক্ পৃথক্ বর্ণের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাষা নাই, তথাপি তাহাদের মধ্যে বর্ণবিভাগের আভাসমাত্র আছে বলিয়া, উচ্চ জাতীয়ের হইতে নীচ জাতীয়ের ভাষা এবং উচ্চারণাদির কিঞ্চিৎ পার্থক্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

বাগ্‌যন্ত্রের যে স্থানে যে ভাবে স্পন্দিত হইয়া যে সকল বর্ণ উচ্চারিত হয়, উদান বায়ু যে স্থান হইতে উত্থিত হইয়া যতক্ষণ যে ভাবে কম্পিত হইয়া যে স্বর উৎপন্ন করে এবং বর্ণসমূহ যে প্রকারে সংযোজিত ও যে স্বরে উচ্চারিত হইয়া মনের ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য যে ভাষার সৃষ্টি করে, সেই সমস্ত যে প্রকার গুণের বৃদ্ধি করে, সেই গুণাবলম্বীর ঐ সকল স্বাভাবিক বর্ণ, স্বর ও ভাষা। বেদের শব্দসকল এমন ভাবে প্রযুক্ত ও সংযুক্ত হইয়াছে যে, ঐ সমস্ত প্রকৃতরূপে উচ্চারিত হইতে হইতে ক্রমে ক্রমে প্রাণবায়ু স্থির হইয়া আইসে, মন নিশ্চল হয় এবং সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহাদের উচ্চারণে প্রাণায়ামাদি সহজে সাধিত হয় এবং নিয়মমত এই সমস্ত ক্রমাগত অভ্যাস ও চিন্তা করিতে করিতে মানুষ সমাধিস্থ হইতে পারে। ইহাই সত্ত্বগুণাবলম্বীর ভাষা, ইহাই প্রকৃত দেবভাষা এবং উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণের উপযোগিনী ভাষা। তমোগুণাবলম্বীর পক্ষে ইহা উপযোগী নহে, তাহারা ইহা অভ্যাস ও চিন্তা করিতে পারা দূরে থাকুক, উচ্চারণ করিতেও সমর্থ হয় না; যদিও ইহার কতকগুলি বাক্য অনুকরণকারী পক্ষীর ন্যায় উচ্চারণ করিতেও তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সমর্থ হয়, কিন্তু পক্ষী যেমন মানুষের কথা বলিতে শিখিয়া মানুষ হইতে পারে না, সেইরূপ ঐ তমোগুণাবলম্বীও ঐ সকল বাক্য উচ্চারণের দ্বারা একবারে সত্ত্বগুণাবলম্বী হইতে, কিংবা কোন প্রকার উন্নতিলাভ করিতে পারে না;

বরং ইহাতে তাহার বৃথা সময় নষ্ট এবং অন্যান্য নানাকারণে অনিষ্টোৎপত্তি হইয়া থাকে। শূদ্রের পক্ষে বেদপাঠ শাস্ত্রকারগণ যে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন, তাহার অন্যান্য কারণের মধ্যে বোধ হয় ইহাও একটি কারণ। যাহাদের বাগ্‌যন্ত্র এ প্রকারে গঠিত যে, ইহা বেদের শব্দসকল উচ্চারণ করিতে অক্ষম এবং ঐ সকল উচ্চারণের উপযোগী শ্বাসপ্রশ্বাস রীতিমত সংযম বা চালনা করিতে যাহারা সক্ষম নহে, তাহারা যদি ঐ প্রকার করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে শারীরিক অনিষ্টও হইতে পারে; কারণ ঐ প্রকার উচ্চারণ করিতে গেলে হয় ত বাগ্‌যন্ত্রের কোন স্নায়ু বা গ্রন্থি ছিন্ন হইবার এবং অন্তরস্থ বায়ু অনিয়মিতভাবে চালিত হইয়া কোথাও নিরুদ্ধ হইয়া কোন প্রকার পীড়া জন্মিবার আশঙ্কা থাকে; অনধিকারীর পক্ষে বেদপাঠনিষেধের ইহাও বোধ হয় আর একটি কারণ।

শাস্ত্রকারগণ নিঃস্বার্থভাবে মনুষ্যজাতির মঙ্গলকামনায় তাঁহাদের বিশুদ্ধচিত্তে প্রতিবিম্বিত যে সকল সুদূর চিন্তাপ্রসূত নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সাধারণ ব্যক্তিগণ কি প্রকারে তৎসমুদয়ের উপযোগীতা বুঝিতে পারিবে? প্রাক্তন পুণ্যবলে যাঁহারা সত্ত্বগুণের আধিক্য লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহারা বাল্যাবস্থা উত্তীর্ণ হইলে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনকরতঃ সংযমী হইয়া গুরুর নিকট থাকিয়া তাঁহার দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া যে বেদ উচ্চারণ করিতেন, যাহার আলোচনা করিতেন এবং যাহা নির্জ্জনে বিধিপূর্ব্বক অভ্যাস করিতে করিতে যাঁহাদের ইন্দ্রিয়গণ স্থির হইয়া অন্তর্মুখীন হইত ও মন আনন্দরসে আপ্লুত হইত, তাঁহারা বেদোপদিষ্ট যে সকল তত্ত্বের মর্ম্মগ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তমোগুণাবলম্বী ব্যক্তিগণ কি সেই সমস্ত বুঝিতে সমর্থ হইতে পারে? অধিক কি, উহার শব্দসকল রীতিমত উচ্চারণ করাও কি তাহাদের পক্ষে কঠিন নহে? আশৈশব আসুরিক

ব্যাপারে লিপ্ত, অসংযতচিত্ত, মোহপ্রমাদে অভিভূত, ঘোরতর তামসিক ব্যক্তি কেবলমাত্র বেদের বাহ্য আবরণ স্পর্শ করিতে পারে, কিন্তু তাহাতে তাহার কোনই উপকার হয় না, বরং অনিষ্টই হইয়া থাকে। তাহারা ঐ সম্বন্ধে অপরকে উপদেশ দিতে চেষ্টা করিলে, নিজ বিকৃত-বুদ্ধির অনুকূল ও উপযোগী উপদেশই দিয়া থাকে। বেদনিহিত গভীর-তত্ত্বের উজ্জল কিরণ পূর্ব্বে যে সকল সত্ত্বগুণাবলম্বীর বিশুদ্ধ স্বচ্ছ হৃদয়ে প্রতিভাত হইয়া দিগ্‌দিগন্ত আলোকিত করিয়াছিল, হায়! আজ সে আলোক কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে!

যাহারা সত্ত্বরজোগুণাবলম্বী বা রজস্তমোগুণাবলম্বী তাহাদের পক্ষে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য হইলেও যতটুকু তাহার উপযোগী ততটুকু করাই উচিত, এই জন্যই বেদাধ্যয়ন যদিও ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয়, কিন্তু তাহাদের অধিক পরিমাণে সত্ত্বগুণ না থাকায় তাহারা তত্ত্বজ্ঞ হইতে সক্ষম হয় না, সুতরাং অধ্যাপনা তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ।

জন্তুদের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই যে, অশ্বের হইতে গর্দ্দভের স্বরের বিশেষরূপ পার্থক্য আছে, কিন্তু উভয়ের সংমিশ্রণে যে অশ্বতরের উৎপত্তি হয়, তাহার স্বরের, উভয়ের সহিত কিয়ৎপরিমাণে সাদৃশ্য থাকিলেও, ইহাদের হইতে স্বতন্ত্র। সেইরূপ উৎকৃষ্ট গুণের অর্থাৎ উচ্চবর্ণের ব্যক্তির স্বর হইতে নিকৃষ্ট বর্ণীয় ব্যক্তির স্বর পৃথক্ হওয়ার সম্ভাবনা এবং তাহাদের সংমিশ্রণে জাত সঙ্করবর্ণের স্বর ইহাদের উভয়ের হইতেই কিয়ৎ পরিমাণে স্বতন্ত্র হইয়া থাকে।

সংস্কৃত ভাষা সত্ত্বগুণের ভাষা এবং আধুনিক ভারতীয় ভাষার মধ্যে সংস্কৃতমূলক ভাষাসমূহ রজঃসত্ত্বগুণের ভাষা বলিয়া বোধ হয়; নানা-কারণবশতঃ ভারতের লোকসমূহ যে ভাষা শিক্ষা করিতে ব্যগ্র এবং যাহা শিক্ষা করিতে পারিলে তাহারা আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেছে, সেই

ইংরাজীভাষা রজোগুণের সহিত তমোগুণের আধিক্যযুক্ত সঙ্করভাষা বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহার বর্ণ, উচ্চারণ এবং বর্ণসমূহের সংযোজন, এই সমস্ত প্রণিধান করিয়া দেখিলে বোধ হয়, যেন সমস্তই চঞ্চলতাময়, অতি শীঘ্র শীঘ্র যাহা উচ্চারিত হয় সেই শব্দই অধিক এবং ঐ সমস্ত উচ্চারণকালে অতি দ্রুতবেগে শ্বাসপ্রশ্বাসাদি প্রবাহিত হইতে থাকে ও উচ্চারণ করিবার উপযোগী বায়ু কণ্ঠদেশের ঊর্দ্ধভাগ হইতে উত্থিত হইয়াই যেন ব্যস্ততাসহকারে বহির্গত হইয়া যায়, আবার তৎক্ষণাৎ পুনরায় প্রবেশ করে এবং এই প্রকারে শ্বাসপ্রশ্বাস যেন শীঘ্রই অবসন্ন হইয়া পড়ে। যাহা হউক এ স্থলে ভাষার গুণভেদসম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করা সম্ভবপর নহে এবং তাহা উদ্দেশ্যও নহে।

পাণি ও পাদেন্দ্রিয় ও তাহাদের কর্ম্ম।

আদান ও প্রদান পাণীন্দ্রিয়ের এবং গমন পাদেন্দ্রিয়ের কার্য্য। যখন যে গুণের আধিক্য হয়, তখন তদনুযায়ী হস্ত ও পদ নির্দ্দিষ্টরূপে স্বভাবতঃ স্থাপিত হইয়া থাকে এবং ঐ রূপ ভাবে উহারা সন্নিবেশিত হইলে তদুপযোগী গুণের বৃদ্ধি হয়। যেমন, কোন সময়ে তমোগুণের আধিক্য হইয়াছে, তখন মানুষ স্বভাবতই হস্তপদাদি স্থির করিয়া শয়ন করিয়া থাকে এবং তাহাতেই সে প্রীতিবোধ করে, সে সময়ে দণ্ডায়মান থাকিতে, অথবা দ্রুতপদে গমন করিতে, কিংবা বেগে হস্তপরিচালনা করিতে, তাহার ইচ্ছা হয় না। আবার কোন সময়ে নিদ্রা আসিতেছে না, তখন নিশ্চলভাবে শয়ন করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলে, তমোগুণ বর্দ্ধিত হইয়া সহজেই নিদ্রাকর্ষণ হইয়া থাকে। বেগে গমন বা হস্তসঞ্চালন রজোগুণাধিক্যের অবস্থা, তমোগুণ ঐ সময়ে

ক্ষীণভাবাপন্ন হয়, সুতরাং নিদ্রা আসিতে পারে না, এবং ঐ অবস্থায় সত্বগুণও দুর্ব্বল হয়, সুতরাং মন একটি বিষয়ের অধিকক্ষণ গভীর ভাবে চিন্তা করিতে সক্ষম হয় না, যেমন একটি চিন্তার উদয় হয় অমনি পরক্ষণেই তাহার অবসান হইয়া আর একটি আসিয়া উপস্থিত হয়, এইরূপে এক একটি করিয়া ক্ষণে ক্ষণে উৎপন্ন ও লয়প্রাপ্ত হয়। যদি কেহ ক্লিষ্ট বা নিদ্রাতুর হয়, অর্থাৎ তাহার তমোগুণ অতীব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তখন সে বেগে গমন করিতে সক্ষম হয় না, ঐ প্রকার যাইতে বাধ্য হইলেও ক্রমশঃ তাহার গতি মন্দীভূত হইয়া আইসে এবং সুবিধা পাইলে সে উপবেশন বা শয়ন করে। এইরূপ ক্ষণিক সত্বগুণের বৃদ্ধিবশতঃ মনে কোন একটি চিন্তার উদয় হইলে, হয় ত সে তখনই স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হয়, অথবা সুযোগ পাইলে বসিয়া পড়ে এবং হস্তপদাদি নিশ্চল করিয়া রাখে। দণ্ডায়মান থাকিলে, অথবা পদদ্বয় লম্বমান করিয়া অর্দ্ধদণ্ডায়মানভাবে কোন উচ্চাসনে উপবেশন করিলে, তমোগুণ সহজে মানুষকে অভিভূত করিতে পারে না এবং এই প্রকার অবস্থা সত্বগুণেরও বিশেষ উপযোগী নহে। ইহাতে রজোগুণ বৃদ্ধি করে এবং রজোগুণের আধিক্য হইলে ঐরূপ ভাবে থাকিতে প্রীতিবোধ হয়। পদদ্বয় পরস্পর গুণ্ঠন করিয়া হস্তদ্বয়কে নির্দ্দিষ্টরূপে রাখিয়া স্থির ও সরল-ভাবে উপবেশন করিয়া থাকিলে সত্বগুণের বৃদ্ধি হয়, সুতরাং ঐ অবস্থায় একাগ্রভাবে গভীর চিন্তায় মনকে নিবিষ্ট করিতে পারা যায়। এই সকল কারণবশতঃই অধিকার ও সময়ভেদে নানা প্রকার ভাবে হস্ত ও পদের অবস্থান বা সঞ্চালনের বিধি ও নিষেধ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইউরোপবাসীদিগের গমন, উপবেশন ও আসনাদির পদ্ধতি রজোগুণবর্দ্ধিনী এবং তাহাদের কর্ম্মশীলতার ও চঞ্চলতার পরিচায়িকা। আর্য্যশাস্ত্রসম্মতআসনপদ্ধতি সত্বগুণপরিবর্দ্ধিকা এবং ধ্যানধারণাদির উপযোগিনী। এতৎসম্বন্ধে পরে আরও বিশেষরূপে বলা হইবে।

সঙ্গ ও সঙ্গী।

যে সকল ব্যক্তির সহিত একত্র অবস্থান করা যায়, তাহারা যদি উৎকৃষ্ট গুণযুক্ত বা সমগুণাবলম্বী হয়, তাহা হইলে উৎকর্ষ অথবা স্বকীয় গুণে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারা যায়, নতুবা নিকৃষ্টের সংসর্গে অধোগতি হয়। সঙ্গীগণকে সর্ব্বদা দর্শন ও স্পর্শন করা যায় ও তাহাদের ব্যবহার, আচরণ, চরিত্রাদির অনুকরণ করিতে স্বভাবতঃ ইচ্ছা হয় বলিয়া এবং তাহাদের সহিত একত্র বাস করার জন্য অন্যান্য নানা প্রকারে নিজগুণের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে; সেইজন্য অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গ করিবার জন্য শাস্ত্র উপদেশ দিয়াছে। চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে উচ্চ বর্ণের ব্যক্তিকে নীচবর্ণের সংসর্গ যতদূর সম্ভব ত্যাগ করিবার জন্য শাস্ত্র যে নিষেধ করিয়াছে, তাহারও ইহাই কারণ। নিকৃষ্ট গুণাবলম্বীকে অধম ভাবিয়া এবং আপনাকে উৎকৃষ্ট জ্ঞান করিয়া মনে অহঙ্কার জন্মিলে, উহা অপেক্ষা অধিকতর পতন হইয়া থাকে; তাহাকে অধম বা ঘৃণিত মনে করিয়া নহে, তাহার কার্য্যকে ঘৃণা করিয়া ও তাহার সহিত একত্র অবস্থান করা উপযোগী নহে এবং শাস্ত্রে নিষেধ আছে, ইহা ভাবিয়াই, তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিতে হয়। যাহাতে মনে অহঙ্কারের উদয় না হয়, তজ্জন্য শাস্ত্রকারেরা বিশেষরূপে সাবধান করিয়া দিয়া তাহার প্রতিবিধান করিয়া গিয়াছেন।

ঐ প্রকার সঙ্গত্যাগের বিধানেও কেহ কেহ আর্য্যশাস্ত্রকারগণের সমদৃষ্টির অভাব ও স্বার্থ অনুভব করিয়া আতঙ্ক পাইয়া থাকে। প্রকৃত সমদৃষ্টি কি, পরার্থপরতা কি, নিঃস্বার্থতা কি, তাহা তাঁহারা যেরূপ জানিতেন, অপর কেহ কখন সেরূপ জানিয়াছে বা জানিবে কিনা সন্দেহ। অন্যদেশীয় নীতিপ্রচারকেরা এবং তাঁহাদের অনুকরণ করিয়া আধুনিক ভারতীয় নীতিকারগণ যেজন্য ধূর্ত্ত, শঠ, চোর, লম্পট, নিষ্ঠুরাদির

সঙ্গ ত্যাগ করিতে বলেন, আর্য্য শাস্ত্রকারগণও তাহাই বলিয়াছেন এবং কৌশলক্রমে উহার প্রতিবিধানের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে উচ্চ হইতে নীচ পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর মধ্যে এক একটি করিয়া ঐ প্রকারের লোক বাছিয়া লওয়া যেমন কঠিন, পুরাকালে আর্য্যগণের মধ্যে তেমন ছিল না। তখন তাহাদের মধ্যে বর্ণবিভাগের বিশুদ্ধি সতর্কতার সহিত রক্ষিত হইত, সুতরাং উপরিউক্ত-রূপ নিকৃষ্ট ব্যক্তি শূদ্রবর্ণ ব্যতীত সত্ত্বগুণবহুল বর্ণেতে থাকার সম্ভাবনা কম ছিল, সেই জন্য ব্রাহ্মণকে একবারে শূদ্রবর্ণের সংসর্গ ত্যাগ করিতে তাঁহারা আদেশ করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে তদ্রূপ বিশুদ্ধ বর্ণবিভাগের দৃঢ়বন্ধন নাই, সেই জন্য অধুনা দেখিতে পাই, উচ্চকুলে কুলাঙ্গারস্বরূপ জন্মিয়া এবং যতপ্রকার দুষ্কর্ম্ম আছে তাহা করিয়া, কত শত নরপিশাচ সমাজমধ্যে স্বচ্ছন্দভাবে বিচরণ করিতেছে, এবং উৎকৃষ্টতম বর্ণ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ঐ প্রকার ব্যক্তিগণত, অপর যে বর্ণের যে কেহ হউক, তাহারই সঙ্গলাভে পবিত্র হইবে, সুতরাং তাহাদের আর অপবিত্রতার ভয় কি? তাহারা যাহাতে অপরকে ঐ প্রকারে কলুষিত করিতে না পারে, তাহারই চেষ্টা করিতে হয়; তাহাদের সম্বন্ধে আধুনিক দণ্ডবিধি অনুযায়ী বিচারালয়ের শাসন হয়ত কাহারও প্রতি প্রযোজ্য নহে, অথবা কাহারও পক্ষে প্রচুর নহে, যাহাতে সমাজের শাসন দৃঢ় হয়, তাহারই উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। যদিও আর্য্য সমাজের অস্থিচর্ম্মসার হইয়াছে, তথাপি এখনও জীবন আছে, ইহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করা উচিত নহে, ঔষধপ্রদানে ইহাতে শক্তিসঞ্চার করিয়া যাহাতে ইহার পুষ্টিসাধন হয়, তাহারই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

———

স্থানভেদে গুণভেদ।

দেখিতে পাওয়া যায়. কোন স্থানে কেবলই আলস্য বোধ হয় ও নিদ্রাতন্দ্রাদির আধিক্য অনুভব হয়, সুতরাং তথাকার অধিবাসিগণও অলসভাবাপন্ন ও শ্রমবিমুখ। কোথাও গেলে অধিকক্ষণ স্থির হইয়া থাকিতে প্রীতি বোধ হয় না, আপনা হইতেই যেন চঞ্চলতা বা কর্ম্ম-স্পৃহা আসিয়া পড়ে, সুতরাং তথাকার মানুষও যেন সর্ব্বদাই চঞ্চল; আবার কোন স্থানে গেলে মন প্রসন্ন, স্থির ও শান্তভাবাপন্ন হয়। মনুষ্যগণ কোথাও পুরুষানুক্রমে বাস করিয়া তমোগুণাধিক হইয়া প্রায়ই পাপকার্য্যে লিপ্ত হয়; আবার কোন স্থানের অধিবাসিগণের মানসিক বৃত্তি অন্য প্রকার হইয়া থাকে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, স্থানভেদে গুণের তারতম্য হইয়া থাকে এবং পৃথক্ পৃথক্ স্থান স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গুণের আধিক্য বা হ্রাসের সহায়তা করে; কিন্তু তাই বলিয়া যে, কেহ কোন স্থানে কিছুকালের জন্য অথবা জন্মাবধি আমরণ বাস করিলে, একবারে যে সেই স্থানের উপযোগী গুণবহুল হইবে, তাহা নহে। যে নিকৃষ্ট গুণাবলম্বী সে সত্ত্বগুণবৃদ্ধিকারক স্থানে থাকিলে যে একবারে সত্ত্বগুণবহুল সাধুপুরুষ হইবে, অথবা সত্ত্বগুণাবলম্বী ব্যক্তি নিকৃষ্ট স্থানে থাকিলে যে একবারে পশুবৎ হইবে, তাহা নহে। নির্জ্জন অরণ্য সত্ত্বগুণবহুল ঋষিগণের উপযোগী স্থান, কিন্তু সেই জন্যই যে তমোগুণাবলম্বী রাক্ষসভাবাপন্ন ব্যক্তি ঐ স্থানে থাকিতে পারে না বা থাকিয়া ঋষিপ্রকৃতি হয়, তাহা নহে। কোন উৎকৃষ্ট গুণাবলম্বী ব্যক্তি নিকৃষ্ট গুণের স্থানে থাকিলে, তাহার উৎকর্ষলাভের পক্ষে ব্যাঘাত জন্মে এবং নিকৃষ্ট গুণাবলম্বীর উৎকৃষ্ট স্থানে বাস উন্নতিলাভে সহায়তা করে; এই জন্যই যাহার যে গুণ অধিক সে যাহাতে ক্রমশঃ উৎকর্ষলাভ করিতে পারে, তাহার তদুপযোগী স্থানে

সর্ব্বদা অথবা অন্ততঃ কিয়ৎকালের জন্যও বাস করিবার বিধান শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। তীর্থযাত্রার ও তীর্থবাসের প্রয়োজনীয়তার অনেক কারণ আছে, তন্মধ্যে ইহাও একটি কারণ।

যে ব্যক্তি যে প্রকার গুণাবলম্বী, তাহার সেই গুণের স্থানে থাকিতে প্রীতিবোধ হয়, কিন্তু তাহার উৎকর্ষসাধনের জন্য উৎকৃষ্ট গুণের স্থানে তাহার উপযোগিতানুযায়ী অবস্থান করা কর্ত্তব্য। উৎকৃষ্ট স্থানে উৎকৃষ্ট গুণাধিক ব্যক্তির সহিত এবং নিকৃষ্ট স্থানে নিকৃষ্টগুণাবলম্বীর সংসর্গে আসিয়া প্রায়ই তাহাদের গুণ পাইয়া থাকে, সুতরাং ইহাতেও গুণের পরিবর্ত্তন হয় বলিয়া প্রথমোক্ত স্থানে যাওয়ার এবং শেষোক্ত স্থান ত্যাগ করার আরও একটি প্রধান কারণ। যদি কোন স্থান কাহারও সমগুণের হয় এবং তথাকার কতকগুলি মনুষ্য যদি প্রায়ই সমগুণাবলম্বী হয়, তাহার পক্ষে তথায় যাওয়ার কোন বাধা নাই, শাস্ত্রকারগণ সেই জন্যই সত্ত্বগুণাবলম্বীর পক্ষে নিকৃষ্ট গুণের স্থানে যাওয়া নিষেধ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু রজঃ বা তমোগুণবহুল ব্যক্তিকে তাহার সমান বা উৎকৃষ্ট গুণের স্থানে যাইতে নিষেধ করেন নাই। শূদ্রবর্ণীয় ব্যক্তি পৃথিবীর যে কোন স্থানে, কিংবা সেখানকার যে কোন মনুষ্যের সহিত, অল্প বা অধিক কাল একত্র অবস্থান করুক, তাহাতে তাহার বিশেষ কোন ক্ষতি হইবে না ; কিন্তু সত্ত্বগুণাবলম্বী ব্যক্তি নিকৃষ্টগুণবৃদ্ধিকারক কোন স্থানে গেলে, বা তথাকার অধিবাসিগণের সহিত একত্র অবস্থান করিলে, তাহার গুণের অপকর্ষ হওয়ার সম্ভাবনা, সুতরাং সত্ত্বগুণবহুল উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ তথায় অধিক কাল বাস করিলে, তাহার ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হইতে পারে। অন্য দ্বিজাতিগণেরও সাধ্যমত সত্ত্ব বা রজোবহুল স্থানে স্থায়ীরূপে বাস করা কর্ত্তব্য, কিন্তু প্রয়োজনবশতঃ তাহারা কিয়ৎকালের জন্য নিকৃষ্ট গুণের স্থানে গেলে, তত ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। ক্ষত্রিয় অপর দেশ শাসন বা জয় করিবার জন্য, অথবা যুদ্ধবিগ্রহাদিবশতঃ, কিংবা

ক্ষত্রিয়োপযোগী বিদ্যালাভের উদ্দেশ্যে, এবং বৈশ্য বাণিজ্যোপলক্ষে অথবা তাহার উপযোগী বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে তমোগুণের দেশে কিছুকালের জন্য গেলে, তাহাদের বিশেষ ক্ষতি হয় না (১)।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বিভিন্ন দেশে বাসের দ্বারা অথবা তন্নিবন্ধন কেবল শরীরের বর্ণ বা আকৃতির পার্থক্যবশতঃ আর্য্যশাস্ত্রকারগণ মনুষ্যগণের শ্রেণীবিভাগ করেন নাই, তাঁহারা কেবলমাত্র বাহ্য পার্থক্যে নির্ভর না করিয়া মনুষ্যচরিত্রের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত পরিদর্শনকরতঃ উচ্চ বৈজ্ঞানিক প্রথাতে বিশাল বিভাগকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। প্রত্যেক দেশ ত্রিগুণের মধ্যে কোন কোন গুণের বৃদ্ধি বা হ্রাসের সহায়তা করে মাত্র, কিন্তু তাহাই বলিয়া এক স্থানের অধিবাসী সকলেই যে একই প্রকার গুণবিশিষ্ট অর্থাৎ চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে একই বর্ণভুক্ত হইবে তাহা নহে, সকল দেশেই চতুর্ব্বর্ণ থাকিতে পারে; কিন্তু কোন কোন দেশে কোন কোন গুণের আধিক্য হওয়ায় কোন কোন বর্ণ উৎকৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা।

ভারতের কয়েকটি প্রদেশে অন্যান্য সকল দেশ অপেক্ষা সাধারণতঃ অধিক পরিমাণে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয়, এই জন্য শাস্ত্রে ঐসকল স্থান পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপে পরিগণিত হইয়াছে (২)।

---

(১) এতান্ দ্বিজাতয়ো দেশান্ সংশ্রয়েরন্ প্রযত্নতঃ।
শূদ্রস্তু যস্মিন্ কস্মিন্ বা নিবসেদ্বৃত্তিকর্ষিতঃ॥
মনু, ২।২৪। (মেধাতিথিকৃতটীকাপি দ্রষ্টব্যা)।

প্রযত্ন সহকারে এই সমুদায় দেশ (আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্গত দেশসমূহ) আশ্রয় করা দ্বিজাতিগণের কর্ত্তব্য। কিন্তু শূদ্রগণ জীবিকাকৃষ্ট হইয়া যে কোন দেশে বসতি করিতে পারে।

(২) ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রদেশ পৃথিবীর মধ্যে সকল দেশ অপেক্ষা সত্ত্বগুণবর্দ্ধক। সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্ত্তী দেশকে পুরাকালে ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশ বলিত। ঐ উভয় নদীই

ভারতের ঐ সকল স্থান ব্যতীত সত্ত্বগুণবৃদ্ধিকারক এবং উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণোপযোগী বিদ্যালাভের স্থান আর নাই, সুতরাং ঐ প্রয়োজন-সাধনের জন্য তাহাদের অপর কোন স্থানে যাওয়ার আবশ্যক নাই। জীবিকার্জ্জন বা অন্য কোন প্রয়োজনবশতঃ তাহারা রজঃ বা তমোগুণবহুল স্থানে বাস করিলে স্থানের দোষে এবং নিকৃষ্ট সংসর্গে ও ম্লেচ্ছোপযোগী আহারব্যবহারে তাহাদের ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হইতে পারে, এই জন্যই ম্লেচ্ছদেশে তাহাদের যাওয়া নিষিদ্ধ, কিন্তু ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কোন দ্বিজাতি উপরি উক্ত কোন প্রয়োজনবশতঃ ঐ প্রকার কোন স্থানে গেলে বা কিয়ৎকালের জন্য বাস করিলে, যদিও সংসর্গাদি দোষে তাহার অবনতি হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু তাহাদের পক্ষে ব্রাহ্মণের ন্যায় তত দূষণীয় নহে। ঐ প্রকার স্থানে যাওয়াতে যে ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়ত্ব বা বৈশ্যের বৈশ্যত্ব একবারে নষ্ট হয়, তাহা বোধ হয় না, কিন্তু তমোগুণবর্দ্ধক ম্লেচ্ছোপযোগী আহারাদি হইতে সতর্ক থাকা তাহাদের পক্ষে কর্ত্তব্য। শরীরী জীবের শরীরমাত্রই ভুক্ত দ্রব্যের পরিণামে গঠিত, বর্দ্ধিত বা ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। খাদ্য দ্রব্যের উপকারিতা, উপযোগিতা বা পুষ্টিকারিতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই ও দ্রব্যের গুণ দোষ বিচার করিয়াই শাস্ত্রকারগণ বিভিন্নধর্ম্মী বিশিষ্টকর্ম্মী ব্যক্তিদিগের জন্য পৃথক্ পৃথক্ আহার্য্য ব্যবস্থা করিয়াছেন। এ বিষয় পূর্ব্বে সবিশেষ বলা হইয়াছে। স্পর্শদোষে গুণের তারতম্য ব্যতীত নানাবিধ

একণে অন্তর্ধান হইয়াছে। সম্ভবত পঞ্জাব দেশকে ব্রহ্মাবর্ত্ত বলিত। ঐ স্থানের দ্বিজগণ সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপে পরিগণিত হইত। আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্গত অন্যান্য দেশও সত্ত্বগুণবৃদ্ধিকারক ছিল, কিন্তু ব্রহ্মাবর্ত্তের ন্যায় নহে। পূর্ব্ব ও পশ্চিমে সমুদ্রদ্বয় এবং উত্তর ও দক্ষিণে হিমালয় ও বিন্ধ্যাগিরি, ইহাদের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে আর্য্যাবর্ত্ত বলিত। আধুনিক পারস্ত, আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তান দেশও ইহার অন্তর্গত ছিল ইহাই অনুমিত হয়।

মনু, ২।১৭—২২।

পীড়ারও উৎপত্তি হইয়া থাকে, এ বিষয়ও আর্য্য শাস্ত্রকার সবিশেষ জানিতেন ও বুঝিতেন এবং প্রকৃতপক্ষে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিই নিঃশ্রেয়সলাভের পক্ষে সম্যক্ উপযোগী বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, সুতরাং সংসর্গ গ্রহণ ও পরিহার বিষয়ে তাঁহারা স্বতঃ পরতঃ সাবধান থাকিবার জন্য বিবিধ ভাবে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

কালভেদে গুণভেদ।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, ক্রমাগত প্রতিক্ষণেই সকলেরই গুণের তারতম্য হইয়া থাকে। ঐ ক্ষণিক গুণপরিবর্ত্তন সময়ের উপর অনেকটা নির্ভর করে। সময়ানুযায়ী ত্রিগুণের যে ক্ষণিক পরিবর্ত্তন হয়, তাহার বিষয় সমষ্টিভাবে আলোচনা করিলে, সাধারণতঃ দিবাভাগে রজোগুণ ও রাত্রিকালে তমোগুণ বিশেষ বর্দ্ধিত হয়, তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায়। দিবা ও রাত্রিকে কয়েকটি স্থূলভাগে বিভক্ত করিয়া সাধারণতঃ জীবগণের কার্য্য দেখিয়া বিচার করিলে, পৃথক্ পৃথক্ ভাগে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গুণের প্রাধান্য হয়, তাহাও কতকটা বুঝিতে পারা যায়। রাত্রি ও দিবসকে আট আট ভাগে বিভাগ করিলে, রাত্রির শেষভাগে এবং দিবসের প্রথমভাগে, অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের কিছু পূর্ব্ব হইতে ইহার পরে কিছুকাল পর্য্যন্ত, শরীর ও মন জড়তাবিহীন হইয়া প্রসন্ন ও স্থির হয় এবং ইন্দ্রিয়গণ শান্ত অবস্থায় থাকে, ইহা অনেকটা উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

অহোরাত্রের উপরিউক্তরূপ পৃথক্ পৃথক্ ভাগে যে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গুণের প্রাধান্য হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আর্য্যশাস্ত্রকারগণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে

পৃথক্ পৃথক্ বর্ণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা অধিক পরিমাণে সত্ত্বগুণাবলম্বী, তাঁহারা জিতনিদ্র হইতে সক্ষম হন, সুতরাং তাঁহাদিগকে নিশীথকালেও তমোগুণ বিশেষ অভিভূত করিতে পারে না। যাহার যতই সত্ত্ব ও রজোগুণ কম, তাহার ততই নিদ্রা ও আলস্যের পরিমাণ অধিক। প্রাতঃ ও সায়ংকালে যখন স্বভাবতঃ সত্ত্বগুণের আধিক্য হইয়া থাকে, সে সময়ে ঈশ্বরচিন্তা, জপ, পূজা, ধারণা, ধ্যান প্রভৃতি সত্ত্বগুণের কার্য্য করা বিধেয়। যাহারা সত্ত্বগুণাধিক, তাহাদের উহা ব্যতীত অন্য সময়েও ঐ প্রকার কার্য্য করা উচিত, এবং তাহারা ঐরূপ করিতেও সক্ষম হয়; কিন্তু যাহাদের রজোগুণ প্রবল, তাহারা সত্ত্বগুণবর্দ্ধক সময়েই ঐ প্রকার কার্য্য করিতে সমর্থ হয়। শেষোক্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে সত্ত্বগুণের কার্য্য আচরণের সময় ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি করা এবং রজোগুণের কার্য্য ক্রমশঃ কম করা কর্ত্তব্য, ইহাই তাহাদের সাধনা। যাহারা তমোগুণাবলম্বী তাহারা অতি অল্পসময়ের জন্যও যদি সত্ত্বগুণের কোন কার্য্য করিতে সক্ষম হয়, তথাপি এই দুই সময় ব্যতীত অন্য সময়ে পারে না, এবং এইরূপ করিতে চেষ্টা করিলেও তাহাদের সময় বৃথা নষ্ট হয়। তাহারা যদি তমোগুণবর্দ্ধক কোন সময়ে নিবিষ্ট মনে কোন বিষয়ে চিন্তা করিতে বসে, তাহা হইলে নিদ্রা আলস্য প্রভৃতি আসিয়া তাহাদিগকে অভিভূত করে, এই জন্য বরং তাহাদের ঐ সময়ে রজোগুণবর্দ্ধক কার্য্য করাই উচিত, এবং সত্ত্বগুণবর্দ্ধক সময়ে ক্রমে ক্রমে অতি অল্প পরিমাণে সত্ত্বগুণের কার্য্য করিলে, তাহাদের উৎকর্ষ সাধিত হইয়া থাকে। প্রত্যূষে ও প্রদোষে এই উভয় সন্ধ্যাকালে কাহারই পক্ষে আহার নিদ্রা প্রভৃতি যে কার্য্যে তমোগুণ বর্দ্ধিত হয়, তাহা করা কর্ত্তব্য নহে, কারণ যে সময়ে সত্ত্বগুণ প্রবল হইবার সম্ভাবনা, সেই সময়ে কেহ ঐ প্রকারে তমোগুণের কার্য্য অধিক করিলে, সে অধিকতর তমোগুণাচ্ছন্ন

হইয়া থাকে (১)। ভ্রমণাদি যে সকল কার্য্য দ্বারা রজোগুণ বর্দ্ধিত হয় ঐ সময়ে দ্বিজগণের পক্ষে তাহাও করা কর্ত্তব্য নহে, শূদ্রগণের পক্ষে ঐ সময়ে ঐরূপ রজোগুণবর্দ্ধক কার্য্য কিয়ৎ পরিমাণে করা বিধেয় হইতে পারে, (২) কিন্তু এ প্রকার অতি ভ্রমণাদি করা উচিত নহে, যাহাতে ক্লান্তি জন্মিয়া অধিকতর তমোগুণ আসিয়া পড়ে।

সাধারণতঃ শুক্লপক্ষ অপেক্ষা কৃষ্ণপক্ষে তমোগুণ অধিক হইয়া থাকে। ঐ উভয় পক্ষের একাদশী হইতে সত্ত্বগুণ ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া পক্ষান্তে তমোগুণ অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং ক্রমে কম হইয়া পক্ষের মধ্যভাগে এই গুণ পুনরায় কিয়ৎ পরিমাণে প্রবল হয়, এই জন্য অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় তমোগুণের কার্য্য সাধ্যমত কম করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য এবং তমোগুণ দমন করিবার জন্য একাদশীতে সত্ত্ব-গুণের কার্য্য করা বিধেয়, নতুবা পক্ষান্তে তমোগুণ অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। শাস্ত্রকারগণ ঐ সমস্ত বিবেচনা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর পক্ষে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিধি ও নিষেধ করিয়া গিয়াছেন।

উত্তরায়ণ অপেক্ষা দক্ষিণায়নে স্বভাবতঃ তমোগুণ বর্দ্ধিত হয় (৩)। মাস সম্বন্ধে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া বিবেচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়

---

(১) एतानि पञ्च कर्म्माणि सन्ध्यायां वर्ज्जयेद् बुधः ।
आहारं मैथुनं निद्रां सम्पाठं गतिमध्वनि ॥
भावप्रकाश, पूर्व्वखण्ड, १म भाग, ४र्थ प्रकरण, २५७,२५८ ।

(২) মনু ৪।৫৫, ৬২।

(৩) ৭ই কিম্বা ৮ই পৌষ (21st December) হইতে ৭ই কিম্বা ৮ই আষাঢ় (21st July) পর্য্যন্ত এই ছয় মাস উত্তরায়ণ এবং অবশিষ্ট ছয় মাস দক্ষিণায়ন এতৎ সম্বন্ধে পূর্ব্বে বিশেষরূপে বলা হইয়াছে।

যে, প্রত্যেক মাসে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গুণের হ্রাস ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কোন কোন মাসে শরীর ও মন বেশ প্রসন্ন থাকে, কোন কোন মাসে চঞ্চল হয়, আবার কোন কোন মাসে জড়তা আলস্য প্রভৃতি স্বভাবতই অধিক হইয়া ইহাদিগকে অবসাদগ্রস্ত করে, তাহা আমরা অনুভব করিতে পারি। মাঘ ও ফাল্গুন মাসে জড়তা নষ্ট হইয়া সত্ত্বগুণ ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তৎপরে ক্রমশঃ রজোগুণ প্রবল হইতে হইতে জ্যৈষ্ঠমাসে ইহার সম্পূর্ণ আধিক্য হয়। ক্রমে রজোগুণ যতই মন্দীভূত হইতে থাকে, তমোগুণ ততই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, শ্রাবণ হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত শেষোক্ত গুণের অত্যন্ত আধিক্য হইয়া থাকে। ঐ প্রকার গুণপরিবর্ত্তনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শাস্ত্রকারগণ পৃথক্ পৃথক্ মাসে অধিকারিভেদে নানাপ্রকার বিধি ও নিষেধ করিয়াছেন এবং শেষোক্ত চারি মাসে যাহাতে অধিকতর তমোগুণ বর্দ্ধিত হইতে না পারে, তাহার প্রতিবিধানের জন্য পৃথক্ পৃথক্ গুণাবলম্বীর সামর্থ্যানুযায়ী কর্ত্তব্য কার্য্য নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন।

যেমন অল্প সময়ে গুণের পরিবর্ত্তন হয় তাহা দেখা গেল, এইরূপ বহুকাল ব্যবধানের মধ্যবর্ত্তী সময়ে গুণপরিবর্ত্তনের সমষ্টিতে এক একটি গুণের বৃদ্ধি বা হ্রাস হয়, তাহা অনুমান করিতে পারা যায়। বহু দূরবর্ত্তী দুইটি সময়ের মধ্যবর্ত্তী কালকে আর্য্যশাস্ত্রকারগণ চারিভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক ভাগকে যুগ নামে অভিহিত করিয়া এক একটি যুগে এক একটি গুণের প্রাধান্য হয়, তাহাই নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ঐ চারি যুগ ক্রমান্বয়ে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিনামে অভিহিত হইয়াছে। এইরূপ বহুযুগ অবসানে সমস্ত প্রকৃতি তমোগুণাচ্ছন্ন হইয়া প্রলয়রূপ রাত্রিতে নিদ্রায় অভিভূত হইয়া থাকে, প্রতিদিন নিদ্রান্তে প্রাতঃসন্ধ্যায় যেমন সত্ত্বগুণ বর্দ্ধিত হয়, এবং ক্রমে ক্রমে রজঃ ও তমোগুণ প্রবল হয়, সেইরূপ প্রলয়াবসানে ঐ চারি যুগে

সত্ত্বরজস্তমঃ, রজঃসত্ত্বতমঃ, রজস্তমঃসত্ত্ব এবং তমোরজঃসত্ত্ব এই প্রকারে ক্রমান্বয়ে গুণত্রয়ের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে; অর্থাৎ সত্যযুগে সত্ত্বগুণের, ত্রেতাতে রজঃ ও সত্ত্বগুণের, দ্বাপরে রজঃ ও তমোগুণের এবং কলিতে তমোগুণের প্রবলতা হইয়া থাকে (১)।

---

(১) সহজে বোধগম্য হইবে বলিয়া আর্য্যশাস্ত্রানুসারে কালের বিভাগ নিম্নে প্রদত্ত হইল, যথা:—

১৮ নিমেষ (চক্ষুর পলক)	=১ কাষ্ঠা।
৩০ কাষ্ঠা	=১ কলা।
১৫ কলা	=১ দণ্ড।
২ দণ্ড	=১ মুহূর্ত্ত।
৭॥ দণ্ড	=৩৸ মুহূর্ত্ত=১ যাম বা প্রহর।
৩০ মুহূর্ত্ত	=৮ প্রহর=১ অহোরাত্র।
১৫ অহোরাত্র	=১ পক্ষ।
২ পক্ষ	=১ মাস=পিতৃলোকের ১ অহোরাত্র
২ মাস	=১ ঋতু।
৩ ঋতু	=১ অয়ন।
২ অয়ন	=১ বৎসর=দেবতার ১ অহোরাত্র।
৩৬০ দৈব অহোরাত্র	=১ দৈব বর্ষ।
১২০০০ দৈব বর্ষ	=১ দৈব যুগ=মানুষের ৪ যুগ (সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি)।
কিঞ্চিদধিক ৭১ দৈব যুগ	=১ মন্বন্তর।
১৪ মন্বন্তর	=১ কল্প।
২ কল্প	=২০০০ দৈব যুগ=ব্রহ্মার ১ অহোরাত্র (দিবসে ভূতগণের স্থিতি এবং রাত্রিতে প্রলয়)।

মনু, ১।৬৪—৮০।

আনুষ্ঠানিক বা বৈদিক কর্ম্ম।

পূর্ব্বে স্বাভাবিক বা লৌকিক কর্ম্মের কথা বলিয়াছি, জীব স্বভাবতঃই ঐ সকল কর্ম্ম করিয়া থাকে, এবং উহা না করিয়া সে থাকিতে পারে না। ঐ সকল কর্ম্ম যাহার পক্ষে যে প্রকার উপযোগী, অর্থাৎ যাহাতে তাহাকে উৎকৃষ্ট গুণের দিকে লইয়া যাইতে পারে, তাহারই আচরণ কর্ত্তব্য, সেই সমস্তই তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এতদ্ব্যতীত ঐ সকল কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত কর্ম্ম আচরণ করিলে বিশেষরূপে চিত্তশুদ্ধি হয়, যাহাতে মানুষকে অধিকতর ভাবে উৎকর্ষের দিকে লইয়া যায়, সেই সকল কর্ম্ম করাও তাহার পক্ষে শ্রেয়ঃ; এই কারণবশতই শাস্ত্রে, যজ্ঞ, দান, তপস্যাদি অনুষ্ঠানের বিধান আছে। এই সকলকে আনুষ্ঠানিক বা বৈদিক কর্ম্ম বলে।

কলিযুগের স্থিতি ৪,৩২,০০১ বৎসর, দ্বাপর ত্রেতা ও সত্যযুগের ক্রমান্বয়ে ইহার দ্বিগুণ তিনগুণ ও চারিগুণ। কোন মহাপ্রলয়ের পরে এক সৃষ্টি হইতে পুনরায় সৃষ্টি পর্য্যন্ত দুই কল্প অতিবাহিত হয়। প্রত্যেক মন্বন্তরে প্রলয় হয়।

প্রত্যেক জাতিই একটি নির্দ্দিষ্ট সময় স্থির করিয়া বৎসর গণনা করিয়া থাকে। কয়েকটি প্রাচীন জাতির বর্ত্তমান যুগ (Epoch or era) কোন্ সময়ে আরম্ভ হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

আর্য্যশাস্ত্রানুসারে বর্ত্তমান যুগ (কলিযুগ) আরম্ভ, চলিত বৎসর হইতে ৫০০১ বৎসর পূর্ব্বে (3101 B. C.) মাঘী পূর্ণিমা শুক্রবার।

Grecian Mundane—1st September, 5598 B. C.
Civil era of Constantinople—1st September, 5508 B. C.
Alexandrian era—29th August, 5502 B. C.
Ecclesiastical era of Antioch—1st September, 5492 B. C.
Julian period—1st June, 4713 B. C.
Mundane era—October, 4008 B. C.
Jewish Mundane era—October, 3761 B. C.

উপরি উক্ত যজ্ঞাদি প্রত্যেক আনুষ্ঠানিক কর্ম্ম গুণভেদে তিন প্রকার, যথা, সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। যে ব্যক্তি যেরূপ গুণ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই গুণেরই উপযোগী যজ্ঞাদি আচরণ করিতে স্বভাববশতঃ তাহার প্রবৃত্তি হয় ও সে তাহাই করিয়া থাকে; কিন্তু উৎকর্ষলাভের জন্য কিয়ৎপরিমাণে উন্নত গুণের উপযোগী যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করাও তাহার কর্ত্তব্য।

যজ্ঞ।

শাস্ত্রে পঞ্চ প্রকার যজ্ঞের উল্লেখ আছে। স্বাধ্যায় অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা ঋষিযজ্ঞ; বেদাধ্যয়ন, সন্ধ্যা, উপাসনা জপাদি ইহার অন্তর্গত। অগ্নিহোত্রাদি দেবযজ্ঞ, বলিবৈশ্বদেব ভূতযজ্ঞ, অন্নাদিদ্বারা অতিথি সৎকারকরণ নৃযজ্ঞ এবং শ্রাদ্ধতর্পণাদি পিতৃযজ্ঞ বলিয়া কথিত হয়। ঐ সকল যজ্ঞ গুণভেদে তিন প্রকার, যথা সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক।

ফলকামনা ত্যাগ করিয়া কেবল চিত্তশুদ্ধির জন্য অবশ্যকর্ত্তব্য-বোধে পরমাত্মায় চিত্তসমর্পণ করিয়া বিধিবিহিত যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সাত্ত্বিক যজ্ঞ (১)। ফলকামনা করিয়া, অর্থাৎ সকলে যজ্ঞ-কারীকে ধার্ম্মিক বলিবে এই প্রকার যশোলিপ্সায়, বা নিজ মহত্ত্ব-প্রকাশলালসায়, কিংবা অন্য কোন অভীষ্টসিদ্ধির জন্য যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়, তাহা রাজসিক যজ্ঞ (২)। শাস্ত্রোক্তবিধিহীন, সৎপাত্রে

---

(১) अफलाकांक्षिभिरित्यादिः। गीता १७।११।

(২) अभिसन्धाय तु फलमित्यादि। गीता १७।१२।

দানশূন্য, মন্ত্রহীন, দক্ষিণাবিহীন ও শ্রদ্ধাবিরহিত যজ্ঞকে তামস যজ্ঞ কহে (১)। সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ রাজসিক বা তামসিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন না। যে রজোগুণাবলম্বী সে স্বভাববশতঃ রাজসিক যজ্ঞ এবং যে তমোগুণাধিক সে তামসিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, কিন্তু রাজসিক ব্যক্তিগণের ক্রমে ক্রমে সাত্ত্বিক এবং তামসিক ব্যক্তিগণের ক্রমশঃ রাজসিক ও সাত্ত্বিক যজ্ঞ আচরণের অভ্যাস করাই বিধেয়।

নৃযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ।

আমরা দেখিতে পাই, যে জীবের তমোগুণ অত্যন্ত অধিক, তাহার নিজ শরীরপোষণের বাহিরে ক্ষীণ চিন্তাশক্তি যাইতে পারে না। উদ্ভিদ্‌কীটাদিতে ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। ক্রমে ক্রমে যতই গুণের উৎকর্ষ লাভ করিতে করিতে জীব উন্নত জন্ম প্রাপ্ত হয়, ততই নিজকে ছাড়াইয়া মাতা পর্য্যন্ত তাহার জ্ঞান যায়, ঐ জ্ঞান আবার কেবল মাত্র নিজ শরীরপোষণের জন্য, অর্থাৎ যতদিন মাতাকর্ত্তৃক পুষ্ট হয় ততদিনই, তাহাতে আবদ্ধ থাকে; তৎপরে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মাতার প্রতি ঐ স্নেহের লোপ হয়। এই প্রকারে ক্রমশঃ অতি ক্ষীণ সত্ত্বগুণের স্ফূরণ হইতে হইতে যতই উন্নতযোনি লাভ করে, ততই সে নিজ শরীর ব্যতীত সন্তানের শরীরপোষণের জন্য ব্যগ্র হয় এবং ক্রমশঃ তাহার অপত্যস্নেহ জন্মে, কিন্তু সন্তান স্বাধীনভাবে আহারাদি সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইলে ঐ স্নেহেরও লোপ হয়। পূর্ব্বোক্তরূপে জীব যতই উৎকর্ষ লাভ করিয়া উন্নতজন্ম প্রাপ্ত হয়, ততই ক্রমে ক্রমে তাহার সন্তানের বাহিরেও স্নেহের প্রসার জন্মে এবং স্বজাতীয় কতকগুলি জীবের

---

(১) বিধিহীনমসৃষ্টান্নমিত্যাদিঃ। গীতা ১৭।১৩।

সহিত একত্র দলবদ্ধ হইয়া বাস করে, ইহাদের মধ্যে একটি অপরটির জন্ত সহানুভূতি দেখাইয়া থাকে, কিন্তু পশুপক্ষীদিগের মধ্যে সাধারণতঃ ঐ সহানুভূতির পরিমাণ অতি অল্প। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে, কোন জাতীয় একটি পশু বা পক্ষী কাহারও দ্বারা হত হইলে, ঐ শ্রেণীর অন্তান্ত জীবগণ দারুণ কোলাহল করিয়া হত্যাকারীকে আক্রমণ করিতে যায়, ইহা যে সম্পূর্ণ সহানুভূতিবশতঃ ঘটিয়া থাকে তাহা নহে, ঐ হত্যাকারী তাহাদিগকেও হনন করিবে এই ভয়েই ঐ প্রকার করিয়া থাকে, কারণ পশুপক্ষীদিগের তমোগুণের প্রবলতাবশতঃ ভয়াধিক্য হইয়া থাকে।

মনুষ্যগণের মধ্যে যাহারা পশু হইতে কিছু উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহারা অনেকটা পশুর ন্যায় নিজ শরীরপোষণের জন্যই সদা ব্যস্ত থাকে। তদপেক্ষা উৎকর্ষের অবস্থায় তাহারা পোষণকারী পিতা-মাতাকে, যতদিন তাহারা পোষণ করে, ততদিনই, জানে। ক্রমে ক্রমে জন্ম হইতে জন্মান্তর লাভ করিতে করিতে যতই তাহাতে সত্ত্বগুণের ঈষৎ পরিমাণে বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং সেও উৎকর্ষ লাভ করিতে থাকে, ততই ক্রমশঃ তাহার স্নেহ প্রসার প্রাপ্ত হইয়া তাহার প্রতিপাল্য ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে এবং পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, স্ত্রী, সন্তান ও অন্তান্ত আত্মীয় স্বজনকে প্রতিপালন করে। এই প্রকারে ক্রমাগত যতই সত্ত্বগুণের পরিমাণ অধিক হইতে থাকে, ততই তাহাদিগকে অবশ্যপ্রতিপাল্য জ্ঞান করে এবং নিঃস্বার্থভাবে তাহাদের পরিপোষণের জন্তও ব্যগ্র হয়। ক্রমে ক্রমে সত্ত্বগুণের আধিক্যবশতঃ যতই অন্তঃকরণে সৎপ্রবৃত্তির প্রসার হইতে থাকে, ততই সম্পর্ক ও সংস্রবহীন ব্যক্তিগণকেও স্বার্থশূন্য হইয়া পোষণ করে, কোন উপকারের প্রতিশোধার্থ বা তাহাদের নিকট কোন উপকারের প্রত্যাশা করিয়া সে তাহাদের সৎকার করে না, পরার্থপরতাকর্তৃক

প্রণোদিত হইয়াই সে নিঃস্বার্থভাবে ঐ প্রকার করিয়া থাকে। ইহাই প্রকৃত অতিথিসৎকার—ইহাকেই নৃযজ্ঞ বলে।

পূর্ব্বোক্তরূপে ক্রমে ক্রমে যখন তাহার হৃদয়ের বিশালতা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে, তখন কেবলমাত্র মনুষ্যে তাহার দয়া আবদ্ধ থাকে না, অন্যান্য জীবের জন্যও তাহার প্রাণ কাঁদিতে থাকে, তাহাদিগকেও অন্নাদি দান না করিয়া সে ভোজন করিতে পারে না; এই প্রকার আহারপ্রদানই ভূতযজ্ঞ। যে ব্যক্তি যে প্রকার গুণাবলম্বী তাহার পক্ষে তদুপযোগী নৃযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ আচরণ করিবার জন্য শাস্ত্রকারগণ বিধান করিয়াছেন।

বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রচারের ও আধুনিক সামাজিক ব্যবহারপ্রচলনের পূর্ব্বে, উচ্চ তিন বর্ণের প্রতি গৃহেই অতিথিসৎকার ও ভূতযজ্ঞ প্রত্যহই অনুষ্ঠিত হইত। ঐ সকল গৃহে দেবপ্রকৃতি গৃহস্বামী এবং অন্নপূর্ণাস্বরূপা গৃহকর্ত্রী প্রত্যহ অতিথি ভোজন না করাইয়া জলগ্রহণ করিতেন না, এমন কি যখন তাঁহারা অবশ্যপ্রতিপাল্য ব্যক্তিগণের আহারদ্বারা পরিতৃপ্তিসাধন করিয়া সর্ব্বশেষে স্বয়ং ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, সেই সময়েও যদি কোন ক্ষুধার্ত্ত অতিথি সমাগত হইত, তাহা হইলে তাঁহারা আর স্থির থাকিতে পারিতেন না, তাঁহাদের হৃদয় উদ্বেলিত হইত এবং স্বয়ং অভুক্ত থাকিয়াও নিজ ভোজ্য অন্ন দ্বারা ক্ষুধাতুর অভ্যাগতের তৃপ্তিসাধন করিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতেন। হায়! সেই আর্য্যসন্তানগণের মধ্যে অধিকাংশের গৃহেই আজ কি দৃশ্য দেখিতেছি? তথায় তমোগুণোদ্ভূত স্বার্থপরতা যেন পিশাচের ন্যায় বিকটবেশে বিচরণ করিতেছে এবং সেই জন্যই বুঝি ঐ সমস্ত গৃহ শ্মশানবৎ প্রতীয়মান হইতেছে।

দান।

দান করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে স্বার্থের হ্রাস হইয়া আইসে, মনের প্রসন্নতা জন্মে এবং চিত্তের বিশুদ্ধি সম্পাদিত হয়। ব্যক্তিবিশেষের জন্য অথবা কতকগুলি মনুষ্যের সমষ্টির জন্য দান হইতে পারে। জলাশয়কূপাদিখনন, রাস্তাঘাটপ্রস্তুতকরণ প্রভৃতি পূর্ত্তকার্য্যের দ্বারা সাধারণের যে উপকার করা যায়, তাহাও দান, আবার একটি দুঃস্থ ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির আর্ত্তনাদে কাতরহৃদয় হইয়া, নিজ উদরের তৃপ্তি সম্পাদন না করিয়া, স্বকীয় ভোজ্য বস্তুদ্বারা উহার ক্ষুন্নিবৃত্তি করাও দান। মানুষ যতই সত্ত্বগুণের দিকে অগ্রসর হয়, ততই সে নিঃস্বার্থ ভাবে দান করিতে সক্ষম হয় এবং ঐ প্রকার দান করিতে করিতে অভ্যাসবশতঃ তাহার সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হইতে থাকে।

গুণভেদে দান তিন পকার। শাস্ত্রোপদিষ্ট দেশ কাল ও পাত্র বিবেচনাপূর্ব্বক এবং প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা না করিয়া, নিষ্কামভাবে ও কর্ত্তব্যানুরোধে যে দান করা যায়, তাহাই সাত্ত্বিক দান (১)। প্রত্যুপকারপ্রাপ্তির আশায়, অর্থাৎ "ইহাকে এক্ষণে দান করিতেছি, এ ব্যক্তি পরে কখন আমার উপকার করিবে" ইহাই ভাবিয়া, কিংবা ইহকালে বা পরকালে কোন ফললাভের কামনায় যে দান করা যায়, অথবা দান করিয়া পরে যদি মনে কোন প্রকার কষ্টের উদয় হয়, তাহা হইলে সেই দান রাজসিক দান (২)। ইহকালের ফলকামনায় দান করা অপেক্ষা পরকালের ফলকামনায় দান অবশ্যই কিছু উন্নতাধিকারীর

---

(১) দাতব্যমিতি যদ্দানমিত্যাদিঃ। গীতা, ১৭।২০।

(২) যত্তু প্রত্যুপকারার্থমিত্যাদিঃ। গীতা, ১৭।২১।

কার্য্য এবং সেই দানের কথাই মনে করিয়া বোধ হয় লিখিত হইয়াছিল যে, "But when thou doest alms, let not thy left hand know what thy right hand doeth; That thine alms may be in secret: and thy father which seeth in secret himself shall reward thee openly &c" (১); ইহাতে পুরস্কারের প্রলোভন আছে, সুতরাং ইহা রাজসিক দান, ইহা সাত্ত্বিক দান অপেক্ষা নিকৃষ্ট। একবারে কামনাশূন্য হইয়া কর্ত্তব্যানুরোধে দান অতি উচ্চ কথা, এই সাত্ত্বিক দান অতি উন্নতাধিকারীর জন্যই শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে, ইহা রাজসিক বা তামসিক লোকে মনে ধারণাও করিতে পারে না।

দেশ কাল ও পাত্র বিবেচনা না করিয়া, কিংবা মিষ্ট বচনাদি দ্বারা সৎকার না করিয়া, অথবা ঘৃণা বা অনাদরপূর্ব্বক যে দান করা যায়, তাহা তামস দান (২)।

দানশীলতা ও কৃপণতা।

যাহার পক্ষে যে প্রকার দান উপযোগী, যাহা দান করা অনায়ত্ত বা সামর্থ্যের অতিরিক্ত নহে, এবং ক্ষণিক সত্ত্ব বা রজোগুণবশতঃ যাহা দান করিয়া, পরে তজ্জন্য পরিতাপ করিতে না হয়, শাস্ত্র সেইরূপ দানেরই বিধান করিয়াছেন। যে ঐ প্রকার দান করে, তাহাকেই

(১) St. Mathew, Ch. 6, vs. 3, 4.

(২) অদেশকালে যদ্দানমিত্যাদিঃ। গীতা, ১৭।২২।

দানশীল কহিতে পারা যায়। কেহ অহঙ্কারবশতঃ তাহার যথাসর্ব্বস্ব অপরকে দিয়া নিজের কিংবা তাহার স্ত্রীপুত্রাদির ভরণপোষণের জন্য পরে যদি ব্যথিতহৃদয় হয়, অথবা তজ্জন্য অন্যায়পূর্ব্বক অর্থোপার্জ্জন করিবার জন্য ব্যগ্র হয়, তাহা দানশীলতা নহে; ঐ প্রকার দান অবিধেয়। কিন্তু যে সত্ত্বগুণাবলম্বী, নিজের অথবা স্ত্রীপুত্রাদির ভরণপোষণের জন্য যাহার মন চঞ্চল হয় না, যদৃচ্ছালাভেই যে সন্তুষ্ট হয়, যে দান করিয়া আর তজ্জন্য অনুতাপ করে না, যাহার সর্ব্বস্ব গেলেও হৃদয় ব্যথিত হয় না, তাহার পক্ষেই ঐ রূপ দান উপযোগী হইতে পারে।

যে কোন প্রকারে অর্থ সঞ্চয় করিতে ব্যস্ত হওয়াকে এবং ঐ সঞ্চিত অর্থ প্রয়োজনবশতঃও ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত ও মনঃক্লিষ্ট হওয়াকেই আমরা সাধারণতঃ কৃপণতা বলিয়া থাকি, কিন্তু মনের সঙ্কীর্ণতাকেই প্রকৃতপক্ষে কৃপণতা বলে।

তমোগুণবশতঃ কৃপণতা এবং সত্ত্বগুণবশতঃ প্রকৃত দানশীলতা হয়, সুতরাং শূদ্র সর্ব্বাপেক্ষা কৃপণ, তৎপরে ক্রমশঃ উচ্চবর্ণে কৃপণতার ন্যূনতা হওয়া সম্ভব। যিনি সত্ত্বগুণাবলম্বী—যিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণ—তিনি কখন কৃপণ হইতে পারেন না। অনেকে বলিতে পারেন যে, ব্রাহ্মণ সাধারণতঃ দরিদ্র, সুতরাং তাঁহার কৃপণতাই বা কি, আর দানশীলতাই বা কি? ব্রাহ্মণ দরিদ্র নহেন, তিনি অর্থকে হেয় জ্ঞান করেন, তিনি যে মহামূল্য স্পর্শমণি পাইয়াছেন, তাহার নিকট বৈশ্যের প্রভূত সঞ্চিত অর্থ তুচ্ছ, রাজকোষের অসংখ্য ধনও অগণ্য। আমরা দেখিতে পাই, যিনি ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, যাঁহার বাহ্য সম্পত্তির মধ্যে হয়ত একমাত্র কম্বলই সম্বল, যিনি অনায়াসলভ্য বস্তুতে উদরের তৃপ্তিসাধন করেন, তিনি শীতার্ত্তের বা ক্ষুধার্ত্তের আর্ত্তনাদে স্থির থাকিতে পারেন না, তাহাদিগকে যথাসর্ব্বস্ব দান করিয়া, শীতক্লিষ্টের শীতজনিত কষ্ট এবং বুভুক্ষুর ক্ষুধার জ্বালা ও পিপাসিতের পিপাসা নিবারণ করিয়া, তিনি

অপার আনন্দ অনুভব করেন, কিন্তু স্বয়ং প্রসন্নচিত্তে ক্ষুধাতৃষ্ণা শীত গ্রীষ্ম সহ্য করেন এবং তজ্জন্য ক্লিষ্ট বা ব্যথিতহৃদয় হন না। উপকৃত ব্যক্তির অথবা অপর কাহারও নিকট কিছু প্রত্যাশা না করিয়া তিনি স্বভাববশতঃ নিঃস্বার্থভাবেই ঐ দান করিয়া থাকেন। ইহাই প্রকৃত সাত্ত্বিক দান, ইহাই দানশীলতার চরমোৎকর্ষ।

আর্য্যগণ! তোমরা ক্রমশঃ সত্ত্বগুণ হারাইতেছ, সুতরাং তোমাদের মধ্যে নিঃস্বার্থভাবে দান করার আদর হ্রাস হইতেছে। যাহাদিগকে অনুকরণ করিতে গিয়া, যাহাদের অর্থনীতির মোহে পড়িয়া, দ্বারস্থ ভিক্ষুককেও দান করিতে কুণ্ঠিত হইতেছ, তাহারাও তাহাদের দেশে দীনদরিদ্রগণকে প্রতিপালন করিবার ব্যবস্থা করে, কিন্তু কৈ, তোমরা ত, তাহার কিছুই কর না!

তপঃ।

কায়িক, বাচিক ও মানসিক ভেদে তপস্যা ত্রিবিধ। দেবতাগণের, সদাচারযুক্ত উত্তম ব্রাহ্মণের, পিতামাতা আচার্য্য প্রভৃতি গুরুগণের এবং তত্ত্ববিৎ প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণের পূজা, বাহ্য শৌচ (অর্থাৎ মৃজ্জলাদি দ্বারা শরীরশুদ্ধি), সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য বা ইন্দ্রিয়সংযম, অহিংসা (অর্থাৎ যাহাতে অন্যের শারীরিক বা মানসিক কষ্ট না হয় এই প্রকার কার্য্যকরণ), শীত উষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহন, এবং পরিমিত আহার নিদ্রাদি শারীর তপঃ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে (১)। দেবতা ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট

(১) দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনমিত্যাদিঃ। গীতা, ১৭।১৪

সত্ত্বগুণাবলম্বী, সুতরাং তাঁহাদের পূজার দ্বারা নিজের সত্ত্বগুণ বর্দ্ধিত হয়; তাঁহাদের পূজা করিবার বিধি নির্দ্দিষ্ট হওয়ার ইহা একটি প্রধান কারণ। যাহা শুনিলে অন্যের মনে বেদনা বা উদ্বেগ না জন্মে এবং যাহা শ্রোতার প্রিয় ও হিতকর এইরূপ সত্যবাক্যকথন এবং বেদাধ্যয়ন, বাঙ্ময় তপস্যা (১)। চিত্তের প্রসন্নতা, সৌম্যভাব বা অক্রূরতা, মনঃ-সংযমপূর্ব্বক আত্মচিন্তন, বিষয় হইতে মনকে প্রত্যাহারকরণ, এবং অন্তঃকরণশুদ্ধি বা আভ্যন্তরিক শৌচ, মানস তপঃ বলিয়া উক্ত হয় (২)।

উপরিউক্ত ত্রিবিধ তপস্যাও আবার গুণভেদে তিন প্রকার, ফল-কামনাশূন্য একাগ্রচিত্ত ব্যক্তি পরমশ্রদ্ধাসহকারে যে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ তপস্যার অনুষ্ঠান করেন, তাহা সাত্ত্বিক (৩)। "ইনি মহা সাধুপুরুষ বা কঠোরতপস্বী" ইত্যাদিরূপ বাক্যের দ্বারা লোকে সৎকার করিবে, তপস্বী জানিয়া লোকে অভ্যুত্থান অভিবাদনাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিবে, অথবা সাধু বলিয়া তাঁহাকে অর্থদান করিবে, এই ভাবিয়া দম্ভের সহিত যে তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়; তাহা রাজস (৪)। কোন প্রকার কামনা করিয়া অবিবেকবশতঃ অশাস্ত্রীয় পঞ্চতপাদির আচরণ, অথবা কোন প্রকার কৃচ্ছ্রসাধন, কিংবা কোন ব্যক্তির বিনাশার্থ অভিচারাদির অনুষ্ঠান করাকে তামস তপস্যা কহে (৫)। দম্ভ এবং অহঙ্কারযুক্ত, অভিলাষ আসক্তি ও আগ্রহবিশিষ্ট যে অবিবেকী ব্যক্তি

---

(১) अनुद्वेगकरं वाक्यमित्यादिः। गीता, १७।१५।

(২) मनःप्रसादः सौम्यत्वमित्यादिः। गीता, १७।१६

(৩) श्रद्धया परया तप्तमित्यादिः। गीता, १७।१७।

(৪) सत्कारमानपूजार्थमित्यादिः। गीता, १७।१८।

(৫) मूढ़ग्राहेणात्मनो यदित्यादिः। गीता, १७।१৯।

অশাস্ত্রবিহিত এবং নিজের ও অন্যান্য প্রাণিগণের পীড়াদায়ক তপস্যা করে, তাহাদিগকে অতি ক্রূরকর্ম্মা তামসিক তপস্যাকারী বলিয়া জানিতে হইবে।

যোগ।

একের সহিত অপরের মিলনের নাম যোগ। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলন যে যোগ, তাহা জ্ঞানীর জ্ঞানযোগ। ভগবানে মনঃসংযোগ করিয়া, তাঁহারই চিন্তায় তন্ময় হইয়া, তাঁহার সত্তা ব্যতীত আর কিছুই অনুভব না করাও যোগ, ইহা ভক্তের ভক্তিযোগ। কর্ম্মে মনকে নিযুক্ত করিয়া কর্ত্তব্য কার্য্যের বিধিপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করাও যোগ, ইহা কর্ম্মীর কর্ম্মযোগ; এই যোগ সাধন করিতে করিতে ভক্তি ও জ্ঞানমার্গে উপস্থিত হওয়া যায়। শারীরিক, ঐন্দ্রিয়িক, প্রাণাদি বায়বিক ও মানসিক ক্রিয়া দ্বারা মনের স্থিরতা সম্পাদন করিতে করিতে চিত্তবৃত্তির যে নিরোধ হয়, তাহাকেই সাধারণতঃ যোগ বলিয়া থাকে (১); যে যে পথেই যাক্ না কেন, সে নিজ উপযোগিতানুযায়ী এই যোগের কোন না কোন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, ঐ সকল ক্রিয়া নিজ গুণানুযায়ী অধিকারভেদে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রকম হইয়া থাকে।

তমোগুণ হইতে রজোগুণের আধিক্য করিতে এবং তাহা হইতে সত্বগুণের অবস্থায় যাইতে,—জড়তা হইতে চঞ্চলতা এবং চঞ্চলতা হইতে স্থিরতায় উপনীত হইতে,—অর্থাৎ মনুষ্যের উৎকর্ষসাধনের সহায়তা করিতে, যোগ একটি প্রধান সহায়। যে ব্যক্তি যে প্রকার

---

(১) যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ। পাতঞ্জল, ১।২

অধিকারী বা উপযুক্ত পাত্র, তাহার পক্ষে তদনুযায়ী যোগই অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। এক প্রকার গুণাধিকের পক্ষে যাহা শ্রেয়ঃ অপরের পক্ষে তাহা নহে। যে তমোগুণাধিক সে নিশ্চল হইয়া সত্ত্বগুণাবলম্বীর ন্যায় আসন করিয়া একটি বিষয় চিন্তা করিতে পারিবেই না, যদি ইহা করিতে চেষ্টাও করে, তাহা হইলে ঐ সময়ে তাহার মন স্থির হওয়া দূরে থাকুক, বরঞ্চ ইহাতে সে নিদ্রা তন্দ্রা আলস্যাদির দ্বারা অভিভূত হইয়া থাকে। যে জড়ভাবাপন্ন, সে যে প্রকার অভ্যাস করিলে প্রথমতঃ চঞ্চল ও কার্য্যক্ষম হইতে পারে, তাহাই করা বিধেয়। এক প্রকার অধিকারী অপরের কার্য্য অভ্যাস করিতেত সমর্থই হয় না, যদি করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে উৎকর্ষ সাধিত হওয়া দূরের কথা, বরং তাহার অনিষ্টই হইয়া থাকে, যোগ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া সে বিপরীত ফল লাভ করে এবং ইহাতে তাহার দারুণ অধঃপতন হয়।

একই ব্যক্তি যে সকল সময়েই এবং শরীর ও মনের সকল অবস্থাতেই একই প্রকার যোগ অভ্যাস করিতে সক্ষম বা ইহার উপযোগী হইয়া থাকে, তাহা নহে। অন্য গুণাবলম্বীর ত কথাই নাই, কেহ সত্ত্বগুণাবলম্বী হইলেও, যে কার্য্যে তমোগুণ অধিক হয়, সে যদি তাহাই করিয়া, তৎপরে সত্ত্বগুণের কার্য্য করিতে চেষ্টা করে, যেমন, যদি কেহ আকণ্ঠ আহারের পর আসন করিয়া উপবিষ্ট হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মনকে কোন একটি বিষয়ে নিবিষ্ট করিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহারও নিদ্রাতন্দ্রাদি আসিয়া পড়ে ; সুতরাং সে সময়ে তাহারও ঐ প্রকার করিয়া মনঃস্থির করিতে চেষ্টা করা বৃথা। আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই যে, নিদ্রা আসিবার সময়ে, অথবা আহারের অব্যবহিত পরেই, কিংবা অত্যন্ত ক্লান্ত বা শ্রান্ত হইলে, কোন বিষয়ে গভীর চিন্তায় মনকে একাগ্র করিতে পারা যায় না, অর্থাৎ তমোগুণের আধিক্য হইলে, সত্ত্বগুণের কার্য্য করিতে পারা যায় না। এই সকলের প্রতি

লক্ষ্য রাখিয়া কাহার পক্ষে কোন্ সময়ে কি প্রকার যোগাভ্যাস বিধেয়, তাহা শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

শরীর, প্রাণাদি বায়ু, এবং মন ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ পরস্পর পরস্পরের স্থিরীকরণে, অথবা চঞ্চলতাবৃদ্ধিকরণে কিংবা নিশ্চেষ্ট করিয়া কার্য্যাক্ষমকরণে সহায়তা করিয়া থাকে। আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই যে, কোন ইন্দ্রিয় তদ্‌গ্রাহ্য কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে স্থিরতার সহিত আবদ্ধ হইলে সঙ্গে সঙ্গে শরীর স্থিরভাব প্রাপ্ত হয়, শ্বাসপ্রশ্বাসাদি নিশ্চল হয় এবং মনও স্থির হইয়া আইসে। ঐরূপ, মন কোন একটি বিশেষ চিন্তায় নিযুক্ত হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইন্দ্রিয়গণ ও ইহাদের শারীরিক যন্ত্রসকল স্থির হইয়াছে এবং শ্বাসপ্রশ্বাসাদিও নিশ্চল হইয়াছে; আবার শ্বাসপ্রশ্বাসাদি স্থির হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শরীর, ইন্দ্রিয়গণ এবং মনও স্থির হইয়াছে। এই স্থিরতা সত্ত্বগুণের কার্য্য এবং ঐ সমস্ত ক্রমে ক্রমে ঐ প্রকারে স্থির করিতে করিতে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। উপরিউক্ত শরীরাদির মধ্যে কোনটি চঞ্চল হইলে অবশিষ্ট কয়েকটিও চঞ্চল হইয়া থাকে, এই চঞ্চলতা রজোগুণের কার্য্য; সুতরাং ঐ সকলে পুনঃ পুনঃ চঞ্চলতা বৃদ্ধি করিতে করিতে রজোগুণের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই প্রকারে নিদ্রালস্যাদি দ্বারা উহাদিগকে ক্রমাগত অবসন্ন করিলে জড়তা আসিয়া উপস্থিত হয়, সুতরাং তমোগুণ স্থায়ীরূপে বর্দ্ধিত হয়।

পদদ্বয় পরস্পর সংবদ্ধ করিয়া নির্দ্দিষ্টভাবে আসন করিয়া উপবেশন করিলে, হস্তদ্বয় সরলভাবে বা অন্য কোনরূপে স্থিরভাবে রাখিলে, জিহ্বা কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করিলে, এবং চক্ষুদ্বারা কোন একটি বস্তুর প্রতি নিশ্চলভাবে লক্ষ্য করিয়া থাকিলে, আমরা দেখিতে পাই যে, শ্বাসপ্রশ্বাস এবং মনও স্থির হইয়া আইসে, সুতরাং উপযোগিতানুযায়ী ঐরূপ অভ্যাস করিতে করিতে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয়। ঐ সমস্ত অঙ্গ

সঞ্চালন করিলে শ্বাসপ্রশ্বাস এবং মনও চঞ্চল হয়, এবং এই প্রকার করিতে করিতে রজোগুণের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

যেমন গুণভেদে শরীর ও ইন্দ্রিয়গণের নানাপ্রকার অবস্থা হয়, প্রাণাদি বায়ুরও তদ্রূপ হইয়া থাকে। ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ তমোগুণের অবস্থাতে হইয়া থাকে, এবং ঐ প্রকার করিতে করিতে তমোগুণের বৃদ্ধি হইয়া নিদ্রাদির সহায়তা করে। ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাস রজোগুণবশতঃ এবং শ্বাস গ্রহণকরতঃ উহা ত্যাগ না করিয়া অধিকক্ষণ স্থিরভাবে রাখা সত্ত্বগুণবশতঃ হইয়া থাকে এবং ঐরূপ অভ্যাস করিতে করিতে ঐ ঐ গুণের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

যেমন অন্যান্য ইন্দ্রিয় এবং প্রাণাদি বায়ুর সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, মানসিক ক্রিয়ার সম্বন্ধেও সেই প্রকার ঘটিয়া থাকে। মন নিরুদ্বেগ ও স্থির হইলে সত্ত্বগুণের উদ্রেক হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ ও প্রাণাদি বায়ুও স্থির হয়। নানাপ্রকার কুচিন্তার বা দুশ্চিন্তার উদয় হইয়া মন যদি উদ্বিগ্ন হয়, তাহা হইলে রজোগুণের বৃদ্ধি হওয়ায় অনেক চেষ্টাসত্ত্বেও নিদ্রার আবির্ভাব হয় না।

শরীর, প্রাণাদি বায়ু, এবং মন ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ কি প্রকার কার্য্য করিলে কোন্ গুণের বৃদ্ধি হয়, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া মনের স্থিরতা সম্পাদনের জন্য এবং ক্রমে ক্রমে চিত্তবৃত্তি-নিরোধের জন্য, শাস্ত্রকারগণ যোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এই আটটি যোগের অঙ্গ বলিয়া, সাধারণতঃ যে যোগ সাধিত হয়, তাহাকে অষ্টাঙ্গ যোগ বলে (১)। ইহার মধ্যে যম ও নিয়মকে তপস্যার এক প্রকার নামান্তর বলিলেও চলে। সাধক যে পথেই যাক না কেন, তাহাকে এই

---

(১) যানবল্লভম্, ২।২৫।

অষ্টাঙ্গ যোগের কিছু না কিছু সাধনা করিতে হয়। এমন কি মুসলমান ও খৃষ্টানগণের মধ্যেও কোন কোন সম্প্রদায়ে ইহা বিশেষরূপে সাধনা করিবার নিয়ম আছে। ঐ সকল মতাবলম্বীগণের মধ্যেও বিশেষতঃ মুসলমানসম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক যোগী পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায়। যোগের চরম উদ্দেশ্য সকলেরই এক, কিন্তু ক্রিয়ার পার্থক্যানুযায়ী ঐ অষ্টাঙ্গযোগ আর্য্য শাস্ত্রে নানারূপে বিভক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে রাজ, হঠ, মন্ত্র ও লয় এই চারিটি প্রধান। সদ্‌গুরু শিষ্যের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী এবং তাহার কতটুকু অধিকার তাহা দেখিয়া,তাহার উপযোগী পথে তাহাকে লইয়া যান।

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য এবং অপরিগ্রহ এই কয়েকটিকে যম কহে (১)। অপরের কায়িক বা মানসিক ক্লেশ উৎপাদক কার্য্য পরিত্যাগকে অহিংসা, বাক্য ও মনে মিথ্যাশূন্যতাকে সত্য, কর্ম্ম, মন বা বাক্য দ্বারা পরদ্রব্যে যে নিস্পৃহা তাহাকে অস্তেয় (পরদ্রব্যাপহরণরূপ চৌর্য্য স্তেয়ের অন্তর্গত), শুক্রধারণকে ব্রহ্মচর্য্য, এবং ভোগসাধনরূপ বিষয়ের পরিহারকে অপরিগ্রহ কহে।

যোগে ব্রহ্মচর্য্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। তমোগুণাবলম্বী ব্যক্তিই অধিক কামান্ধ হইয়া ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইয়া থাকে এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণতা-তেও তমোগুণ বৰ্দ্ধিত হয়। যতই সত্ত্বগুণের আধিক্য হইতে থাকে, ততই কামরিপু দমিত হয়, সুতরাং ঐ প্রকার ব্যক্তির কেবলমাত্র গৃহস্থাশ্রমে পুত্রোৎপাদনার্থই স্ত্রীসংসর্গের প্রয়োজন হয়। যে ব্যক্তি তমোগুণাবলম্বী, সুতরাং পাশবিক ভাবে পূর্ণ, সে কামরিপুকর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া ইন্দ্রিয়পরায়ণ হয়, কিন্তু যে সমধিক সত্ত্বগুণাবলম্বী, বিষয়-সুখে তাহার স্পৃহা থাকে না এবং গৃহস্থধর্ম্মের সহিতও তাহার

(১) যামস্ত্রজন্ম, ২।৩০।

কোন সংশ্রব থাকে না, সুতরাং পুত্রের জন্ত সে লালায়িত হয় না, এবং কামরিপুও তাহাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না, এই জন্ত তাহার স্ত্রীসঙ্গের কোনই :প্রয়োজন নাই। স্ত্রীসংসর্গে তমোগুণের বৃদ্ধি হয় এবং যোগাভ্যাসকালে ইহা হইতে দারুণ অনিষ্টোৎপত্তি হইয়া থাকে, এমন কি অকাল মৃত্যু পর্য্যন্তও হইতে পারে। এই জন্তই যোগাভ্যাসীর পক্ষে ইহা নিষিদ্ধ হইয়াছে (১)।

শৌচ, সন্তোষ, দ্বন্দ্বসহন ও মিতাহারাদি শারীর তপস্যা, এবং স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান, এই কয়েকটিকে নিয়ম বলে (২)।

মৃত্তিকাজলাদিদ্বারা শরীরশুদ্ধিকে বাহ্য শৌচ বলে। শরীরের প্রধান রন্ধ্র কয়েকটি এবং লোমকূপ দিয়া, অভ্যন্তরের যে দূষিত পদার্থ নির্গত হয়, তাহা জলাদি দ্বারা শরীর হইতে দূরীকরণ বাহ্য শৌচের অন্তর্গত। এতদ্ব্যতীত শরীরের অভ্যন্তরস্থ মলমূত্র কফপ্রভৃতি অপনোদনপূর্ব্বক বাহ্য শৌচকরণের নানা প্রকার যে উপায় আছে, সেই সকলকে

(১) मरणं बिन्दुपातेन जीवनं बिन्दुधारणात्।
तस्मादतिप्रयत्नेन कुरुते बिन्दुधारणम्॥
जायते म्रियते लोको बिन्दुना नात्र संशयः।
एतज्ज्ञात्वा सदा योगी बिन्दुधारणमाचरेत्॥
यदि सङ्गं करोत्येव बिन्दुस्तस्य विनश्यति।
आयुःक्षयो बिन्दुहानादसामर्थ्यञ्च जायते॥
तस्मात् स्त्रीणां सङ्गवर्ज्यं कुर्य्यादभ्यासमादरात्।
योगिनोऽङ्गस्य सिद्धिः स्यात् सततं बिन्दुधारणात्॥
दत्तात्रेयसंहिता।

(২) पातञ्जलम्। ২।৩২।

ধৌতি ও নেতি বলে। হঠ যোগীরা শেষোক্ত দুইটি প্রক্রিয়া দ্বারা বিশেষরূপে শরীর শোধন করিয়া থাকে। মনঃশুদ্ধির নাম আভ্যন্তরিক শৌচ।

যোগাভ্যাসকালে অধিক ভোজন বা অনাহার, অধিক নিদ্রা বা নিদ্রা-শূন্যতা এবং বৃথাভ্রমণ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য (১); এইগুলি শারীর তপস্যার অন্তর্গত। নিয়মিত আহার উপযুক্ত সময়ে করাই যোগা-ভ্যাসীর উচিত (১)। রাজস ও তামস আহার যোগীর পক্ষে নিষিদ্ধ; সাত্ত্বিক আহারই কর্ত্তব্য। অধিক ভোজন, অনাহার, অসময়ে ভোজন এবং অধিক নিদ্রাতে তমোগুণের বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বে বিশেষ-রূপে বলা হইয়াছে। রজঃ বা তমোগুণাধিক ব্যক্তির অনাহারে বা অনিদ্রাতে শরীর ও মন অবসন্ন হইয়া পড়ে, সুতরাং ইহাতে তাহাদের তমোগুণ আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যাঁহার স্বত্বগুণ অধিক তাঁহাতে অনা-হার বা নিদ্রাশূন্যতা যতটুকু তিনি সহ্য করিতে পারেন ততটুকুতে—তমোগুণ বর্দ্ধিত হইতে পারে না, বরং ইহাতে তাঁহার সত্বগুণই আরও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, সুতরাং এই গুণ যাঁহার সমধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, তিনি আহার বা নিদ্রার অভাবে অবসন্ন বা ক্লিষ্ট হন না; তিনি যোগাভ্যাসের নিম্নাবস্থা উত্তীর্ণ হওয়ায়, এই অবস্থার যোগা-ভ্যাসীর ন্যায় অনাহার বা নিদ্রাশূন্যতার নিয়ম তাঁহার পক্ষে বর্ত্তে না। যাহার তমোগুণ অধিক তাহার জড়তা নষ্ট করিবার জন্য অধিক ভ্রমণের প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু যাহাদের রজোগুণ বা সত্বগুণ অধিক, তাহাদের আর রজোগুণ বৃদ্ধি করিবার আবশ্যক নাই, সুতরাং তাহাদের বিনা প্রয়োজনে অধিক চলাচল কর্ত্তব্য নহে। সত্বগুণ

---

(১) নাত্যশ্নতস্তু ইত্যাদি। গীতা, ৬।১৬, ১৭।

বর্দ্ধিত করা যোগাভ্যাসের একটি প্রধান উদ্দেশ্য. এই জন্যই বৃথা ভ্রমণ যোগাভ্যাসীর পক্ষে নিষিদ্ধ।

যাহার উপরে উপবেশন করা যায় তাহাকে, এবং পদদ্বয় নির্দ্দিষ্টভাবে সন্নিবিষ্ট করিয়া উপবেশন করাকে, সাধারণতঃ আসন বলে; কিন্তু যোগাভ্যাসকালে যে প্রকার স্থানে, যে যে দ্রব্যের উপরে, এবং অঙ্গসমূহ যে ভাবে সন্নিবিষ্ট করিয়া, উপবেশন করিতে হয়, তৎসমুদয় আসনের অন্তর্গত। আসন যোগের তৃতীয় অঙ্গ। যোগাভ্যাসের সময়ে স্থিরবায়ুযুক্ত পবিত্র ও নির্জ্জন স্থানে, মৃত্তিকার বা শিলার উপরে, প্রথমতঃ কুশ, তদুপরি অধিকারভেদে ব্যাঘ্রমৃগাদির চর্ম্ম বা কম্বলাদির উপরে, রেশম বা কার্পাস বস্ত্র বিস্তীর্ণ করিয়া, তাহার উপরে উপবেশন করিতে হয় (১)। শরীরে তেজের বৃদ্ধি হইলে জড়তা নষ্ট হইয়া তমোগুণ হ্রাস হইয়া আসে এবং সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয়, কিন্তু সেই সময়ে পৃথিবীর সহিত শরীর সংস্পৃষ্ট হইলে ঐ তেজ পৃথিবীতে চালিত হইয়া যায়, তাহা নিবারণের জন্যই যোগাভ্যাসকালে উপরিউক্ত কয়েকটি দ্রব্যের উপরে বসিবার নিয়ম, কারণ ঐ গুলি তেজসঞ্চালনের বহুল পরিমাণে অবরোধকারক বা অপরিচালক (bad conductors)। ঐ সকলের পরিবর্ত্তে ঐ সময়ে তেজপরিচালক কোন দ্রব্যের উপরে বসিলে তেজ পৃথিবীতে পরিচালিত হইয়া যায়, সুতরাং প্রাণায়ামদ্বারা শরীরাভ্যন্তরে যে তেজ বর্দ্ধিত হয় তাহা রক্ষিত না হওয়ায় মনের জড়তা ও চঞ্চলতা নষ্ট হইতে পারে না।

করচরণাদির নানাপ্রকারে সংস্থাপন যোগের আসনের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং প্রধানতঃ ইহাকেই আসন বলা যায়। আমরা দেখিতে পাই যে, শরীরের কোন স্থান স্পর্শ করিলে হাঁচি, কোন স্থান স্পর্শ

---

(১) शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य इत्यादिः। गीता, ६।११।

করিলে হাসির উদয় হয়, এবং এইরূপে নানাপ্রকারে শরীরের ভাবান্তর উপস্থিত হয়। মনেরও ঐরূপ হইয়া থাকে। আমাদের সর্ব্বশরীরে অসংখ্য নাড়ী আছে, তাহাদ্বারাই শরীরের অভ্যন্তরে বায়ু সঞ্চালিত হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে কতকগুলিতে চাপ পড়িলে তমোগুণ বর্দ্ধিত হইয়া নিদ্রাদির আবির্ভাব হইয়া মন শিথিল হয়, কতকগুলিতে মনকে চঞ্চল করে এবং কতকগুলিতে সত্ত্বগুণের উদ্রেক হইয়া মন স্থির, ধীর ও শান্ত হয়। এই সমস্তের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, আর্য্যশাস্ত্রকারগণ অধিকারিভেদে মনঃস্থিরীকরণের জন্য নানাপ্রকার আসনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শরীরের যে যে নাড়ীতে প্রবাহিত ব্যানবায়ু চঞ্চল হইয়া দশটি ইন্দ্রিয়কে চঞ্চল করে, সেই সমস্ত কোন প্রকারে সংবদ্ধ হইলে তাহাদের ব্যানবায়ু স্থির হইয়া ইন্দ্রিয়গণের চঞ্চলতা নিবারণ করে, সুতরাং মনও স্থির হইয়া থাকে। শাস্ত্রে যোগের নানাপ্রকার আসনের ব্যবস্থা আছে, তন্মধ্যে চৌরাশীরূপ আসন প্রধান, তাহার মধ্যে আবার সিদ্ধাসন, পদ্মাসন, সিংহাসন এবং ভদ্রাসন এই চারিটি শ্রেষ্ঠ, ইহার মধ্যে প্রথম দুইটিই শ্রেষ্ঠতম (১)। উপরিউক্ত আসনসমূহের মধ্যে যে আসনে, অর্থাৎ যে ভাবে উপবিষ্ট হইলে, শরীর ও মন নিশ্চল হয় এবং কষ্ট বোধ না হইয়া সুখজনক হয়, তাহাই যোগাভ্যাসকালে প্রত্যেকের পক্ষে কর্ত্তব্য (২)।

---

(১) आसनानि कुवेशानि यावन्तो जीवजन्तवः ।
चतुरशीतिलक्षाणि चैकैकं समुदाहृतम् ॥
आसनेभ्यः समस्तेभ्यः साम्प्रतं द्वयमुच्यते ।
एकं सिद्धासनं नाम द्वितीयं कमलासनम् ॥
शिवसंहिता ।

(২) स्थिरसुखमासनम् । पातञ्जलम्, २ ।

উপরিউক্ত চারি প্রকার আসনের দ্বারা কর্ম্মেন্দ্রিয়পাঁচটি বিশেষরূপে সংবদ্ধ হইয়া থাকে এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য্যও সংযত হয়। ইহাতে দৃষ্টি অবিচলিতভাবে নাসাগ্রভাগে স্থাপন করিতে হয়, কর্ণে গুরূপদেশানুযায়ী আভ্যন্তরীণ ধ্বনি শুনিতে হয় ; এবং জিহ্বা দশনমূলে অথবা গুরুর উপদেশানুযায়ী নাসারন্ধ্র বন্ধ করিয়া তালুদেশে রাখিতে হয়। এই প্রকারে ত্বক্ ব্যতীত অপর চারিটি জ্ঞানেন্দ্রিয় সংবদ্ধ হয়। ঐ সকল আসনে পৃষ্ঠদেশ, মস্তক ও গ্রীবা সমানভাবে রাখিতে হয় ১ ; ইহাতে মেরুদণ্ড যষ্টির ন্যায় সরলভাবে থাকায়, প্রাণ ও অপান বায়ু বহির্গত না হইয়া ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ীতে সমানভাবে চলাচল করিতে থাকে এবং কোন প্রকারে বাধা প্রাপ্ত হয় না। তৎপরে ক্রমে ক্রমে ঐ দুই বায়ু স্থির হইয়া আইসে। আসনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের পরিচালক ব্যান বায়ুও নিশ্চল হইয়া অবশেষে সকল বায়ুই স্থিরতা প্রাপ্ত হয় এবং মনও সেই সঙ্গে সহজেই স্থির হয়।

যোগের চতুর্থ অঙ্গ প্রাণায়াম। পূরক, রেচক ও কুম্ভকরূপ প্রাণাদি বায়ুর ক্রিয়াদ্বারা বিধি ও নিয়মপূর্ব্বক শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদ করিয়া বায়ুকে ক্রমে ক্রমে অধিকক্ষণ শরীরাভ্যন্তরে স্থিরভাবে রাখিবার চেষ্টা করাকে প্রাণায়াম কহে ২)। যে বায়ু উচ্ছ্বাসের দ্বারা মুখ ও নাসিকা পথে বহির্গমন করে, তাহাকে যোগশাস্ত্রে প্রাণবায়ু এবং যাহা নিশ্বাসের দ্বারা অন্তরে প্রবেশ করে, তাহাকে অপান বায়ু কহে। অপান বা অধোবৃত্তির দ্বারা প্রাণ বা ঊর্দ্ধ বৃত্তির নিরোধ, অর্থাৎ বহির্দ্দেশ হইতে যথারীতি অপানবায়ুকে অন্তরে আনয়নকে পূরক, প্রাণবৃত্তির

(১) সমং কায়শিরোগ্রীবমিত্যাদিঃ। গীতা, ৬।১৩

(২) শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ। যোগসূত্র, ২।৪৯

দ্বারা অপানবৃত্তির নিরোধ, অর্থাৎ অভ্যন্তর হইতে যথারীতি প্রাণবায়ু নিঃসরণ করাকে রেচক, এবং ঐ দুই বায়ুর যুগপৎ সংযম, অর্থাৎ তাহাদের উভয়ের নিরোধকে, অর্থাৎ বায়ুকে নিঃসারণ বা আকর্ষণ না করিয়া অন্তরে ধারণ করাকে, কুম্ভক কহে (১)। শেষোক্ত অবস্থায় বায়ু চাঞ্চল্য ত্যাগ করিয়া শরীরাভ্যন্তরে স্থির হইয়া থাকে।

প্রাণায়ামে প্রাণবায়ু ধীরে ধীরে সমানভাবে চলিতে চলিতে ক্রমে ক্রমে স্থির হইয়া আসে, তাহা হইলে শরীরস্থ সমস্ত বায়ুই অবশেষে স্থির হয় এবং বায়ু স্থির হইলেই মন আপনা হইতেই স্থির হইয়া আসে; বায়ুর চঞ্চলতাতেই ইহা চঞ্চল হইয়া থাকে। যতদিন বায়ু দেহমধ্যে থাকে, ততদিনই আমাদের জীবন থাকে, ইহার চঞ্চলতাতেই আয়ুঃক্ষয় হয়, এবং ইহা সম্পূর্ণরূপে নিক্রান্ত হইলেই মৃত্যু হয়; এই জন্য বায়ুকে শরীরাভ্যন্তরে স্থির করিয়া ধারণ করিতে হয়; এবং যে সমস্ত কার্য্যে বায়ু চঞ্চল হয়, সেই সমস্ত সাধ্যমত অবস্থানুযায়ী কম করিতে হয়।

আমরা শ্বাস গ্রহণ করিলে, বায়ুর সহিত তেজ অপ্ ও ক্ষিতির কণাসমূহ অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া অন্তরস্থ দ্রব্যের সহিত ঘর্ষণে ও রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে উত্তাপ বর্দ্ধিত করে এবং ইহাতে আভ্যন্তরীণ উত্তপ্ত কণাসকল বিশ্লিষ্ট ও প্রসারিত হইয়া সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হয় ও রন্ধ্রসমূহদ্বারা কিয়দংশ বহির্গমন করিয়া থাকে। যখন পূরক ও রেচকের সহিত কুম্ভক করা যায়, সেই সময়ে বায়ুর ক্রিয়া বর্দ্ধিত হওয়ায় অভ্যন্তরে কণাসকল অধিকতর চালিত হইয়া অত্যন্ত উষ্ণ হয়, এই জন্য ঐ সময়ে অত্যন্ত গ্রীষ্ম বোধ হয় এবং ঘর্ম্মও হইয়া থাকে। তৎপরে গুরূপদেশানুযায়ী খেচরীমুদ্রা দ্বারা জিহ্বা উল্টাইয়া তালুতে

---

(১) অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ॥ গীতা, ৪।২৯

সংলগ্ন করিয়া যখন বায়ু চলাচলের প্রধান রন্ধ্রগুলি বন্ধ করা যায় এবং ঐ অবস্থায় যখন পূরক ও রেচক পরিত্যাগ করিয়া কেবল কুম্ভক করা যায়, তখন অন্তরের বায়ুর চলাচল ক্রমেই মন্দীভূত হইয়া আসে, সুতরাং আভ্যন্তরীণ উষ্ণতা লোমকূপসমূহদ্বারা বহির্গমন করিয়া ত্বক্‌কে উষ্ণ না করায়, ইহা অপেক্ষাকৃত শীতল হয়। দর্শনশ্রবণ-আঘ্রাণাদি কার্য্য ও রক্ত চলাচল ব্যান বায়ুর সাহায্যে সম্পাদিত হইয়া থাকে, কিন্তু কুম্ভককালে ঐ বায়ু অনেকটা নিশ্চল হয়, সুতরাং সেই সময়ে ইন্দ্রিয়গণ সম্পূর্ণরূপে না করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে কার্য্য করিয়া থাকে এবং রক্তও অতি ধীরে ধীরে চলাচল করিতে থাকে। প্রথম হইতেই একবারে অধিকক্ষণ প্রাণায়াম করিবার চেষ্টা না করিয়া, ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে নিয়মপূর্ব্বক অভ্যাস করিয়া ইহার সময় বৃদ্ধি করিতে হয়।

কষ্ট করিয়া আসন করিতে শিখিয়া, অথবা বিশেষ চেষ্টাপূর্ব্বক অধিককাল নাসাগ্রের প্রতি দৃষ্টিস্থাপন করিতে অভ্যাস করিয়া, কিংবা বলপূর্ব্বক অধিকক্ষণ শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিরোধ করিতে পারিয়া, কেহ কেহ মনে করেন যে তিনি যোগী হইয়াছেন, এবং ইষ্টলাভ তাঁহার করতল-গত হইয়াছে; কিন্তু ঐ প্রকার শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিরোধে তাহাদের অনিষ্ট ব্যতীত আর কিছুই হয় না। সত্ত্বগুণাবলম্বীর উপযোগী আসনপ্রাণায়ামাদি অভ্যাস করিলে শরীরে যে তেজের আধিক্য হয়, তাহা সকলে সহ্য করিতে সমর্থ না হওয়ায় এবং কঠোররূপে প্রাণায়াম করিতে যাহারা অনধিকারী, তাহারা তাহা অভ্যাস করিলে শ্বাসপ্রশ্বাসাদির গতি অযথা রুদ্ধ হওয়ায়, অনেকে কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়ে (১)।

(১) হিক্কা শ্বাসশ্চ কাসশ্চ শিরঃকর্ণাক্ষিবেদনাঃ।
ভবন্তি বিবিধা রোগাঃ পবনস্য ব্যতিক্রমাৎ॥

যম ও নিয়ম, যাহা যোগের প্রথম ও প্রধান সাধনা, তাহা রীতিমত অভ্যাস না করিলে, কিংবা সদ্‌গুরুর উপদেশ না পাইলে, অথবা ধীরে ধীরে গুরূপদেশানুযায়ী আসনপ্রাণায়ামাদি অভ্যাস না করিলে, রোগগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা; অতএব যোগশিক্ষার্থীগণের অতি সতর্কতার সহিত যোগ অভ্যাস করা উচিত। যে যতদূর অধিকারী, তাহার সদ্‌গুরুর উপদেশানুযায়ী নিজের উপযোগী এবং শাস্ত্রের বিধি ও নিয়মানুসারে যোগাভ্যাস করা কর্ত্তব্য, ইহার ব্যতিক্রম হইলেই অনিষ্ট হইয়া থাকে।

কেবলমাত্র শরীর, ইন্দ্রিয় ও শ্বাসপ্রশ্বাসাদি স্থির করিলেই যে মন স্থির হইবে তাহা নহে, ঐ সকলের ক্রিয়া মনের স্থিরতা-সম্পাদনের সহায়তা করে বটে, কিন্তু তাহা হইলেও মনকে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে দিলে, মন এবং তাহার সহিত ঐ গুলিও চঞ্চল হইয়া পড়ে। সেই জন্য শরীর, ইন্দ্রিয় এবং প্রাণাদি বায়ুকে স্থিরীকরণের সঙ্গে সঙ্গে মনকেও স্থির রাখিবার জন্য উপায় অবলম্বন করিতে হয়। স্বাভাবিক চঞ্চলতাবশতঃ মন যে যে বিষয়ে ধাবিত হয়, সেই সেই বিষয় হইতে ইহাকে যত্নপূর্ব্বক ফিরাইয়া আনিয়া যাহাতে নিযুক্ত করিবার জন্য গুরু উপদেশ দেন, তাহাতেই নিবিষ্ট করিতে হয় (১)। একটি বিষয়ে ক্রমে ক্রমে মনকে নিবিষ্ট করিতে অভ্যাস করিলে, মন আর অন্য দিকে যাইতে পারে না, ও যাইতে চাহেও না। এইরূপে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হইয়া মনের স্থিরতা সম্পাদিত হয়। মন ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণকে ইন্দ্রিয়ের

---

(১) সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামানিত্যাদয়ঃ। গীতা ৬।২৪—২৬।

বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া অন্তর্নিবিষ্ট করাকে প্রত্যাহার কহে (১)। প্রত্যাহার যোগের পঞ্চম অঙ্গ।

মনকে বহির্বিষয় হইতে অন্তর্মুখীন করিয়া গুরূপদিষ্ট কোন বিষয়-বিশেষে ইহাকে বন্ধন করিয়া রাখাকে ধারণা বলে (২)। আসনের দ্বারা অঙ্গসমূহকে, প্রাণায়ামদ্বারা অন্তরস্থ বায়ুকে, প্রত্যাহারদ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে এবং ধারণাদ্বারা চিত্তকে বশীভূত করিতে হয়। ধারণা যোগের ষষ্ঠ অঙ্গ।

ক্রমাগত অভ্যাস করিতে করিতে উপরিউক্ত ধারণীয় পদার্থে চিত্তবৃত্তির যে একতানতা জন্মে, তাহাকে ধ্যান কহে, অর্থাৎ যে বস্তুতে বাহ্যেন্দ্রিয় নিরোধপূর্ব্বক অন্তরিন্দ্রিয় ধারণ করা যায়, সেই বস্তুর জ্ঞান যদি অবিচ্ছেদে প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে তাদৃশ মনোবৃত্তিপ্রবাহ ধ্যান নামে কথিত হয় (৩)। ধ্যান যোগের সপ্তম অঙ্গ।

ক্রমে যখন ঐ ধ্যান গাঢ় হইয়া, কেবল ধ্যেয় বস্তুকে উদ্ভাসিত বা প্রকাশিত করে, এবং আপনার স্বরূপ, অর্থাৎ আমি ধ্যান করিতেছি ইত্যাদি প্রকার ভেদজ্ঞান, লুপ্ত হয়, সেই অবস্থাকেই সমাধি বলে, ইহাই যোগের অষ্টম অঙ্গ বা চরম অবস্থা। এই অবস্থায় অজ্ঞ জ্ঞান দূরে

---

(১) इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यो यत् प्रत्याहरते स्फुटम्।
यागी कुम्भकमास्थाय प्रत्याहारः स उच्यते॥ दत्तात्रेयसंहिता।
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः समाहृत्य स्थितो हि सः।
मनसा सह बुद्ध्या च प्रत्याहारेषु संस्थितः॥ गारुडम्, २४० अध्याय।

(२) देशबन्धश्चित्तस्य धारणा। पातञ्जलदर्शनम्, विभूतिपादः, १।

(३) तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्। पातञ्जलदर्शनम्, विभूतिपादः, २।
ध्येये सक्तं मनो यस्य ध्येयमेवानुपश्यति।
नान्यं पदार्थं जानाति ध्यानमेतत् प्रकीर्त्तितम्॥
गारुडे २४० अध्यायः।

থাকুক (১) ধ্যানজ্ঞানও থাকে না। সমাধিকালে চিত্তের যে কি অবস্থা হয়, তাহা তদবস্থাপন্ন ব্যক্তিরও বুঝিবার বা বুঝাইবার ক্ষমতা থাকে না; ইহা শান্তিময় কি এক অনির্ব্বচনীয় অবস্থা।

কুম্ভক অবস্থায় আভ্যন্তরীণ বায়ুসমূহ সম্পূর্ণরূপে স্থির হয় না, কিন্তু সমাধির অবস্থায় তাহা হয়, সুতরাং ইহাতে ইন্দ্রিয়গণ কেহই কিছু কার্য্য করে না এবং রক্তচলাচলও একবারে বন্ধ হওয়ায় নাড়ী নিশ্চল হয়, সুতরাং ইহার গতি একবারে অনুভূত হয় না, ত্বক্ একবারে শীতল হয়, সুতরাং মৃত্যুর বাহ্যিক লক্ষণ সমস্তই পরিস্ফুট হয়। যখন আভ্যন্তরীণ বায়ু চঞ্চল থাকে, তখন শারীরিক উপাদানসকল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সুতরাং তাহা পূরণ করিবার আবশ্যক হয় বলিয়া, আহারের এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রয়োজন হয়, কিন্তু বায়ু স্থির হইলে আহারাদির প্রয়োজন থাকে না এবং বাহ্য বায়ুর সহিতও তাহার কোন সংস্রব থাকে না। একদা কোন একটি যোগীকে ঐ প্রকার অবস্থায় বহুদিন অনাহারে মৃত্তিকাভ্যন্তরে থাকিতে দেখিয়া পাশ্চাত্য শরীরতত্ত্বজ্ঞ ও অন্যান্য ইউরোপীয়গণ যোগতত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া মুগ্ধ হইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন (২)।

---

(১) তদেবার্থমাত্রনির্ভাসমিত্যাদিঃ।

পাতঞ্জলদর্শনম্, বিভূতিপাদঃ, ৩।

(২) পঞ্জাবের রাজা রণজিৎ সিংহ যোগী হরিদাসকে একবার ৪০ দিন ও অপর একবার ১০ মাস মৃত্তিকামধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা দেখিয়া অনেকে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহারই কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল:—

"At the expiration of which period (forty days) the Maharajah, attended by his grandson, and several of his Sardars, as well as General Ventura, Captain Wade and myself, proceeded to disinter the Fakir. The bricks and the mud were removed from the

সমাধি অবস্থায় প্রাণাদি বায়ু যখন স্থির হইয়া থাকে, এবং কোন কার্য্যই করে না, অথচ কার্য্য করিবার ক্ষমতা থাকে, সুতরাং সমাধি ভঙ্গ হইয়া গেলেই আবার কার্য্য করিতে পারে, তখনই ঐ বায়ুর সত্ত্বগুণের অবস্থা; যখন শরীরাভ্যন্তরে ইহার ক্রিয়া হইতে থাকে, কিন্তু বাহ্য জ্ঞান থাকে না, তখন ইহার রজোগুণের অবস্থা বা সুষুপ্তি; এবং যখন ইহার ক্রিয়ার শক্তি থাকে না ও ক্রিয়ার যন্ত্রসকলও শিথিল হয়, তখনই ইহার তমোগুণের অবস্থা বা মৃত্যু।

---

outer doorway, the door of the gardenhouse was next unlocked and lastly that of the wooden box, containing the Fakir; the latter was found covered with a white sheet, on removing which, the figure of the man presented itself in a sitting posture: his hands and arms were pressed to his side, and his legs and thighs crossed. The first step of the operation of resuscitation consisted in pouring over his head a quantity of warm water; after this, a hot cake of *atta* was placed on the crown of his head; a plug of wax was next removed from one of his nostrils, and on this being done, the man breathed strongly through it. The mouth was now opened, and the tongue, which had been closely applied to the roof of the mouth, brought forward, and both it and the lips anointed with *ghi*; during this part of the proceeding, I could not feel the pulsation of the wrist, though the temperature of the body was much above the natural standard of health. The legs and arms being extended, and the eyelids raised, the former were well rubbed and a little *ghi* aplied to the latter; the eyeballs presented a dimmed, suffused appearance, like those of a corpse. The man now evinced signs of returning animation, the pulse became perceptible at the wrist, whilst the unnatural temperature of the body rapidly dimnished. He made several ineffectual efforts to speak, and at length uttered a few words, but in a tone so low and feeble as to render them inaudible. By and by his speech was

ঐশ্বর্য্য বা যোগসিদ্ধি।

রীতিমত যোগসাধনা করিতে করিতে আপনা হইতে কতকগুলি ক্ষমতা জন্মে, ইহাদিগকে ঐশ্বর্য্য বা সিদ্ধি বলে। সিদ্ধি আট প্রকার; যথা, অণিমা, লঘিমা, মহিমা বা গরিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব, এবং কামাবসায়িত্ব। এই সকল যোগসিদ্ধিকে বিভূতি বলিয়া থাকে।

অণিমাদ্বারা এই আয়তনবিশিষ্ট দেহকে পরমাণুর ন্যায় সূক্ষ্ম করিয়া যেখানে ইচ্ছা প্রবেশ করিতে পারা যায়; লঘিমাদ্বারা এই ভারবিশিষ্ট দেহকে ইচ্ছানুসারে লঘু করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে পারা যায়;

---

reestablished, and he recognised some of the byestanders, and addressed the Maharajah, who was seated opposite to him, watching all his movements. When the fakir was able to converse, the completion of the feat was announced by the discharge of guns and other demonstrations of joy."

DR. MC. GREGOR's *History of the Sikhs.*

"The Maharaja was, however, very sceptical on the subject, and twice in the course of ten months he remained under ground, sent people to dig him, when he was found to be in exactly the same position and in a state of perfect suspended animation.

At the termination of the ten months, Captain Wade accompanied the Maharaja to see him disintered, and states that he examined him personally and minutely, and was convinced that all animation was perfectly suspended. He saw the locks opened, and the seals broken by the Maharaja, and the box brought into the open air. The man was then taken out and on feeling his wrist and heart not the slightest pulsation was perceptible."

Osborne's *Camp and Court of Ranajit Singha.*

মহিমা বা গরিমা দ্বারা এই শরীরকে অতি বৃহৎ করিতে পারা যায়; প্রাপ্তিদ্বারা অতি দূরস্থিত বস্তু হস্তাদিদ্বারা স্পর্শ করিতে পারা যায়; প্রাকাম্যদ্বারা যাহা ইচ্ছা তাহাই লাভ করিতে পারা যায়; বশিত্ব-দ্বারা যখন ইচ্ছা যে কোন ভূত বা ভৌতিক পদার্থকে বশীভূত বা আজ্ঞা-কারী করিতে পারা যায়; ঈশিত্বদ্বারা অপরের উপর প্রভুত্ব বা কর্তৃত্ব লাভ করিতে পারা যায়, অর্থাৎ ভূত ও ভৌতিক পদার্থকে যখন যেরূপ করিতে বা রাখিতে ইচ্ছা করা যায়, সেইরূপ করিতে বা রাখিতে পারা যায়; এবং কামাবসায়িতা বা কামাবসায়িত্ব বা সত্যসংকল্পতা দ্বারা ভূত ও ভৌতিক বস্তুর প্রতি যখন যে শক্তির উদ্দেশে সঙ্কল্প উত্থিত হয়, তাহা তখনই তদ্রূপ শক্তিবিশিষ্ট হয়, ইহারই প্রভাবে বিষকে অমৃতশক্তিসম্পন্ন ও অমৃতকে বিষশক্তিযুক্ত করিতে পারা যায়।

ভারতের বহির্দ্দেশবাসী এক মহাপুরুষ যোগসিদ্ধিপ্রভাবে পাঁচখানি রুটি ও দুইটি মৎস্য দ্বারা পাঁচ হাজার লোকের ক্ষুধানিবৃত্তি, বাক্যের দ্বারা বহুতর পীড়িত ব্যক্তির ব্যাধিনিবারণ এবং পদদ্বারা সমুদ্রোপরি বিচরণাদি যে সকল অলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন (১), তৎসমুদায় শুনিয়া অপরে বিস্মিত হইতে পারে, কিন্তু আর্য্যগণের বিস্মিত হইবার বিশেষ কোন কারণ নাই। তাঁহাদের শাস্ত্রে ঐ প্রকার অসংখ্য ঘটনা প্রকটিত আছে, এবং ঐ প্রকার কার্য্য যোগপ্রভাবে করিতে পারেন এখনও এমত ব্যক্তিও সময়ে সময়ে অনেকের নয়ন-গোচর হইয়া থাকেন। নানা কারণে প্রকৃত যোগীপুরুষ সহজে কাহারও নিকট যোগসিদ্ধি প্রকাশ করেন না, এই জন্য ঐ প্রকার ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেও চিনিতে পারা যায় না।

সাধক শাস্ত্রানুযায়ী যে পথে থাক না কেন, তাহাতেই তাহার

---

(১) Mathew, Chapter 14.

যোগসাধনা হইতে থাকে, এবং সঙ্গে সঙ্গে অণিমাদিসিদ্ধি আপনা হইতেই আসিয়া থাকে। যিনি প্রকৃত সাধক, যিনি চরম লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে অনন্ত পথের পথিক হইয়াছেন, তিনি ঐ সকল প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা বা যত্ন করেন না, এবং পাইলেও তাহাতে মন নিবিষ্ট করেন না। যে ঐ সমস্ত সিদ্ধি পাইবার জন্য চেষ্টা করে, সে প্রকৃত উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া, ঐ সকলে মজিয়া, যেখানে ছিল তথায় থাকিয়া যায়, অথবা আরও অধোগমন করে। যেমন, কেহ অতি মনোরম কোন বস্তু লাভের প্রত্যাশায়, অথবা সাতিশয় সুদৃশ্য কোন পদার্থ দেখিবার আকাঙ্খায়, কোন স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইবার জন্য পথিক হইয়াছে, সে যাইতে যাইতে পথিপার্শ্বে নানাস্থানের নানা প্রকার বস্তু আপনা হইতেই লাভ করিয়া থাকে, এবং বহুবিধ সুদৃশ্য পদার্থও তাহার দৃষ্টির গোচরীভূত হয়; যদি সে সেই সকলে মজিয়া যায়, তাহা হইলে আর আকাঙ্খিত স্থান পর্য্যন্ত উপনীত হইতে পারে না, সুতরাং অভিলষিত বস্তুর লাভ বা দর্শন হইতে বঞ্চিত হয়। সাধকেরও ঠিক এইরূপ ঘটিয়া থাকে। এই জন্যই প্রকৃত সাধক যোগসিদ্ধিপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং পাইলেও তাহাতে আসক্ত হন না, অথবা তাহা অপরকে দেখাইবার জন্যও প্রয়াসী হন না।

বর্ণভেদে কার্য্যভেদ।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে মনুষ্যগণ গুণানুযায়ী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণে বিভক্ত। ঐ বিভাগ যে সমাজ সতর্কতার সহিত রক্ষা করিতে পারে, তাহাতেই চতুর্ব্বর্ণ বিশুদ্ধভাবে থাকে, নতুবা সঙ্কর বর্ণের উৎপত্তি হয় এবং সমস্ত বিশৃঙ্খল হইয়া যায়। পুরাকালে আর্য্য সমাজ ঐ প্রকার বিভাগ বিশুদ্ধভাবে রক্ষা করিয়াছিল, সেই জন্য

উন্নতির চরম সীমায়ও উপনীত হইতে পারিয়াছিল। জীবকে তাহার স্বভাব বা প্রকৃতি কর্ম্ম করাইতেছে, তাহাতে যে প্রকার গুণসংমিশ্রণ হইয়াছে, তদনুযায়ীই সে কার্য্য করিতেছে। এই প্রকার কর্ম্মই তাহার স্বাভাবিক কর্ম্ম, ইহার আচরণ সে সহজেই করিয়া থাকে। প্রত্যেক বর্ণের লোক তাহার স্বাভাবিক গুণবশতঃ নিজ নিজ স্বভাবসিদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে (১), তাহাই করিতে তাহার রুচি হয় এবং করিতেও সক্ষম হয় ও তাহাতেই সে প্রীতিলাভ করে। শাস্ত্রকারগণ প্রত্যেক বর্ণের ব্যক্তিসমূহের গুণানুযায়ী স্বাভাবিক কর্ম্মের সহিত তাহাদের সামর্থ্যানুযায়ী উৎকৃষ্ট গুণের কর্ম্মও সম্ভবমত অনুষ্ঠানের বিধান করিয়া গিয়াছেন, ইহার আচরণই তাহাদের স্বভাবানুযায়ী অতিরিক্ত ধর্ম্ম। ঐ উভয় প্রকার কর্ম্ম তাহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, এবং ঐ সকল কর্ম্মের আচরণই তাহাদের প্রকৃত স্বধর্ম্ম। ঐ সমস্ত কর্ম্ম সুন্দররূপে অনুষ্ঠান করিতে করিতে তাহারা উৎকর্ষের দিকে অগ্রসর হইতে পারে। অন্য গুণাবলম্বীর ধর্ম্ম তাহাদের উপযোগী নহে সুতরাং উহাতে তাহাদের পতন হইয়া থাকে (২)।

গুণভেদে শ্রেণীবিভাগ ও কার্য্যবিভাগ আর্য্যশাস্ত্রের বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব। অনেকে বলিয়া থাকেন যে, "মানুষ সকলেই সমান, সকলেরই সমান অধিকার হওয়া উচিত; ইহার মধ্যে শ্রেণীবিভাগ কেন? একজন উৎকৃষ্ট অপরে নিকৃষ্ট কার্য্য করিতে বাধ্য হইবে কেন? আর্য্যগণের শ্রেণীবিভাগ, কর্ম্মবিভাগ কি সাম্যভাববিহীন! কি ঘোরতর অসামঞ্জস্যপূর্ণ! ইহা উচ্চশ্রেণীর স্বার্থপরতার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত!

---

(১) ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রানাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥ গীতা, ১৮।৪১

(২) শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণ ইত্যাদি। গীতা, ৩।৩৫; ১৮।৪৭।

সকলেই কেন ব্রাহ্মণের যাগযোগতপস্যাদি কার্য্য কিম্বা ক্ষত্রিয়ের রাজ্যশাসনযুদ্ধবিগ্রহাদি কার্য্য করিতে অধিকারী হইবে না!" পাশ্চাত্য-সাম্যমন্ত্রমোহান্ধ অনেকেই প্রমাদবশতঃ আর্য্য শ্রেণীবিভাগ ও কর্ম্ম-বিভাগের উপর, আর্য্যশাস্ত্রকারগণের উপর, এইরূপ নানাপ্রকার দোষারোপ করিয়া থাকেন। মানুষ সকলে সমান নহে, এবং তাহাদের সকলের কার্য্যও সমান হইতে পারে না, তাহা পূর্ব্বে দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছি। গর্দ্দভের কার্য্য ঘোটক, কিম্বা ঘোটকের কার্য্য গর্দ্দভ করিতে কি সক্ষম হয়? তাহা হইলে কি তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, এবং তাহাতে কি তাহাদের উন্নতির ব্যাঘাত হয় না? দুইটি পৃথক্ জাতীয় জন্তুর কথা ছাড়িয়া দিয়া, যদি আমরা একজাতীয়ের মধ্যেই দেখি, তাহা হইলেও দেখিতে পাই যে, ঐ জাতীয় সকলে সমান নহে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলির সামর্থ্য, শারীরিক গঠন, প্রবৃত্তি প্রভৃতি যে প্রকার, অপরগুলির সেরূপ নহে, তাহারা যে কার্য্যের উপযোগী, অপর-গুলি তাহা নহে। যাহারা যে প্রকার কার্য্যের উপযোগী তদ্রূপই তাহাকে কার্য্য করাইতে হয়, এবং তদনুযায়ীই শিক্ষা দিতে হয়। ঘোড়দৌড়ের ঘোড়াকে যদি ছ্যাকরাগাড়ীর ঘোড়ার ন্যায় কিংবা শেষোক্তকে যদি প্রথমোক্তের ন্যায় কার্য্য করান বা শিখান যায়, তাহা হইলে কি সে তাহাতে সক্ষম হয়? তাহাতে কি অনিষ্ট হয় না? মানুষও ঐরূপ; তাহারা সকলে সমান নহে, কতকগুলির যাহা উপযোগী কার্য্য, অপরগুলির তাহা নহে।

সত্ত্বগুণাধিক্যবশতঃ ব্রাহ্মণ সত্ত্বগুণের কার্য্য করিয়া থাকে। শম অর্থাৎ মানসিক বৃত্তিসকলের নিগ্রহকরণ, দম অর্থাৎ শ্রোত্রাদি দশেন্দ্রিয়ের নিগ্রহকরণ, যজন, তপশ্চরণ, দান, শৌচ, অর্থাৎ বিবেকাদির দ্বারা অন্তঃশুদ্ধি এবং মৃজ্জলাদির দ্বারা শরীরের শুদ্ধিকরণ, বেদাধ্যয়ন বা প্রকৃত তত্ত্বের আলোচনা, বেদের অর্থের অনুভবকরণ, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের

উপলব্ধিকরণ (১), এবং বেদাধ্যাপনা, অর্থাৎ স্বয়ং তত্ত্বজ্ঞ হইয়া অপরকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান প্রভৃতি সত্ত্বগুণের কর্ম্ম; স্বভাবশতঃ ব্রাহ্মণ ন্যূনাধিকরূপে এই সমস্ত করিয়া থাকেন (২), না করিলে তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হইয়া যায়, অর্থাৎ সত্ত্বগুণ হ্রাস হইয়া যায়।

ত্রিগুণের মধ্যে যে গুণের যে পরিমাণ মনুষ্যে বর্ত্তমান থাকিলে ব্রাহ্মণবর্ণ হয়, তাহাতে তাহাকে স্বভাবতঃ উপরিউক্তরূপ কার্য্যে নিয়োজিত করে, ঐপ্রকার কর্ম্ম করিতে সে প্রীতিবোধ করে, এবং ঐরূপ কর্ম্ম না করিয়া সে থাকিতে পারে না। বেদাধ্যাপনা, যাজন, ও প্রতিগ্রহ গৃহস্থাশ্রমী ব্রাহ্মণের জীবিকানির্ব্বাহের বিশেষ কর্ম্ম, অন্য বর্ণের জীবিকার্থ এই কয়েকটি কার্য্য নহে (৩)। সত্যবাদিত্ব, হিংসাদ্বেষক্রোধলোভাদিশূন্যতা, ক্ষমাশীলতা, উদারতা, নিঃস্বার্থতা, ত্যাগশীলতা, নম্রতা, বিনয়, মৃদুতা, আস্তিক্যবুদ্ধি, ও শ্রদ্ধাপ্রভৃতি সত্ত্বগুণাবলম্বী ব্যক্তির, অর্থাৎ ব্রাহ্মণবর্ণের, বিশেষত্ব (৪), অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইলেই এগুলি থাকিবে, এবং এই সমস্ত কোন ব্যক্তিতে অধিক পরিমাণে থাকিলেই সে প্রকৃত ব্রাহ্মণ। অন্যান্য বর্ণের ঐ সমস্ত বিশেষত্ব নহে, তবে তাহাদেরও সত্ত্বগুণের অল্পতা বা আধিক্যানুযায়ী ঐ গুলি ন্যূনাধিকরূপে থাকে (৫)। ব্রাহ্মণ সকলেরই বৃত্তির উপায়

---

(১) বেদের শব্দসমূহের কেবলমাত্র নিজবোধগম্য কথার দ্বারা অর্থ বোঝা বেদার্থ অনুভবকরণ নহে।

(২) শমোদমস্তপঃ শৌচমিত্যাদিঃ। গীতা, ১৮।৪২

(৩) অত্রি, ১৩, ২০ ; মনু, ১০.১, ৭৫-৭৬।

(৪) অত্রি, ৩২।

(৫) বিষ্ণু, ২। ৩, ৮।

জানিবেন, এবং তৎসম্বন্ধে তাহাদিগকে উপদেশ দিবেন, কিন্তু স্বয়ং ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন (১)।

রাজ্যশাসন ও রক্ষণ, প্রজাপালন, দুষ্টের দমন, শিষ্টের রক্ষণ, যুদ্ধ, ন্যায়ানুসারে ধনসঞ্চয়, বিচারার্থীদিগের উপর অপক্ষপাতিতা, এবং রাজকার্য্যপরিচালনের জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্য্যাদি ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক কর্ম্ম (২); অর্থাৎ ত্রিগুণের যে পরিমাণ সংমিশ্রণে ক্ষত্রিয় হয়, তাহাতে তাহাকে স্বভাবতঃ ঐ প্রকার কার্য্যে নিযুক্ত করে। ক্ষত্রিয়ের বেদাধ্যাপনা, যাজন ও প্রতিগ্রহ করা কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু শমোদমাদি ব্রাহ্মণের অন্যান্য কার্য্য ব্রাহ্মণ হইতে ন্যূন পরিমাণে তাহাদের আচরণীয়। শৌর্য্য, তেজ, ধৈর্য্য, কার্য্যদক্ষতা, সাহস, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা, দানশীলতা, প্রভুত্ব, এবং ঐশ্বর্য্যাদি রজঃসত্বগুণাবলম্বীর বা ক্ষত্রিয়ের বিশেষত্ব, অর্থাৎ ঐ সমস্ত ন্যূনাধিকরূপে ক্ষত্রিয়ে বর্ত্তমান থাকে (৩)। যদি উপরোক্ত রাজ্যশাসনাদি কার্য্যে কাহারও সত্ব-গুণের ভাব না থাকে, অর্থাৎ সত্বগুণের বশীভূত না থাকিয়া, স্বার্থের উত্তেজনায় বা লোভবশতঃ, অথবা পরস্বাপহরণ করিবার জন্য, কিংবা ঈর্ষাদ্বেষহিংসাদির বশবর্ত্তী হইয়া, যদি কেহ ঐ সকল কর্ম্ম করে, তাহা হইলে সে প্রকৃত ক্ষত্রিয় নহে, সে নিকৃষ্ট গুণাবলম্বী নীচবর্ণের মনুষ্য। কেহ ক্ষত্রিয় হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেও ঐ সকল কার্য্য ঐ প্রকারে তমোগুণের বশীভূত হইয়া আচরণ করিতে করিতে ক্রমশঃ নিকৃষ্ট বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়।

---

(১) सर्व्वेषां ब्राह्मणो विद्याद्‌वृत्त्युपायान् यथाविधिः।
प्रब्रूयादितरेभ्यश्च स्वयञ्चैव तथा भवेत्॥ मनु, १०।२।

(२) अत्रि, १४, २८; मनु, १०।७९।

(३) शौर्य्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यमित्यादिः। गीता, १८।४३।

ভূমিকর্ষণ, গোপালন, বাণিজ্য, কুষীদগ্রহণ ইত্যাদি বৈশ্যগণের জীবিকার্থ স্বাভাবিক কর্ম্ম (১)। বেদাধ্যাপনাদি ব্যতীত শমঃ প্রভৃতি ব্রাহ্মণের অন্যান্য যে সকল কর্ম্ম উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সমস্ত ক্ষত্রিয় হইতে কম পরিমাণে ইহাদের আচরণীয় (২)। রজোগুণাধিক্যবশতঃ অস্থিরতা, চতুরতা, কার্য্যকুশলতা, কার্য্যকরণে উদ্যম, উৎসাহ ও অনালস্য, ধন উপার্জ্জনে ও রক্ষণে পটুতা প্রভৃতি বৈশ্যের বিশেষত্ব। তমোগুণবশতঃ কৃপণতা, ধূর্ত্ততা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি কিয়ৎ পরিমাণে বৈশ্যে বর্ত্তমান থাকে।

বৈশ্যগণ অধিকতর অর্থলাভের জন্য সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয় না, কিংবা তাহা হইতে বিরত হয় না। তমোগুণের আধিক্যবশতঃ ভয় এবং কার্য্যে অনুদ্যম বা অনুৎসাহ হইয়া থাকে, এই জন্যই শূদ্র ব্যবসাবাণিজ্যাদিতে অসমসাহসিকতা, উদ্যম ও উৎসাহ দেখাইতে পারে না, সুতরাং ইহা তাহাদের উপযোগী কর্ম্ম নহে। রজোগুণবশতঃ মনুষ্যকে ঐ প্রকার কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে; কিন্তু রজোগুণ প্রবল হইলেও যদি স্বভাবতঃ, অথবা যে সময়ে ঐ প্রকার কোন একটি বিশেষ কার্য্যে সে প্রবৃত্ত হয়, সেই সময়ে, তাহার সত্ত্বগুণ ক্ষীণ হয়, তাহা হইলে তাহার দূরদর্শিতা থাকে না, সুতরাং তাহার ঐ কার্য্য নিষ্ফল হইয়া সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়। আবার যে সত্ত্ব-গুণাধিক তাহার দূরদর্শিতা থাকিলেও রজোগুণ ক্ষীণ বলিয়া, সে অর্থ-লাভের জন্য ব্যগ্র হয় না, সুতরাং ইহার জন্য কার্য্যকুশলতা, উদ্যমশীলতা ও উৎসাহ অধিক পরিমাণে প্রয়োগ করিতে তাহার ইচ্ছা হয় না, সেই

---

(১) कृषिगोरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म्मस्वभावजम्। गीता, १८।४४;

(২) मनु, १०।७९; अत्रि, १५।

কারণবশতই সে ঐ প্রকার কার্য্যে প্রায়ই অকৃতকার্য্য হয়। এই জন্যই সত্ত্বগুণাবলম্বী বা প্রকৃত ব্রাহ্মণবর্ণ ব্যবসাবাণিজ্যাদিতে সকল সময়ে লাভবান্ হইতে পারে না, এবং ঐ কার্য্য তাহার স্বাভাবিক কার্য্যও নহে। ক্ষত্রিয়গণের ঐ প্রকারে অর্থোপার্জ্জনে প্রবৃত্তি হয় না বলিয়া, তাহারাও তাহাতে উন্নতিলাভ করিতে পারে না।

অপর তিন বর্ণের শুশ্রূষা এবং শিল্পকার্য্য শূদ্রের স্বাভাবিক কর্ম্ম (১)। তমোগুণাধিক্যবশতঃ আলস্য, অদূরদর্শিতা, কার্য্যে অনুদ্যম ও উৎসাহহীনতা, অধিকক্ষণ চিন্তা করিতে অক্ষমতা, কামক্রোধাদি রিপুগণের বশীভূততা এবং তজ্জন্য হিতাহিতজ্ঞানশূন্যতা, নিষ্ঠুরতা, ক্রূরতা, শঠতা, প্রবঞ্চকতা, এবং কৃপণতা প্রভৃতি অধিক পরিমাণে শূদ্রে বর্ত্তমান থাকে।

শূদ্রে সত্ত্বগুণ ক্ষীণ থাকে, সুতরাং তাহারা কেবল কায়িক শ্রমেরই উপযোগী, অধিক চিন্তাশক্তি প্রয়োগদ্বারা মানসিক পরিশ্রম করিতে সক্ষম নহে। এই জন্য যে সকল কার্য্যে বুদ্ধিবৃত্তিপরিচালনার বিশেষ আবশ্যক না থাকে, যাহা কেবলমাত্র শারীরিক বল ও পরিশ্রমের দ্বারা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, তাহাই করিতে তাহারা সমর্থ ও উপযোগী, এবং সেই সমস্তই তাহাদের জীবিকানির্ব্বাহার্থ কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

শূদ্র হইতে বৈশ্যবর্ণে অধিকতর সত্ত্বগুণ থাকে, এবং ইহা হইতে আবার ক্ষত্রিয়বর্ণে ঐ গুণের আধিক্য থাকে, সুতরাং যে সকল কার্য্যে অধিক হইতে অধিকতর বুদ্ধিপরিচালনা ও মানসিক শ্রমের প্রয়োজন, তাহাই যথাক্রমে ঐ প্রত্যেক বর্ণ আচরণ করিতে সক্ষম হয়, এবং সেই

---

(১) অত্রি, ১৫।

परिचर्य्यात्मकं कर्म्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। गीता, १८।४४

সমস্তই তাহাদের জীবিকার্থ উপযোগী ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ব্রাহ্মণবর্ণে সকল মনুষ্য অপেক্ষা সত্ত্বগুণ অধিকতম, সুতরাং তাঁহারা অত্যধিক মানসিক শ্রম করিতে কুণ্ঠিত বা ক্লিষ্ট হন না, অতএব যে সকল কার্য্যে সাতিশয় বুদ্ধিপ্রয়োগের ও গভীর চিন্তাশক্তির প্রয়োজন, তাহাই তাঁহাদের কর্ত্তব্য কার্য্য, এবং সেই সকল করিতেই তাঁহারা প্রীতিবোধ করেন। তাঁহারা যে প্রকার গুণত্রয় লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে অপর তিনবর্ণের কর্ত্তব্য কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে তাঁহারা সক্ষম হন না, এবং তাহাতে তাঁহাদের উৎকর্ষসাধনত হয়ই না, বরং অবনতিই হইয়া থাকে।

পুরাকালে আর্য্যগণ নির্দ্দিষ্ট কতক স্থানকে সীমাবদ্ধকরতঃ প্রত্যেক স্থানের মনুষ্যগণকে গুণানুযায়ী চারিবর্ণে বিভাগ করিয়া এক একটি সমাজ গঠন করিয়াছিলেন। শাস্ত্রবিধিকর্ত্তৃক শাসিত হইয়া ঐ প্রত্যেক সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি জীবিকার্থ অথবা অন্য কোন প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য স্বভাববশতঃ নিজ বর্ণানুযায়ী কার্য্যের আচরণ করিত, এবং শাস্ত্রানুমোদিত নিয়মের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া উৎকর্ষের দিকে অগ্রসর হইত। কেহ নিকৃষ্ট বর্ণের উপযোগী কার্য্য করিলে সে স্ববর্ণীয় লোককর্ত্তৃক ঘৃণিত এবং ঐ বর্ণ হইতে ভ্রষ্ট হইত (১), এবং কেহ সাধনাবলে প্রকৃত উন্নতিলাভ করিলে সে উচ্চবর্ণীয়ের মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইত। ব্রাহ্মণগণ সমাজের শীর্ষস্থানে থাকিয়া নিঃস্বার্থভাবে সকলের হিতচিন্তা করিতেন, এবং নিজ কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া ক্রমশঃ উৎকর্ষের সোপানোপরি সোপানে আরোহণ করিতেন। রাজমুকুট তাঁহাদের পদতল স্পর্শ করিতে পারিলে যেন কৃতার্থ বোধ করিত। তাঁহাদের সেবা করিবার জন্য বিষয়বৈভবলক্ষ্মীর আগ্রহাতিশয়

(১) মনু, ৭০।৫৩।

থাকিলেও প্রত্যাখ্যাত হইবার ভয়েই যেন তিনি তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইতে পারিতেন না। আর্য্যগণ পূর্ব্বে সত্ত্বগুণের আদর করিত, তাই তাহাদের সমাজে ব্রাহ্মণের সম্মান ছিল, অধুনা তাহার অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে। আর্য্য সমাজ কর্ম্মবিপাকে পড়িয়া বহুদিন হইতে নানা কারণে ক্রমশঃ উন্নতির উচ্চমঞ্চ হইতে অবনতির দিকে পতিত হওয়ায় অধুনা অধঃপতনের শেষ সীমায় উপনীত হইতেছে, এবং ইহার অন্তর্জ্যোতিঃ ক্রমেই মন্দীভূত হওয়ায় পাশ্চাত্য সমাজের বাহ্য চাক্‌চিক্যের নিকট ইহাকে আরও যেন হীনপ্রভ বলিয়া বোধ হইতেছে। পাশ্চাত্য অনেক সমাজে যদিও সত্ত্বগুণের অধিক আদর নাই, তাহাদের মধ্যে যাহারা ব্রাহ্মণরূপে পরিগণিত তাহারা যদিও রাজশক্তির নিকট অবনত, এবং যদিও রাজাজ্ঞা প্রতিপালনই তাহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তথাপি ঐ সকল সমাজ তাহাদিগকে কিয়ৎপরিমাণে সম্মান করিয়া থাকে, এবং তাহাদের প্রতিপালনের ভারও লইয়া থাকে। কিন্তু আধুনিক আর্য্য সমাজ ঐ সকল সমাজের অনুকরণ করিতে গিয়া অনুকরণীয়কেও মন্দের দিকে অতিক্রম করিয়াছে এবং ক্রমেই আরও অধঃপতিত হইতেছে।

পুরাকালে আর্য্যসমাজে ব্রাহ্মণের মধ্যে সকলেই যে বেদজ্ঞ হইয়া অহর্নিশ ব্রহ্মচিন্তায় মগ্ন থাকিতেন তাহা নহে; তাঁহারা সত্ত্বগুণের তারতম্যানুযায়ী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন এবং গুণানুযায়ী স্ব স্ব শ্রেণীর কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন। ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়া অনেকেই এক্ষণে চণ্ডালের বৃত্তির অনুসরণ করিতেছে, সত্ত্বগুণ হারাইয়া তমোগুণপ্রধান শূদ্রবর্ণের মধ্যে অধম শ্রেণীর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহারা যে শূদ্রের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ক্রমে ক্রমে সত্ত্ব-গুণ হারাইয়াছে, তাহা যে কেবল তাহাদেরই দোষে তাহা নহে; অন্য তিন বর্ণ পূর্ব্ববৎ আর তাহাদের রক্ষা, প্রতিপালন ও সম্মানাদি

করে না, এই প্রকার করিলে তাহারা নিশ্চিন্ত মনে সত্ত্বগুণের কার্য্য করিতে করিতে ক্রমশঃ উৎকর্ষ লাভকরতঃ অবশেষে কেবল ব্রহ্মচিন্তায় মগ্ন হইতে পারিত।

সত্ত্বগুণের সহিত ক্ষীণতমোগুণযুক্ত যিনি পূর্ণরজোগুণবিশিষ্ট তিনিই রাজার উপযুক্ত পাত্র এবং ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইতেন। তিনি অন্যান্য ক্ষত্রিয়ের সাহায্যে বহিঃশত্রু হইতে অপর তিন বর্ণের লোককে রক্ষা করিতেন, এবং সমাজের মধ্যে যদি কেহ দুর্ব্বৃত্ত হইয়া কণ্টকস্বরূপ হইত তাহাকে শাস্তিপ্রদান করিতেন। রাজ্যের সুশৃঙ্খলার জন্য ব্রাহ্মণগণ যে সমস্ত বিধি করিতেন, সেই সকল তিনি কার্য্যে পরিণত করিয়া রাজ্যে শান্তি সংস্থাপন করিতেন ক্ষত্রিয়গণ সকলেই যে রাজা হইত বা যুদ্ধ করিত তাহা নহে, রাজকার্য্যপরিচালনা এবং রাজ্যের শান্তির জন্য অপর যে সমস্ত সত্ত্বরজোগুণের কার্য্য করিবার প্রয়োজন হইত, তাহাও ক্ষত্রিয়গণ করিত। তাহারা ত্রিগুণের তারতম্যানুযায়ী পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, এবং গুণানুযায়ী স্ব স্ব শ্রেণীর কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। ভারতের আধুনিক অবস্থায় ক্ষত্রিয়ের প্রধান কার্য্য, অর্থাৎ রাজকার্য্য পরিচালনা, প্রজাপালন এবং যুদ্ধাদি করা, ভারতীয় ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে দুর্লভ হইয়াছে, সুতরাং সংসারযাত্রানির্ব্বাহার্থ অন্যান্য বর্ণের কার্য্য অবলম্বন ব্যতীত তাহাদের উপায়ান্তর নাই।

ভারতে যে ক্ষত্রিয়গণের রজোগুণ হ্রাস হইয়াছিল, অথবা শৌর্য্য বীর্য্য নষ্ট হইয়াছিল, তাহা নহে, এবং সেই জন্যই যে আর্য্যসমাজ পদদলিত হইয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে, তাহাও নহে। কালবশে ব্রাহ্মণকুলজাত ব্যক্তিগণের যখন সত্ত্বগুণ মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছিল, স্বার্থপর হইয়াছিল বলিয়া যখন তাঁহারা ক্ষত্রিয়গণকে নিঃস্বার্থভাবে উপযুক্ত পরামর্শ দিতে সমর্থ হন নাই, এবং ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব ব্যক্তিগণ যখন

সত্বগুণ হারাইয়া ঈর্ষাদ্বেষাদিপূর্ণ হইয়া, স্বার্থপরতার দাস হইয়া, তামসিক পাশববলে বলীয়ান্ হইয়া অভিমানিত হইয়াছিল, তখন হইতেই ঐ সমাজের দুর্দ্দশার সূত্রপাত হইয়াছে। আবার কি কখন প্রকৃত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ঐ সমাজে জন্মিয়া ইহার উন্নতি সাধন করিতে পারিবে! হায়! সে আশা কি আর আছে!

বৈশ্যগণ ধনরক্ষা ও সকলের জন্য আহার্য্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিত। তাহারাও গুণানুযায়ী পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, এবং প্রত্যেক শ্রেণী গুণের উপযোগী কার্য্যের অনুষ্ঠান করিত।

শূদ্রগণের মধ্যেও ঐ প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রেণীবিভাগ ছিল। তাহারা অন্য তিন বর্ণের শুশ্রূষা করিত এবং তাহাদের উপদেশানুযায়ী শিল্পকার্য্য-প্রভৃতিদ্বারা নানাপ্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিত। তাহারা উহাদের সেবা করিত বলিয়া যে ক্রীতদাসের ন্যায় ছিল তাহা নহে। চারিটি বর্ণ যেন এক পরিবারে চারিটি ভ্রাতা, ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ যেন সর্ব্বজ্যেষ্ঠ এবং শূদ্র যেন সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিল। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে যেমন ভালবাসে, এবং কনিষ্ঠ যেমন জ্যেষ্ঠকে সম্মান করে, সেইরূপ চারিবর্ণের মধ্যে উৎকৃষ্ট বর্ণের ব্যক্তি নিকৃষ্টকে, এবং নিকৃষ্ট উৎকৃষ্টের প্রতি ব্যবহার করিত। সাধারণতঃ যাহার যত জন্ম অতীত হইয়াছে, সে তত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, এবং সেই তত অগ্রে প্রথম জন্ম লাভ করিয়াছে, সুতরাং যাঁহারা ব্রাহ্মণোচিত গুণ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারাই বিদ্যমান মনুষ্যগণের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে মনুষ্যজন্মলাভ করিয়াছেন, তৎপরে ক্রমাগত এক জন্ম হইতে জন্মান্তর পরিগ্রহ করিতে করিতে, উৎকর্ষের সোপানোপরি সোপানান্তরে অগ্রসর হইতে হইতে, অধিকতম সংখ্যক জন্ম গ্রহণ করিয়া, সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই জন্য তাঁহারাই সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। এই প্রকারে ঐরূপ গুণাবলম্বী

শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিগণ সকল সময়েই সর্ব্বজ্যেষ্ঠ এবং সেই জন্যই শাস্ত্র তাঁহাদিগকে অগ্রজন্মা বলিয়াছে (১)। ব্রাহ্মণগণের পরে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ক্রমান্বয়ে পর পর মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াছে, সুতরাং তাহারা ক্রমশঃ কনিষ্ঠ এবং উৎকর্ষেও ক্রমে ক্রমে ন্যূন।

আর্য্যগণের মধ্যে পুরাকালে সমাজের পুষ্টিসাধনের জন্য এবং স্ব স্ব উন্নতির উদ্দেশ্যেই এক বর্ণ অপর বর্ণের সাহায্য করিত, এবং সেই বর্ণ যে কার্য্যের উপযোগী ও যাহা করিতে সক্ষম তাহারই আচরণ করিত। এক একটি বর্ণীয় বা প্রত্যেক বর্ণের অন্তর্গত এক একটি শ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণ অনেকটা সমগুণাবলম্বী বলিয়া প্রায় একই প্রকার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের অনুষ্ঠান করিত। যাহারা যে গুণের আধিক্য লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা সেই গুণের কার্য্য করিতে সক্ষম, সুতরাং তাহাই করিতে করিতে তাহারা ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিত। এতদ্ব্যতীত যে ব্যক্তি যে শ্রেণীতে জন্মলাভ করিত, সে বাল্যাবধি পিতা ভ্রাতা আত্মীয় স্বজন প্রভৃতিকে সেই একই প্রকার কার্য্য করিতে দেখিত এবং তাহারই বিষয় সর্ব্বদাই শুনিত, সুতরাং সহজেই তাহার ঐ প্রকার কার্য্যে অভিজ্ঞতা ও নৈপুণ্য জন্মিত এবং সে উহা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিত; ইহাও ঐ ব্যক্তির উৎকর্ষলাভের আরও একটি কারণ হইত, এবং ঐ সঙ্গে সঙ্গে সমাজেরও উন্নতি হইত। এক শ্রেণীস্থ ব্যক্তি অপর শ্রেণীর কর্ম্ম করিতে গেলে, তাহার ততদূর কার্য্যপটুতা হয় না, এবং উহা শিক্ষা করিতেও অধিক সময় বৃথা নষ্ট হইয়া থাকে। এই জন্য পুরাতন আর্য্যগণ প্রত্যেক

---

(১) एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः ।
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्व्वमानवाः ॥
मनु, २।२०।

বর্ণকে বিশুদ্ধভাবে রাখিবার জন্য, এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজ নিজ বর্ণ বা তদন্তর্গত শ্রেণীর অনুষ্ঠেয় কার্য্য করাইবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন, এবং শাস্ত্রের শাসনে ও সমাজের দৃঢ়বন্ধনে ঐ সমাজ ঐ প্রকারে অক্ষুন্ন ভাবে চলিয়া আসিয়াছিল। যে যেমন কার্য্যের উপযোগী, সে সেই রকম কার্য্য করিত। উৎকৃষ্ট বর্ণের ব্যক্তি যদি স্বকীয় বর্ণোপযোগী বৃত্তিদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহে অক্ষম হইত, তাহা হইলে পর পর বর্ণের আচরণোপযোগী কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারিত (১)। ইহাতে যদিও তাহাদের সম্মানের লাঘব হইত, কিন্তু বর্ণচ্যুত হইত না। নিকৃষ্ট বর্ণের ব্যক্তি অহঙ্কারবশতঃ উচ্চবর্ণের অনুষ্ঠেয় কার্য্যের আচরণ করিত না, কিম্বা তাহা অপেক্ষা আপনাকে উচ্চ অথবা তাহার সমান মনে করিত না। যাহারা নীচগুণাবলম্বী তাহারা ঐ প্রকার উচ্চ মনে করিলেই সমাজের বিপ্লব উপস্থিত হয়।

ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ, যেন সমাজের শিরোদেশ, হস্ত, উরু ও পদ, এই চারিটি অঙ্গ। এই অঙ্গচতুষ্টয় যেমন পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে পরিপুষ্ট হয়, সমাজের পক্ষেও তদ্রূপ হইয়া থাকে, এবং এক অঙ্গ যেমন অপর অঙ্গের কার্য্য করিলে ব্যাধিগ্রস্ত হয়, সমাজেরও তদ্রূপ বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। যে সমাজের ঐ চারিটি অঙ্গ পৃথক্ পৃথক্ রূপে নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট ও উপযোগী কার্য্য নির্ব্বাহ করে না, তাহা অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারে না। যে সমাজের সত্ত্বগুণাবলম্বী শ্রেণী শিরোদেশ নহে, এবং হস্ত, উরু, বা পদ যেখানে মস্তক হইতে উচ্চ বা উহার সহিত সমান ভাবিয়া থাকে, কিম্বা তাহারই কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হয়, সেখানে অশান্তির ঝটিকা সর্ব্বদাই প্রবহমান হয়। কেবল যে ঐ প্রকার নিকৃষ্ট গুণাবলম্বী ব্যক্তিগণের দোষেই ঐ সব সমাজে অশান্তি ঘটিয়া থাকে

---

(১) বিষ্ণুসংহিতা, ২।৬ ; মনু, ১০।৮১, ৮২।

তাহা নহে। যে সমাজে সত্ত্বগুণাবলম্বীর আদর নাই, সুতরাং ঐ প্রকার ব্যক্তি যেখানে রাজ্যশাসনকার্য্যে উপদেষ্টা নয়, এবং যেখানে রাজ্য-শাসকগণ প্রকৃত ক্ষত্রিয়বর্ণ নহে, অর্থাৎ তাহারা সত্ত্বগুণহীন পাশববলে বলীয়ান্ ও স্বার্থে অন্ধ হইয়া, পররাজ্যলোলুপ বা পরস্বাপহারী হয়, সেই সমাজে অশান্তি বহ্নি ঘন ঘন প্রজ্বলিত হইয়া থাকে। যাহাদের রাজ্যের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হয় না, প্রভুত্বলাভের পিপাসা মিটে না, ধনলালসা কিছুতেই শান্ত হয় না, তাহাদের সমাজের অন্তরে বাহিরে অশান্তিবহ্নি দাবানলসদৃশ অকস্মাৎ প্রজ্বলিত হইয়া উঠে; তখন উহার বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী।

আর্য্যসমাজে যতদিন বিশুদ্ধরূপে চতুর্ব্বর্ণের বিভাগ ও সত্ত্বগুণের আদর ছিল, ততদিন কোন প্রকার অশান্তি বা বিপ্লবের আশঙ্কা ছিল না। ঐ সমাজ এক্ষণে ব্যাধিগ্রস্ত হইলেও বর্ণভেদের ছায়া আছে বলিয়া এখনও জীবিত আছে। কত সমাজের যে অভ্যুত্থান ও পতন হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু আর্য্যসমাজ চিরদিন আছে ও থাকিবে। যদিও সম্প্রতি ইহার ব্রাহ্মণরূপ মস্তক ও ক্ষত্রিয়রূপ বাহু ক্ষীণ হইয়াছে, উদরে অন্ন নাই ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির ও রোগে জীর্ণকলেবর হওয়ায় প্রকৃত বৈশ্যত্বও লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, এবং শরীরের অধিকাংশ রস যেন শূদ্ররূপ পদে সঞ্চারিত হওয়ায় ইহাকে দেখিলে শ্লীপদব্যাধিগ্রস্তের ন্যায় বোধ হইতেছে, তথাপি আমার এই নিরাশ হৃদয়ে ক্ষীণ আশার আলোক সঞ্চারিত হইয়া যেন দেখাইতেছে যে, যিনি অঘটন ঘটাইতে পারেন তিনি সকলকে সুমতি দিবেন, আবার অধিক পরিমাণে সত্ত্বগুণ সঞ্চারিত করিয়া সেই গুণের প্রাধান্য স্থাপন করিবেন, এই সমাজকে নির্ব্ব্যাধি করিয়া আবার পূর্ব্ববৎ পরিপুষ্ট করিবেন।

চতুরাশ্রম।

জীবনের পৃথক্ পৃথক্ সময়ে, অর্থাৎ শৈশবাদি পৃথক্ পৃথক্ অবস্থাতে এক একটি গুণের প্রবলতা হইয়া থাকে। গুণত্রয়ের ঐরূপ ক্ষণিক তারতম্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পৃথক্ পৃথক্ গুণাবলম্বীর জন্য, অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ বর্ণের জন্য, শৈশবাদি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাতে শাস্ত্রকারগণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা যে কৈশোরাবস্থা হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সময়কে পৃথক্ পৃথক বর্ণের পক্ষে পৃথক্ পৃথক্ ভাগে বিভক্ত করিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কর্ত্তব্য কার্য্য অনুষ্ঠানের বিধি নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, সেই পৃথক পৃথক্ ভাগকে এক একটি আশ্রম বলে। সত্বগুণাবলম্বীর বা ব্রাহ্মণের জীবনকে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ, বাণপ্রস্থ, এবং যতি বা সন্ন্যাস, এই চারি ভাগে বা চতুরাশ্রমে, ক্ষত্রিয়ের প্রথম তিন ভাগে এবং বৈশ্যের প্রথম দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। শূদ্রের গার্হস্থাশ্রম ব্যতীত অন্য কোন আশ্রম নির্দ্দিষ্ট হয় নাই।

ব্রহ্মচর্য্য।

ইন্দ্রিয়সমূহকে দমন এবং রিপুগণকে জয় করিবার জন্য যে সংযম-সাধনা তাহাকেই সাধারণতঃ ব্রহ্মচর্য্য বলে। কিন্তু কর্ম্ম, মন ও বাক্য দ্বারা সকল অবস্থাতে, সর্ব্বদা, সর্ব্বত্র যে মৈথুনত্যাগ প্রধানতঃ তাহাকেই ব্রহ্মচর্য্য কহিয়া থাকে (১), সুতরাং যিনি বীর্য্যধারণ করেন,

---

(১) कर्म्मणा मनसा वाचा सर्व्वावस्थासु सर्व्वदा।
सर्व्वत्र मैथुनत्यागो ब्रह्मचर्य्यं प्रचक्षते॥
योगियाज्ञवल्क्यम्, १, ५।

তিনিই প্রকৃত ব্রহ্মচারী। ভুক্ত ও পীত দ্রব্য রসাদিরূপে পরিণত হইয়া সর্ব্বশেষে শুক্র হয়, এবং তাহারই সূক্ষ্ম সারাংশ ওজঃ; এতৎসম্বন্ধে পূর্ব্বে আহারপরিচ্ছেদে বিশেষরূপে বলা হইয়াছে। এই ওজঃ দ্বারাই দেহ রক্ষিত হয়, ইহার স্থিতিতে জীবনের স্থিতি এবং ইহার নাশেই দেহের নাশ হয়। ইহার বৃদ্ধিতে দেহের তুষ্টি, পুষ্টি ও বলোদয় হয়, এবং ইহা হইতেই উৎসাহ, প্রতিভা, ধৈর্য্য, লাবণ্য, সৌকুমার্য্য প্রভৃতি হইয়া থাকে (১)। সুতরাং শুক্রধারণ করিতে পারিলে শরীর ও মনের উপকার সাধিত হয়; এবং ইহার অযথা অপব্যয়ে মানুষ নিস্তেজ ও জড় হইয়া পড়ে, এবং স্ফূর্ত্তি ও উদ্যমবিহীন এবং কর্ম্মে অপটু হয়; তাহার শৌর্য্য, বীর্য্য, শক্তি, তেজ, বল, উদ্যম, উৎসাহ সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়, সে নানা প্রকার ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া চিরজীবন কষ্ট পায়, এবং অবশেষে তাহার শীঘ্র জরা ও মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়। যাহা এত উপকারী এবং যাহা বৃথা ব্যয় হইলে এত অনিষ্ট ঘটে, তাহা যাহাতে ধারণ করিতে পারা যায়, প্রধানতঃ তাহারই সাধনা করা এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণকে দমন এবং রিপুগণকে বশীভূত করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, ইহাই প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য। যাহারা ঊর্দ্ধরেতা হইয়া যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিতে না পারে, তাহারা যাহাতে অন্ততঃ

---

(১) ओजस्तु तेजो धातूनां शुक्रान्तानां परं स्मृतम्।
हृदयस्थमपि व्यापि देहस्थितिनिबन्धनम्॥
यस्य प्रवृद्धौ देहस्य तुष्टिपुष्टिबलोदयः।
यन्नाशे नियतो नाशो यस्मिं स्तिष्ठति जीवनम्॥
निष्पद्यन्ते यतो भावा विविधा देहसंश्रयाः।
उत्साहप्रतिभाधैर्य्यलावण्यसुकुमारताः॥

वाग्भटः।

জীবনের প্রথমাবস্থায় কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত ইহা অবলম্বন করিতে পারে, তাহারই চেষ্টা ও যত্ন করিতে হয়, তাহা হইলে উদ্দাম যৌবনে ইন্দ্রিয়গণ দুর্দ্দমনীয় হইয়া সীমা অতিক্রম করিতে পারে না, এবং তাহাদের সকল রিপুই এমন কি দুর্জ্জয় কামরিপুও জয়িত ও বশীভূত হয়, সুতরাং তাহাদের শুক্র বৃথা ক্ষয় হইয়া শরীর ও মন দুর্ব্বল হয় না। এই জন্যই বাল্যাবস্থা অতিক্রম করিয়া কিশোরাবস্থায় উপনীত হইলে দ্বন্দ্বসহিষ্ণু হইয়া সংযমী হইবার জন্য শাস্ত্রকারগণ নানাপ্রকার সাধনার বিধান করিয়া গিয়াছেন, সেই সাধনার অবস্থাই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। যাহাদের তমোগুণ অধিক, তাহারা ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে সক্ষম হয় না, সুতরাং তাহারা এই আশ্রমের উপযোগী নহে, অতএব কেবল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরই এই আশ্রম অবলম্বনীয়, শূদ্রের নহে।

কামক্রোধলোভাদি রিপুগণকে জয় করা এবং ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া রাখাই সংযম। এই সংযমঅভ্যাসই আর্য্যগণের আজীবন প্রধান কার্য্য, এবং ইহাই আর্য্যধর্ম্মের মূলভিত্তি। যতই সত্ত্বগুণ প্রবল হয় ততই মানুষ সংযমী হইতে সক্ষম হয়। সে এজন্মে যতটুকু সংযম অভ্যাস করে, পরজন্মে তাহাই লইয়া জন্মগ্রহণ করে, এবং তদুপযোগী অভ্যাস করিতে পুনরায় আরম্ভ করে। শূদ্র ব্রহ্মচর্য্যের কঠোরতা সহ্য করিতে সক্ষম হয় না, তাহারা কেবলমাত্র গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াই সংযম অভ্যাস করে, এবং দ্বিজগণের সেবা করিয়া তাহাদেরই অনুকরণ করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করে। দ্বিজগণ স্ব স্ব সামর্থ্যোপযোগী, অর্থাৎ নিজ নিজ বর্ণানুযায়ী, কিশোরাবস্থায় ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিয়া সংযম শিক্ষা করে, তৎপরে যৌবনে গৃহস্থাশ্রমে তাহাদের ইহা শিক্ষা ও পরীক্ষা উভয়ই হইয়া থাকে। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই সে আশ্রমান্তরগ্রহণের উপযোগী হয়, বিশেষরূপে সংযমী হইতে অভ্যস্ত না হইলে সে গার্হস্থ্যের পরে বাণপ্রস্থাশ্রমের অধিকারী হয় না।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের কঠোরতার পরে গৃহস্থাশ্রম প্রবেশ করিয়াই যে সে নিষ্কৃতি পায় তাহা নহে, বরং ইহাতে নানাপ্রকার বিধি ও নিষেধের দ্বারা সংযমশিক্ষার অধিকতর কঠোরতা তাহাকে সহ্য করিতে হয়, যেহেতু চিত্তের বিকারকারণ উপস্থিত থাকিতেও ইহার বিকার হইবে না, ইহাইত বাস্তবিক কঠিন, এবং কতদূর সংযমশিক্ষা হইল ইহাতে তাহাও ভালরূপে পরীক্ষা করিতে পারা যায়।

মানুষের যতদিন পর্য্যন্ত বুদ্ধির স্ফুরণ না হয় ও হিতাহিতজ্ঞান না জন্মে, ততদিন তাহার শৈশবাবস্থা, তৎপরে বাল্যাবস্থা বা কৈশোরাবস্থা বলিতে পারা যায়। যে যত অধিক পরিমাণে সত্বগুণ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার তত অল্প বয়সেই বুদ্ধির স্ফুরণ ও হিতাহিত-জ্ঞানের উদয় হয়, সুতরাং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র ইহারা যথাক্রমে এক বর্ণ হইতে অপর বর্ণ অধিক বয়সে শৈশবাবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া কিশোরাবস্থা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্য, এবং বৈশ্য হইতে শূদ্র অধিক বয়ঃক্রমে হিতাহিত-জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া কিশোর বয়সে উপনীত হয়। শরীরের বৃদ্ধি, বা ভারত্ব, অথবা বল, যাহার যত শীঘ্র হয়, তাহার তত অল্প বয়সে যে বুদ্ধিশক্তি জন্মে তাহা নহে, বরং ইহার বিপরীতই হইয়া থাকে (১)। অত্যুৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,

(১) "Professor Rubner of Berlin, has" (says *The Hospital*) "made a special study of problems relating to development and growth, and some of his deductions and generalisations are highly interesting. The weight of the newly-born creature is doubled by the growth in very different intervals of time in different animals. The newly-born kitten doubles its weight in nine days, the calf in forty seven days, while the human infant requires 180 days. The slow growth of the human body is perhaps compensated by the greater development of brain. Man has, moreover, an exceptional position in

ও বৈশ্যের যথাক্রমে পঞ্চম, ষষ্ঠ ও অষ্টম বর্ষ বয়সে, কিন্তু সাধারণতঃ ঐ ঐ বর্ণের অষ্টম, একাদশ ও দ্বাদশ বৎসর বয়সে, বুদ্ধির স্ফুরণ ও হিতাহিতজ্ঞান হইয়া, শৈশবান্তে বাল্যাবস্থা আরম্ভ হয়, এবং ঐ সময় তাহাদিগকে শিক্ষাপ্রদান করিতে হয়। ঐ ঐ বয়সে তাহারা সংস্কৃত হইয়া নিজ নিজ বর্ণানুযায়ী উপবীত গ্রহণ করিয়া বেদাদি অধ্যয়ন এবং সৎশিক্ষা লাভ করিবার জন্য গুরুগৃহে গমন করে, এই সংস্কারকে উপনয়ন বলে, ইহাই ব্রহ্মচর্য্যের আরম্ভ (১)। ব্রাহ্মণ,

---

regard to the duration of life and its relation to the length of the period of growth. Whilst the horse lives 35 years, the cow 30 years and the dog 15 years; periods of growth are respectively five, four and two years—that is, from one-sixth to one-seventh of the total duration of life. In man a total duration of life of 70 to 80 years is associated with a period of growth of 20 to 24 years—that is, one-third or one-fourth. It has recently been suggested that under favourable conditions man's full span of life should extend to 100 years or more, and this extension would certainly appear to be justified by a comparison with the relative figures of the growth and life of the lower animals".

(১) गर्भाष्टमेऽब्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम् ।
गर्भादेकादशे राज्ञो गर्भात्तु द्वादशे विशः ॥
ब्रह्मवर्चसकामस्य कार्यं विप्रस्य पञ्चमे ।
राज्ञो बलार्थिनः षष्ठे वैश्यस्येहार्थिनोऽष्टमे ॥

मनु, २।३६, ३७ ।

गर्भाष्टमेऽष्टमे वाब्दे ब्राह्मणस्योपनायनम् ।
राज्ञामेकादशे सैके विशामेके यथाकुलम् ॥

याज्ञवल्क्यसंहिता, १।१४।

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের যথাক্রমে ষোড়শ, দ্বাবিংশ এবং চতুর্বিংশ বর্ষ পর্য্যন্ত উপনয়নের গৌণ কাল। (১)।

ঐ দ্বিজত্বমূলক উপনয়নসংস্কারের দ্বারা যেন দ্বিতীয় জন্ম লাভ করে, সুতরাং দ্বিজনামে অভিহিত হইয়া থাকে। মাতৃকুক্ষি হইতে যে জন্ম লাভ করা যায়, তাহাকে পশ্বাদি সাধারণ জন্ম বলিলেই হয়, কিন্তু বেদপারগ আচার্য্য সাবিত্রীদ্বারা যথাবিধি যে জন্মপ্রদান করেন, সেই জন্মই সত্য, সে জন্মের পর আর জরামরণ নাই (২)। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে গুরুর উচ্চ আদর্শ সর্ব্বদাই সম্মুখে থাকায়, তাঁহার নিকট সদাই সদুপদেশ পাওয়ায়, সহাধ্যায়ীগণের সহিত একত্রে বাস করায়, এবং যৎপ্রকার কঠোর সংযম আছে সেই সমস্ত পালন করায়, বালকের বিশেষরূপে সৎশিক্ষা হয় এবং তাহার কোমল হৃদয় স্ফূর্ত্তিত হইয়া সে চরিত্রবান্ হয়, সুতরাং যখন সংসারে প্রবেশ করিয়া গৃহস্থধর্ম্ম আচরণ করে, তখন তাহার পদস্খলিত হইবার সম্ভাবনা কম থাকে।

গুণের তারতম্যানুযায়ী, সুতরাং বর্ণ ও অধিকারভেদে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম অবলম্বন করিয়া কতদিন থাকিতে হয়, তাহার নিরূপিত কালের বিভিন্নতা আছে। দ্বিজমাত্র সকলেই যে একই প্রকার নিয়মে অথবা সমান পরিমিত কাল ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিতে সমর্থ হয় তাহা নহে। যাঁহারা অধিক পরিমাণে সত্বগুণাবলম্বী সুতরাং অত্যুৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ, তাঁহারা যাবজ্জীবন ঊর্দ্ধরেতা হইয়া থাকিতে সমর্থ হন, সুতরাং তাঁহারা ইচ্ছা করিলে চিরদিনই ঐ ভাবে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকেন, আর গৃহে ফিরিয়া গিয়া গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করেন না,

---

(১) যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, ১।৩৭।

(২) মনু, ২।১৪৭, ১৪৮।

তাঁহাদিগকেই নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বলে (১)। যাহারা গৃহে ফিরিয়া গিয়া গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করে তাহাদিগকে উপকুর্ব্বাণ বলে। ইহারা সকলেই যে একই প্রকার নির্দ্দিষ্ট বয়সে সমাবর্ত্তন করিয়া গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করে তাহা নহে, যাহার যে প্রকার সামর্থ্য তাহার তদনুযায়ী সমাবর্ত্তনের বয়স নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যাহাদের যত সত্ত্বগুণ অধিক, তাহারা সেই পরিমাণে অধিক কাল ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে সমর্থ হয়, সুতরাং ব্রাহ্মণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কাল এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ক্রমান্বয়ে অল্পকাল ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারে, তদনুযায়ী তাহাদের জন্য বিভিন্নরূপ সময় শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শাস্ত্রকারগণ যাহা বিধান করিয়াছেন, তাহা হইতে ইহাই অনুমিত হয় যে, যে সকল উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করেন, তাঁহারা উপনয়নের পর ছ'ত্রিশ বৎসর, নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণ ও উৎকৃষ্ট ক্ষত্রিয়গণ আঠার বৎসর, এবং নিকৃষ্ট ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ নয় বৎসর (২), অথবা তিন, দুই ও এক বেদ অধ্যয়নের কাল প্রত্যেক বর্ণের ক্রমান্বয়ে ব্রহ্মচর্য্যের কাল যদি পরিগণিত হয়, তাহা হইলে যথাক্রমে ছত্রিশ, চব্বিশ এবং বার বৎসর, কিংবা নিতান্ত অসমর্থপক্ষে ক্রমান্বয়ে অন্ততঃ পনর, দশ এবং পাঁচ বৎসর কাল ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম বিহিত ধর্ম্ম আচরণ করা কর্ত্তব্য (৩)। দ্বিজগণ সামর্থ্যানু-যায়ী যে যতদিনই ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে সমর্থ হউক না কেন, তাহাদের সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম এই যে, জীবিত কালের প্রথম চতুর্থ

(১) যদি ত্বাত্যন্তিকং বাসং রোচয়েত গুরোঃ কুলে ইত্যাদিঃ।

মনু, ২।২৪২।

(২) মনু, ৩।১।

(৩) যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, ১।৩৬।

তাদের শেষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম অবলম্বন একান্তই কর্ত্তব্য (১)। শাস্ত্রানুযায়ী কলিযুগে পরমায়ু এক শত বৎসর (২), সুতরাং পূর্ণ পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করা সকলের পক্ষেই বিধেয়। নিয়মমত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন না করায়, এবং অন্যান্য নানা কারণে মানবের পরমায়ু কম হইয়া আসিতেছে, সুতরাং যদিও এক শত বৎসর পরমায়ু অধুনা বিরল হইয়াছে, তথাপি অন্ততঃ ইহা বৃদ্ধি করিবার জন্যও পঁচিশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে দ্বিজগণের গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করা উচিত নহে। এসম্বন্ধে পরে বিশেষরূপে আরও বলা যাইবে।

ত্রিবর্ণান্তর্গত দ্বিজগণ! তোমরা পূর্ব্বপুরুষদিগের আচরিত ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমবিহিত ধর্ম্ম ভুলিয়া যাইতেছ, তাহা নিয়মিতরূপে আচরণ কর না, সেই জন্যই তেজঃক্ষয় হইয়া তোমাদের এই প্রকার দুরবস্থা ঘটিতেছে। ব্রাহ্মণগণ! তোমাদের সে ব্রহ্মতেজ কোথায়? একদা তোমাদের কটাক্ষে শত শত দর্পিত পাপাত্মার রাজমুকুট ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়া অত্যাচারীর ক্ষত্রতেজ ম্রিয়মাণ হইয়াছে এবং অধর্ম্মের পরিবর্ত্তে ধর্ম্ম সংস্থাপিত হইয়াছে; কিন্তু তোমাদের সেই তেজ যেন এক্ষণে অতীতের স্বপ্নকাহিনী হইয়াছে। ক্ষত্রিয়গণ! হায়, ইন্দ্রসদৃশ তোমাদের সেই শৌর্য্য, বীর্য্য, শক্তি, তেজ, বল, উদ্যম, উৎসাহ, ঐশ্বর্য্য কোথায় চলিয়া গিয়াছে! তোমরা যে অস্ত্রবলে বলীয়ান্ হইয়া আসুরিক বলকে পদদলিত করিয়া বীরদর্পে মেদিনী কাঁপাইতে, হায়! আজ তাহা কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে! বৈশ্যগণ! একদিন তোমরা সততা, নিঃস্বার্থতা, ধর্ম্মভীরুতা, অকাতরশ্রমশীলতা প্রভৃতি গুণে অলঙ্কৃত হইয়া প্রভূত অর্থসঞ্চয়

(১) মনু, ৪।৭।

(২) মনু, ৭।৮৩।

করিয়া কুবেরসদৃশ ছিলে, সেই তোমরা এক্ষণে উদরান্নের জন্ত হাহাকার করিতেছ! ব্রহ্মচর্য্যহীনতাই কি ঐ সমস্তের একটি প্রধান কারণ নয়? যাহা হউক তোমাদের যাহা হইবার তাহা ত হইয়াছে, তোমরা দেবতা হইয়াও আসুরিক ভাবে বিধ্বস্ত হইয়া নিস্তেজ ও ম্রিয়মাণ হইয়াছ। এক্ষণে তোমাদের পুত্রকন্যাগণকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া প্রকৃত পথে লইয়া যাও। কন্যাগণকে উমার ন্যায় তপশ্চারিণী কর, তবেইত তাহারা প্রকৃত গৌরীপূজা করিয়া গৌরী-সদৃশী হইয়া পশুপতির ন্যায় পতিলাভ করিবে। পুত্রগণকে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দিয়া যোগীশ্রেষ্ঠের ন্যায় সংযমী কর, তবেইত তাহাদের অন্তস্তেজে পুণ্যভূমি পুনরায় আলোকিত হইবে। তখন দেখিবে তোমাদের সকলের ঘরে ঘরে তারকাসুরনিহন্তা ব্রহ্মচারিশ্রেষ্ঠ কুমারের ন্যায় অসংখ্য কুমার জন্মিয়া তোমাদের কালিমাময় মলিনমুখ প্রফুল্ল করিবে, তাহারা পূর্ব্বের সুখের দিন আবার ফিরাইয়া আনিবে।

গার্হস্থ্য।

কোমল কিশোর বয়স অতিক্রম করিলে স্বভাবতঃ যখন রজোগুণের পূর্ণ বিকাশ হইতে থাকে, সেই উৎকট যৌবনে যাহাতে পদস্খলন না হয়, এবং সংসারে প্রবেশ করিলে যাহাতে সাধুভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, সেই জন্য ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের কার্য্য সমাধানন্তর গৃহস্থাশ্রমের জন্ত প্রস্তুত হইয়া দ্বিজকুমার গুরুগৃহ হইতে নিজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে এবং বিবাহ করিয়া গৃহস্থের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকে, এই প্রকারে উচ্চবর্ণীয় ব্যক্তি নিজ জীবনকে তদপেক্ষা নিকৃষ্ট বর্ণীয়গণের আদর্শস্বরূপ করিয়া, গৃহস্থধর্ম্ম সুচারুরূপে আচরণের দ্বারা

তাহাদিগকে শিক্ষাপ্রদান করিয়া থাকে। এই আশ্রমকে গার্হস্থাশ্রম বলে, ইহা চতুর্ব্বর্ণেরই অবলম্বনীয়। শূদ্রগণের তমোগুণ অধিক বলিয়া কিয়ৎকালের জন্যও তাহারা সংসার হইতে বিরত হইতে পারে না, এবং অন্যান্য আশ্রমের কঠোরতাও সহ্য করিতে সক্ষম হয় না, সুতরাং তাহাদের যাবজ্জীবন গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া সংসারধর্ম্ম করাই কর্ত্তব্য। তাহাদের ইহা ব্যতীত অন্য কোন আশ্রম নাই।

বিবাহ।

যৌনসম্বন্ধে মনুষ্যের ত্রিগুণের অত্যধিক পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। এই জন্য এই বিষয়ে নানাপ্রকার বিধি ও নিষেধ বাক্য শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল অনুযায়ী চলিতে পারিলে, মানুষ সংযমী হইয়া শারীরিক ও মানসিক শক্তিসম্পন্ন এবং দীর্ঘায়ু হইয়া থাকে, ইহাতে মানুষ প্রকৃত মানুষ হইতে পারে, নতুবা পাশবিক ভাব বৃদ্ধি হওয়ায় পশুবৎ গণ্য হইবার উপযোগী হয়। নির্ব্বিশেষ সংসর্গ ত্যাগ করিয়া সংযমী হইবার জন্য শাস্ত্রকারগণ বিশেষরূপে আদেশ করিয়া গিয়াছেন। বিশৃঙ্খল ও অসংযতরূপে যৌনসম্বন্ধ সংঘটন হইলে মনুষ্যের উৎকর্ষের ব্যাঘাত এবং সমাজেরও অনিষ্ট হইয়া থাকে, এই জন্যই মনুষ্যগণ বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হইয়া থাকে। এই বন্ধনে স্ত্রীপুরুষ পরস্পর পরস্পরকে বিশেষরূপে বহন বা সাহায্য করিয়া উর্দ্ধে উৎকর্ষের দিকে অগ্রসর হয়, এই জন্যই ইহার নাম বিবাহ বা উদ্বাহ। ইহা কামুককামুকীর কামরিপুচরিতার্থতার সহজ ও সুগম উপায় নহে, ইহা সংযমশিক্ষার বিশিষ্ট পন্থা। বিবাহদ্বারা উভয়ে মিলিয়া এক হইয়া গিয়া প্রকৃতিপুরুষসম্বলিত একটি পূর্ণ মনুষ্যে পরিণত হইবার

জন্ত জীবনপথে অগ্রসর হয়। বিবাহবন্ধন যে সমাজে যত দৃঢ়, সেই সমাজ তত উন্নত। যাহারা পশুর অবস্থা হইতে উন্নত হইয়া কেবল-মাত্র মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াছে, তাহাদের ঐ বন্ধন অতি শিথিল এমন কি কাহারও কাহারও একেবারে নাই বলিলেও চলে। তাহাদের বিবাহ স্বেচ্ছাচারীর ক্ষণিক সম্বন্ধ, ইন্দ্রিয়পরায়ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-সাধনের নামান্তরমাত্র। বিবাহবন্ধন দৃঢ় হইলে, মনুষ্যগণ সংযত হইয়া উৎকর্ষের দিকে অগ্রসর হইতে পারে এবং সমাজও শান্তিময় হয়, এই জন্যই আর্য্যগণের মধ্যে গৃহস্থাশ্রম উৎকৃষ্ট আশ্রম এবং ইহাতে বিবাহ একটী প্রধান কার্য্য বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং যাহাতে বিবাহবন্ধন শিথিল হইয়া যথেচ্ছাচার প্রবর্ত্তিত না হইতে পারে, তৎ-প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শাস্ত্রকারগণ নানাপ্রকার নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সকলের পক্ষে একই প্রকার বিধি উপযোগী হইতে পারে না, সুতরাং গুণভেদে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিধিসমূহ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই কারণবশতই বিবাহের বন্ধন নিয়ম ও প্রথাদি এবং স্ত্রীপুরুষের বিবাহের বয়স ও তাহাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের দায়িত্ব আচরণাদি এবং একের মৃত্যুর পরে অপরের কর্ত্তব্যাদি চতুর্ব্বর্ণের এক রকম নহে। যে সমাজে সকলের পক্ষেই নিয়মাদি সমান, তাহা উচ্ছৃঙ্খলতাদিপূর্ণ হইয়া থাকে।

স্বভাবতঃ পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা অধিক, এই জন্য তাহাদিগকে সর্ব্বদা যত্নপূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা করিতে আর্য্যশাস্ত্রকারগণ আদেশ করিয়া গিয়াছেন এবং তাহাদিগকে স্বাতন্ত্র্য দিতেও নিষেধ করিয়াছেন (১)। ইহার অন্যথা হইলেই সমাজ বিশৃঙ্খল হইয়া অশান্তির কারণ হয়। মরণাবধি পরস্পর অব্যভিচারাবস্থায় অবস্থান করাই স্ত্রীপুরুষের পরম ধর্ম্ম। বিবাহিত

(১) অস্বতন্ত্রাঃ স্ত্রিয়ঃ কার্য্যাঃ স্বাভাবিযঃ। মনু, ৫।২-৩।

স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পর কোনমতে বিযুক্ত না হইয়া যাহাতে কোনরূপে ব্যভিচার না করে, তদ্বিষয়ে সতত যত্নবান্ থাকা আবশ্যক (১)। পতির সহিত পত্নীর অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, ইহা কদাপি দান বিক্রয় বা ত্যাগ দ্বারা বিনষ্ট হইতে পারে না (২)।

বিবাহের বয়স।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে দ্বিজগণের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম সমাধানন্তর গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবার বয়স গুণানুযায়ী নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে, সুতরাং গৃহস্থাশ্রমের প্রধান কার্য্য যে বিবাহ, তাহা সম্পাদনের বয়স নিরূপণ করিতে গুণের উপরে নির্ভর করিতে হয়, অর্থাৎ যাহার সত্ত্বগুণ অধিক সে অধিক বয়স পর্য্যন্ত সংযত হইয়া থাকিতে পারে, সুতরাং বিবাহও অধিক বয়সে হওয়া উচিত, এবং ঐ গুণের ন্যূনতানুযায়ী ক্রমান্বয়ে বিবাহের বয়সও কম হইয়া থাকে ; অর্থাৎ ব্রাহ্মণের অধিক বয়সে, তৎপরে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের ক্রমান্বয়ে কম বয়সে বিবাহ হওয়াই কর্ত্তব্য। তমোগুণবশতঃ শূদ্রের পাশবভাব অধিক, এই জন্য তাহারা অসংযমী ও কামপরতন্ত্র হয়, সুতরাং হিতাহিতজ্ঞান-শূন্য হইয়া নানা প্রকার দুষ্কার্য্য করিয়া সমাজের কণ্টকস্বরূপ হইবার এবং স্বেচ্ছাচারিতাবশতঃ নিজ শরীরের অনিষ্ট সাধন করিবারও সম্ভাবনা, এইজন্য তাহাদের কামরিপু যে বয়সে উদ্রিক্ত হয়, সেই সময়ে বিবাহ হইলেই ঐ সমস্ত দোষ কতকটা নিবারিত হইতে পারে, এই কারণবশতঃ তাহাদের অপেক্ষাকৃত কম বয়সে বিবাহ হওয়াই বিধেয়।

পুরুষের শারীরিক বৃদ্ধি সাধারণতঃ পঁচিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত

---

(১) एष धर्म्मः समासेन इत्यादयः। मनु, ९।१०१,१०२।

(২) न निष्क्रयविसर्गाभ्यामित्यादयः। मनु, ९।४६, ४७।

হইয়া থাকে, তাহার পরে ত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত যদিও বৃদ্ধি হয়, কিন্তু তাহা অতি অল্প। উচ্চবর্ণের অধিক বয়সে এবং নীচবর্ণের কম বয়সে শরীরের বৃদ্ধি সমাধা হইয়া থাকে (১)। যদিও ষোড়শবর্ষে শুক্র উৎপন্ন হয়, তথাপি বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত ইহা তরলভাবে অপক্কাবস্থায় থাকে, সেই সময়ে ইহার ক্ষরণে নানাপ্রকার ব্যাধি জন্মিয়া থাকে, এবং তাহাতে সন্তান জন্মিলে, সে দীর্ঘজীবী হইতে পারে না। বিংশতি হইতে চত্বারিংশৎ বৎসর পর্য্যন্ত শুক্রের পূর্ণবল থাকে, সুতরাং ঐ বয়সের মধ্যে বিবাহ হওয়া কর্ত্তব্য (২)। অতএব গুণানুযায়ী

(১) "ব্রহ্মচর্য্য" অধ্যায়ে ২১৭ পৃষ্ঠার নোট।

(২) वर्षं षोड़शमारभ्य यावत्त्रिंशतिपरम् ।
तावत् शुक्रस्य बालत्वं कथ्यते मुनिपुङ्गवैः ॥
त्रिंशतिवत्सराद्‌व यावदात्रिंशदाब्दिकम् ।
शुक्रस्य तु पूर्णबलं तदूर्द्ध्वं हीनमुच्यते ॥
प्राप्ते तु षोड़शे वर्षे शुक्रं क्षिपति यो नरः ।
क्षीणत्वमवाप्नोति शुक्रस्याल्पबलादपि ॥
रत्नकोषम्, उत्तरविभागः ।

ऊनषोड़शवर्षस्तु नरो बालो निगद्यते ।
मध्यं षोड़शसप्तत्योर्मध्यमः कथितो बुधैः ।
चतुर्द्धा मध्यमं वृद्धियुवापूर्णक्षयान्वितम् ।
भवेदाविंशतेर्वृद्धिर्युवात्वात्रिंशतोमता ॥
चत्वारिंशत् समा यावत्तिष्ठेद्वीर्य्यादिपूरितः ।
ततः क्रमेण क्षीणः स्याद् यावद् भवति सप्ततिः ॥

সুতরাং বর্ণভেদে বিবাহের বয়সের তারতম্য হওয়া বিধেয়। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের তমোগুণ কম, সুতরাং তাহাদের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরে বিবাহ হওয়াই উচিত। এই জন্য শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে জীবনের দ্বিতীয় ভাগ, অর্থাৎ পূর্ণ পঞ্চবিংশতি হইতে পঞ্চাশৎ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দ্বিজগণের গৃহস্থাশ্রমধর্ম্ম আচরণ করা কর্ত্তব্য (১)। ত্রিশ বৎসর কিংবা চব্বিশ বৎসর বয়স্ক সত্ত্বগুণাবলম্বী পুরুষের যথাক্রমে দ্বাদশ কিংবা অষ্টমবর্ষ বয়স্কা স্ত্রীর সহিত বিবাহ হইলে উপযোগী হয় (২), কিন্তু ঐ ঐ বয়সে বিবাহ হইলেও স্ত্রী পঞ্চদশ বৎসর বয়স প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার সহিত সংসর্গ দারুণ অবিধেয়।

হিন্দুসংসারে স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ কিছুদিনের জন্য নহে; আজ আছে, কাল থাকিবে না, অথবা স্বামী মনোমত না হইলে এবং সুবিধা পাইলে নিজেই শিকল কাটিবে, বা রাজদ্বারের আশ্রয় লইয়া ঐ বন্ধন ছিন্ন করাইবে, হিন্দুস্ত্রীর মনে ইহা উদয় হইবার সম্ভাবনা কম।

ततस्तु सप्ततेरूर्द्ध्वं क्षीणधातुरसादिकः ।
क्षीयमाणेन्द्रियबलं क्षीणरेता दिने दिने ॥
वलीपलितखालित्ययुक्तः कर्मसु चाक्षमः ।
कासश्वासादिभिः क्लिष्टो वृद्धो भवति मानवः ॥ सुश्रुत ।

(১) चतुर्थमायुषो भागमुषित्वाद्यं गुरौ द्विजः ।
द्वितीयमायुषोभागं कृतदारो गृहे वसेत् ॥ मनु, ४।१।

(২) त्रिंशद्वर्षोद्वहेत् कन्यां हृद्यां द्वादशवार्षिकीम् ।
त्र्यष्टवर्षोऽष्टवर्षां वा धर्म्मे सीदति सत्वरः ॥ मनु, ९।९४।

অন্যদেশের শাস্ত্রে যেমন বলিতেছে, Therefore shall a man leave his father and his mother and shall cleave unto his wife (১), আর্য্যশাস্ত্রকারগণ ঐরূপ বলেন না। পুত্র পিতামাতার অনুগত থাকিবে এবং বধূও শ্বশুরশ্বশ্রূপ্রভৃতির বশীভূতা থাকিয়া সকলের সুখবিধায়িনী হইবে, এই জন্য তাঁহারা হিন্দুনববধূকে বলিতেছেন, "তুমি শ্বশুরগণের সুখবিধায়িনী হও, পতির সুখবিধায়িনী হও, পতিগৃহের সুখবিধায়িনী হও, এবং ইহাদের পোষণের জন্য তুমি সুখবিধায়িনী হও," (২)। পতিকুলে শিলার ন্যায় স্থির হইয়া, এবং দ্যুলোকপ্রভৃতির ন্যায় ধ্রুবা হইয়া থাকিতে নববধূকে বিবাহকালে প্রতিজ্ঞা করাইতেছেন (৩), এবং সেও তাহাই করিয়া বলিতেছে "আমি পতিকুলে ধ্রুবা হইয়া থাকিব" (৪)। আর্য্যশাস্ত্রের ইহাই

(১) Genesis, Ch. II, verse 24.

(২) স্যোনা ভব শ্বশুরেভ্যঃ
স্যোনা পত্যে গৃহেভ্যঃ।
স্যোনাস্যৈ সর্ব্বস্যৈ বিশে
স্যোনা পুষ্টায়ৈষাং ভব॥ অথর্ব্ববেদম্, ১৪।২।২৭।

(৩) আরোহেমমশ্মানম্
অশ্মেব ত্বং স্থিরা ভব। অথর্ব্ববেদম্, ১৪।২।২৫।

তুমি এই শিলার উপর আরোহণ কর, এবং শিলার ন্যায় স্থির হইয়া থাক।

ধ্রুবা দ্যৌর্ধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবা বিশ্বমিদং জগৎ।
ধ্রুবাসঃ পর্ব্বতা ইমে ধ্রুবা পতিকুলে ইয়ম্॥
ঋগ্বেদসংহিতা, ১০।১৭৩।৪।

দ্যুলোক ধ্রুব, পৃথিবী ধ্রুবা, এই বিশ্বজগৎ ধ্রুব, এই সকল পর্ব্বত ধ্রুব, এই কন্যাও পতিকুলে ধ্রুব।

(৪) ধ্রুবাহং পতিকুলে ভূয়াসম্।

আদেশ যে "স্ত্রী মন বাক্য ও কর্ম্মে পবিত্রা এবং পতির আজ্ঞানুবর্ত্তিনী থাকিয়া ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুগতা হইবেন, পবিত্রা থাকিবেন, তাঁহার হিতকর কর্ম্মে সখীর ন্যায় সহায় হইবেন, এবং তাঁহার আদিষ্ট কার্য্যসমূহ দাসীর ন্যায় সম্পাদন করিবেন" (২)। "যে পরিবারমধ্যে ভর্ত্তা ও ভার্য্যা পরস্পর পরস্পরদ্বারা নিত্য সন্তুষ্ট থাকেন, সেই বংশে কল্যাণ নিশ্চিত" (৩)। বিবাহের এবং পতি-পত্নীসম্বন্ধের উচ্চ আদর্শ ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে?

উপরিউক্ত শাস্ত্রবচনসমূহ হইতে ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে, আর্য্যগণের মধ্যে স্ত্রী বিবাহদ্বারা যেন পুনর্জন্ম লাভ করে, সে পিতৃকুল হইতে পতিকুলগতা হয় এবং সেই পরিবারভুক্ত ও স্বামীর সহিত অভেদাত্মা হইয়া অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া থাকে। এই প্রকার যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয় তাহাই কর্ত্তব্য। বালিকাবস্থাতেই বিবাহ হইলে স্ত্রী ঐরূপ হইতে পারে। উদ্ভিদ্ প্রথমাবস্থাতে—ফুল ফুটিবার পূর্ব্বেই—স্থানান্তরে রোপিত হইলে সুপুষ্ট ও সুফলপ্রদ হয়, নতুবা অপুষ্ট ও ক্ষীণ হইয়া থাকে, এমন কি তাহার মরিয়া যাইবারও সম্ভাবনা থাকে; লতা কোমলাবস্থাতেই বৃক্ষাদি আশ্রয়ে সংবদ্ধ হইলে সতেজ হইয়া উঠে; পশুপক্ষী শৈশবাবস্থাতেই পোষ মানিতে পারে

---

(১) मनोवाक् कर्मभिः शुद्धा पतिदेशानुवर्त्तिनी ॥
छायेवानुगता स्वच्छा सखीव हितकर्मसु ।
दासीवदादिष्टकार्य्येषु भार्य्या भर्त्तुः सदा भवेत् ॥
व्याससंहिता, २।२६, २७

(२) सन्तुष्टो भार्य्यया भर्त्ता भर्त्रा भार्य्या तथैव च ।
यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम् ॥ मनु, ३।६०।

এবং সেই সময়ে গৃহে পালিত হইলে পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইবার সম্ভাবনা ; ঐরূপ বাল্যাবস্থাতেই বিবাহিতা হইলে স্ত্রী পতির পরিবারভুক্ত হইয়া স্বামীর সহিত এক আত্মা হইতে পারে, তাহা হইলেই ভবিষ্যতে সে স্বচ্ছন্দ বোধ করে এবং তাহাতেই তাহার শারীরিক ও মানসিক পুষ্টি সাধিত হইয়া থাকে। গাছের কলম করিতে হইলে, কলমটি বেশী বয়সের গাছের ডাল হওয়া প্রয়োজন, কিন্তু যাহাতে কলম সংযোজিত হয়, সেটি চারাগাছই হইয়া থাকে, তাহা হইলেই ভাল রকম যোড়া লাগিয়া সতেজ হইয়া বর্দ্ধিত হয়। তখন সেই চারা গাছটির অস্তিত্ব কলমে মিশাইয়া গিয়া তাহারই সহিত এক হইয়া যায়। মানুষের পক্ষেও সেইরূপ ; বালিকা পুরুষের সহিত সংবদ্ধ হইলে ক্রমে ক্রমে নিজ অস্তিত্ব পুরুষে মিশাইয়া দিয়া এক হইয়া যাইতে পারে, তাহা হইলেই তাহারা প্রকৃতিপুরুষসম্বলিত সম্পূর্ণ মনুষ্য হইয়া ক্রমে প্রকৃতিমুক্ত শুদ্ধপুরুষে পরিণত হইতে পারে।

ঐ সকল কারণবশতঃ হিন্দুদিগের মধ্যে প্রথম রজস্বলা হইবার পূর্ব্বেই বালিকার বিবাহ দেওয়ার প্রথা আছে। ঋতুমতী হইলে কুমারী তিন বৎসর কাল অপেক্ষা করিয়া তদনন্তর আপন উপযুক্ত পতি নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারে ; পিত্রাদিকর্তৃক অদীয়মানা ঐ কন্যা যদি যথাকালে স্বয়ং কোন পুরুষকে ঐ প্রকারে পতিরূপে বরণ করে, তবে তাহাতে তাহার কিছুমাত্র দোষ হয় না (১)।

---

(১) त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमार्यृतुमती सती।
ऊर्द्धन्तु कालादेतस्माद्विन्देत सदृशं पतिम्॥
अदीयमाना भर्त्तारमधिगच्छेद् यदि स्वयम्।
नैनः किञ्चिदवाप्नोति न च यत् साधिगच्छति॥

मनु, ९।९०,९१।

স্থানভেদে এবং স্ত্রীগণের শারীরিক অবস্থানুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন বয়সে তাহারা রজস্বলা হইয়া থাকে। গ্রীষ্মপ্রধান স্থানের অধিবাসীগণ সাধারণতঃ দ্বাদশ হইতে পঞ্চদশ বৎসর বয়সের মধ্যে প্রথম ঋতুমতী হইয়া থাকে ; রোগবশতঃ অথবা শীতপ্রধান স্থানে জড়তাবশতঃ ইহা অপেক্ষা বিলম্বে হইয়া থাকে (১)।

যদিও প্রথম রজস্বলা হইবার পূর্ব্বেই বালিকার বিবাহ দেওয়ার বিধি, কিন্তু যতদিন সে গর্ভধারণের উপযোগিনী না হয়, ততদিন স্বামী-সহবাস নিষিদ্ধ। কোন বৃক্ষ বা লতা অল্পকালে মুকুলিত হইলে তাহার পুষ্প হইবার পূর্ব্বেই প্রথম প্রথম কয়েকবার সেই মুকুলগুলি ভাঙ্গিয়া দিতে হয়, তাহা হইলে তাহাতে তখন ফল ফলিতে পারে না বলিয়া, সেই গাছ বেশ সতেজ, সুপুষ্ট ও সুফলপ্রদ হইয়া অপেক্ষাকৃত দীর্ঘজীবী হয়। ঐরূপ মানুষেরও হইয়া থাকে। স্ত্রীগণের যাহারা অল্পবয়সে গর্ভধারণ না করে, তাহারা সুপুষ্ট ও নীরোগী হইয়া দীর্ঘজীবী হইতে এবং সুসন্তান প্রসব করিতে পারে।

(১) द्वादशाद्वत्सरादूर्द्ध्वमापञ्चाशत् समाः स्त्रियः इत्यादि ।

भावप्रकाशम् । पूर्व्वखण्डम् ।

Age of commencement of menstruation varies greatly with the individual and climate. Among natives of Europe the general age at which it first appears is fourteen to fifteen................. ..Among natives of warm climates menstruation so early as ten is uncommon, but its appearance is seldom delayed beyond the fifteenth year.

Lyon's Medical Jurispudence, 236.

The average age at which the menstrual period begins varies with the coldness of the climate in Europe. In France it begins at 13, North Germany and sweden 15 to 16, in Norway 17½. In Lapland 18 and amongst the Esquimaux not till 19 to 20.

Lyon's Medical Jurispudence, 237 (note).

স্ত্রীর গর্ভধারণের জন্য এবং পুরুষের গর্ভোৎপাদনের জন্যই কেবল পরস্পর সংসর্গের প্রয়োজন (১)। স্ত্রীগণ প্রথম রজস্বলা হইলেই যে গর্ভধারণযোগ্যা হয় তাহা নহে। তাহারা পঞ্চদশ বৎসর পর্য্যন্ত বালিকা থাকে (২), তৎপরে গর্ভধারণযোগ্যা হয়, তাহার পূর্ব্বে অপক্কাবস্থায় কাহারও সন্তান জন্মিলে ঐ সন্তান ও প্রসূতি উভয়েরই নানাপ্রকার বিঘ্নের আশঙ্কা থাকে এবং বাঁচিয়া থাকিলেও উভয়ে বহুবিধ ব্যাধিগ্রস্ত ও অল্পায়ু হইবার সম্ভাবনা থাকে। এই সকল কারণবশতঃ পুরুষ গর্ভোৎপাদনের এবং স্ত্রী গর্ভধারণের যোগ্য যতদিন না হয়, ততদিন তাহাদের পরস্পর সহবাস অকর্ত্তব্য। পুরুষের পঁচিশ বৎসরের এবং স্ত্রীর ষোড়শবর্ষের পূর্ব্বে বিবাহ হইলেও ঐ ঐ বয়স প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত পরস্পর সঙ্গত হওয়া নিতান্ত অনুচিত (৩)। পূর্ব্বে হিন্দুদিগের মধ্যে ইহার প্রতিবিধানের জন্য

(১) মনু, ৯।৯৬।

(২) बालेति गीयते नारी यावद् वर्षाणि षोड़श।
ततस्तु तरुणी ज्ञेया द्वात्रिंशद्वत्सरावधि ॥
तदूर्द्ध्वमधिरूढ़ा स्यात् पञ्चाशद् वत्सरावधि ॥
वृद्धा तत्परतो ज्ञेया सुरतोत्सववर्ज्जिता ॥
भावप्रकाशम्, पूर्ब्बखण्डम्।

(৩) पञ्चविंशे ततो वर्षे पुमान् नारी तु षोड़शे।
समत्वागतवीर्य्यौ तौ जानीयात् कुशलो भिषक्॥
ऊनषोड़शवर्षायामप्राप्तः पञ्चविंशतिम्।
यद्याधत्ते पुमान् गर्भं कुक्षिस्थः स विपद्यते॥
यतो वा न चिरं जीवेत् जीवेद्वा दुर्ब्बलेन्द्रियः।
तस्मादत्यन्तबालायां गर्भाधानं नाकारयेत्॥ सुश्रुतः।
पूर्णषोड़शवर्षा स्त्री पूर्णं त्रिंशेन सङ्गता। अष्टाङ्गहृदयम्।

নানা প্রকার পারিবারিক নিয়ম ছিল, অধুনা সে সমস্ত শিথিল হইয়াছে বলিয়া, অল্পবয়সে পুরুষগণ গর্ভোৎপাদন এবং স্ত্রীগণ গর্ভধারণ করিয়া থাকে, এই জন্য ঐ জাতি ক্রমশঃ শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে।

কেবলমাত্র সন্তানোৎপাদনার্থই স্ত্রীসংসর্গের প্রয়োজন, ইহা ব্যতীত অন্য কোন কারণে শুক্রক্ষয় অপব্যয়মাত্র, সুতরাং পত্নী যখন গর্ভ-ধারণোপযোগিনী থাকে, সেই সময় ব্যতীত তাহার সংসর্গ অকর্ত্তব্য। গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে পুরুষগণ সাধারণতঃ একবিংশতি হইতে পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত প্রথম গর্ভোৎপাদন এবং স্ত্রীগণ সাধারণতঃ পঞ্চদশ হইতে একবিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত প্রথম গর্ভধারণ করিয়া থাকে; ইহা অপেক্ষা অল্প বয়সে অতি বিরল (১)। শীতপ্রধান স্থানে জড়তাবশতঃ অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে পুরুষ ও স্ত্রীগণের সন্তান হইয়া থাকে। গ্রীষ্ম ও শীতপ্রধান স্থানভেদে উদ্ভিজ্জগণেরও এই প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। যদি গ্রীষ্মপ্রধান স্থানের একটি বৃক্ষের বীজ সেই দেশেই, এবং অপর একটি বীজ শীতপ্রধান স্থানে রোপিত হয়, তাহা হইলে প্রথমোক্ত স্থানে জাত বৃক্ষের, শেষোক্ত স্থানে উৎপন্ন বৃক্ষ অপেক্ষা, অল্পকালে ফুল ও ফল হইয়া থাকে। পশুপক্ষীগণেরও এইরূপ হইয়া থাকে।

ঋতুকালের প্রথম চারি অহোরাত্রের পরে সত্ত্বগুণাবলম্বিনীর দ্বাদশ রাত্রি, যাহার রজঃসত্ত্বগুণ অধিক তাহার দশ রাত্রি, যাহার তমোরজো-

(১) Taylor gives fourteen as the earliest age at which the procreative power has been recorded to appear in the male.

Lyon's Medical Jurisprudence, 232.

গুণ অধিক তাহার অষ্ট রাত্রি এবং তমোগুণাবলম্বিনীর ষট্‌রাত্রি পর্য্যন্ত গর্ভধারণে শক্তি থাকে (১)। যাহাতে সুস্থ ও সবল সন্তান জন্মে এবং যাহাতে স্ত্রী ও পুরুষের শরীর ও মন সুস্থ থাকে, তাহাই বাঞ্ছনীয়, সুতরাং ঋতুর পরে প্রথম চারি এবং একাদশ ও ত্রয়োদশ রাত্রি, এবং অমাবস্যাদি পঞ্চ পর্ব্বরাত্রি, এবং স্ত্রী বা পুরুষের শারীরিক বা মানসিক ক্লান্তির অথবা রুগ্নাবস্থার সময় সংসর্গ একবারে বর্জ্জনীয় (২)। এইরূপ নানা প্রকার বিধি ও নিষেধ শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, তদনুযায়ী চলিতে পারিলে মানুষ সংযমী, নীরোগী এবং দীর্ঘায়ু হইতে পারে।

উদ্ভিদ্‌গণের মধ্যে সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে যাহারা যত শীঘ্র ফলবতী হয়, এবং পশুপক্ষীগণের মধ্যে যে জাতির স্ত্রী যত অল্প বয়সে গর্ভধারণযোগ্যা এবং পুরুষ গর্ভোৎপাদনক্ষম হয়, সেই সকল উদ্ভিদ্ এবং পশুপক্ষী তত অল্পায়ু হইয়া থাকে। একই প্রকার জলবায়ু-

(১) मनु, २।४६

आर्त्तवस्रावदिवसादृतुः षोड़शरात्रयः।
गर्भग्रहणयोग्यस्तु स एव समयः स्मृतः॥
भावप्रकाशम्। पूर्व्वखण्डम्। १, २।

अस्य टीकायां यथा,

स्नानदिवसादूर्द्ध्वं द्वादशरात्रावधि ब्राह्मण्याः, दशरात्रावधि क्षत्रियायाः, अष्टमरात्रावधि वैश्यायाः, षड्रात्रावधि शूद्रायाः गर्भधारणे शक्तिः।

(২) मनु ३।४५—४७।

বিশিষ্ট দেশে মনুষ্যগণের মধ্যে যে শ্রেণীর স্ত্রীগণ অল্প বয়সে গর্ভধারণ এবং পুরুষগণ অপরিণত বয়সে গর্ভোৎপাদন করিয়া থাকে, সেই শ্রেণীর ব্যক্তিগণ অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল ও অল্পায়ু হয়; কিন্তু যে শ্রেণীর ব্যক্তিগণের বিলম্বে সন্তান হয় এবং যাহারা যৌবনের শেষ হইতেই সংযমী হইয়া থাকিতে পারে, তাহারা মানসিক ও শারীরিক শক্তিসম্পন্ন হইয়া দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে।

বরকন্যানির্ব্বাচন।

হিন্দুশাস্ত্রকারগণ কোন বিষয়েই বাহির দেখিয়া ক্ষান্ত হন নাই, অন্তস্তল পর্য্যন্ত সমস্তই সূক্ষ্মভাবে দর্শন করিয়াছেন, এবং তদনুযায়ীই সকল বিষয়েই নানা প্রকার বিধান করিয়া গিয়াছেন। অনেক সময়ে শরীরের অস্থিমাংসরক্তের অতিরিক্ত অন্যান্য সমাজের শাস্ত্রকারগণ যাইতে পারেন নাই, সেই জন্যই কোন একটি সমাজের শাস্ত্রকার বিবাহের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, "ইহা এক্ষণে আমার অস্থির অস্থি এবং মাংসের মাংস, সে স্ত্রীলোক নামে অভিহিত হইবে" (১)। ঐ শাস্ত্র কেবল অস্থিমাংস বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছে, ইহার অতিরিক্ত যাইতে পারে নাই; কিন্তু আর্য্যশাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন যে, শরীর ত কোন্ তুচ্ছ, বিবাহে হৃদয় পর্য্যন্তও এক হইয়া যায়, এবং এই জন্যই বিবাহকালে স্বামীকর্তৃক স্ত্রীর প্রতি কেবলমাত্র "অস্থিভিরস্থীনি মাংসৈর্মাংসানি ত্বচা ত্বচং" ইহাই বলাইয়া ক্ষান্ত হন নাই, কিন্তু আরও বলাইতেছেন যে, "সত্যরূপ গ্রন্থি দ্বারা তোমার হৃদয় ও মনকে বন্ধন করিতেছি। তোমার এই যে হৃদয়, তাহা আমার হৃদয় হউক,

(১) This is now bone of my bones and flesh of my flesh, she shall be called woman.

Genesis, Ch. II, Verse 23.

এবং এই যে আমার হৃদয়, তাহা তোমার হৃদয় হউক" (১)। ববাহের প্রকৃত উদ্দেশ্য, যুগল মিলিয়া এক হইয়া যাইবে, পুরুষ ও প্রকৃতি একীভূত হইবে। যাহাতে স্ত্রীপুরুষ উভয়ে সংযমী হইয়া স্বার্থত্যাগকরতঃ পরস্পর পরস্পরে আত্মোৎসর্গ করিতে পারে, যাহাতে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লোপ করিয়া এক হইয়া গিয়া পরমপুরুষের সহিত মিলিত হইবার জন্য জীবনপথে অগ্রসর হইয়া মোক্ষের দিকে ধাবমান হইতে পারে, তাহাই হিন্দুবিবাহের একমাত্র লক্ষ্য, তাহাই চরম উদ্দেশ্য। ইহা কামুকের কামতৃপ্তি নহে, সন্তানোৎপাদনই ইহার কেবলমাত্র উদ্দেশ্য নহে।

যৌনসম্বন্ধে নানাকারণবশতঃ স্ত্রীপুরুষের মধ্যে একের গুণ ও দোষ অপরে পাইয়া থাকে, সুতরাং ত্রিগুণের মধ্যে যে গুণ উহাদের একজনের প্রবল, অপরেতে সেই গুণ অধিক পরিমাণে সঞ্চারিত হয় (২); এই জন্যই নির্বিশেষ সংমিশ্রণে যত অনিষ্ট হইতে পারে, অন্য কিছুতেই তত হয় না। এই কারণবশতই আর্য্যশাস্ত্রকারগণ বিবাহবন্ধন অতি দৃঢ়তার সহিত রক্ষা করিতে এবং বর ও কন্যাকে অতি সতর্কতার সহিত নির্ব্বাচন করিতে আদেশ করিয়া গিয়াছেন এবং কি প্রণালীতে নির্ব্বাচন করিলে উভয়েরই উৎকর্ষ সাধিত হয় তাহাও বলিয়া গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে একজন যে গুণাবলম্বী অপরটিও যদি প্রায় তদ্রূপ হয়, তাহা হইলেই উৎকৃষ্ট হয়; এই

(১) বধ্নামি সত্যগ্রন্থিনা মনশ্চ হৃদয়ঞ্চ তে।
যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব॥

সাম, ব্রাহ্মণ, ৭।৯।৮—৯।

(২) মনু, ৯।২২

সংযোগই শ্রেষ্ঠযোটক, ইহাতে উভয়েই ক্রমে ক্রমে উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে এবং ইহাই প্রকৃত সবর্ণ বিবাহ। অসবর্ণ বিবাহে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে যে উৎকৃষ্ট গুণাবলম্বী নিকৃষ্টের দিকে তাহার অবনতি হয় এবং ইহাদের যে সন্তান জন্মে সে ইহাদের মধ্যে যে উৎকৃষ্টতর তাহা হইতে নিকৃষ্ট গুণাবলম্বী সঙ্করবর্ণ হইয়া জন্মগ্রহণ করে, সুতরাং তাহার বংশপরম্পরা অধম হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত পরস্পরের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি পৃথক্ বলিয়া ঐ স্ত্রীপুরুষের একজন যাহা চাহে, অপর তাহা চাহে না, একজনের যাহাতে তৃপ্তিবোধ হয়, অপরের তাহাতে হয় না, এইজন্য উভয়ের জীবনই বিষময় হইয়া থাকে।

এক্ষণে হিন্দুসমাজে কন্যানির্ব্বাচনে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, অর্থপ্রাপ্তি ও কন্যার বাহ্য রূপই অগ্রগণ্য, কাহার কে সমগুণাবলম্বী ও উপযোগী অনেকে তাহা দেখে না, গুণজ প্রকৃত সৌন্দর্য্যের দিকে সকলে লক্ষ করে না, যে মানসিক সৌন্দর্য্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের হাবভাবে ও কান্তিপ্রভৃতিতে ফুটিয়া প্রকাশ পায় তাহাও দেখে না এবং বাল্যকালের আচরণ দেখিয়া ভবিষ্যতে তাহার স্বভাব কি প্রকারে পরিণত হইবে তাহাও পরীক্ষা করে না, এই জন্যই ঐ পরিণয়ের পরিণাম প্রায়ই শোচনীয় হইয়া থাকে। বরনির্ব্বাচনেও অধুনা অভিভাবকগণ প্রায়ই কেবলমাত্র দেখিয়া থাকেন যে, পাত্র ধনশালী অথবা ভবিষ্যতে ধনবান্ হইতে পারিবে কি না; উভয়ে সমগুণাবলম্বী কিনা তাহা পরীক্ষা করে না এবং বরের কার্য্য আচরণ ও চরিত্র প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রাখে না, সেই জন্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, অসংখ্য সত্ত্বগুণাবলম্বিনী দেবীস্বরূপা রমণী ধনবান্ তামসিক অসুরের হস্তে পড়িয়া চিরজীবন নয়নজলে ভাসিয়াছে ও ভাসিতেছে। শাস্ত্র বলিতেছে যে কুলে শীলে উৎকৃষ্ট এবং রূপবান্ ও গুণবান্ সবর্ণ বর পাইলে কন্যা বিবাহযোগ্যা না হইলেও তাহাকে যথাবিধানে সম্প্রদান করিবে।

ঋতুমতী হইয়াও কন্যা বরং যাবজ্জীবন গৃহে থাকিবে ইহাও শ্রেয়ঃ, তথাপি সদ্‌গুণহীন পাত্রে সমর্পণ করিবে না (১)।

স্ত্রীনির্ব্বাচনে পুরুষের বা পতিনির্ব্বাচনে পত্নীর সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারিতা থাকিলে ঐ পরিণয়বন্ধন অনেক স্থলেই বিষময় হইয়া থাকে। যে সমাজে ঐ প্রকার প্রথা প্রচলিত আছে, তথায় কৈশোরের সরলতা ও অনভিজ্ঞতায় অথবা অদমিত যৌবনের মোহে পড়িয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজ্ঞানবিরহিত হইয়া প্রায়ই একজন অপরকে নির্ব্বাচন করে, সুতরাং ভবিষ্যতে হয়ত সে মনোমত না হওয়ায় কণ্টকস্বরূপ হয় এবং তাহার চিরজীবন দুঃখময় হইয়া থাকে (২)। ঐ নির্ব্বাচনের পরিবর্ত্তে জ্ঞানবৃদ্ধ পিতামাতা বা অন্যান্য স্বার্থশূন্য অভিভাবকগণদ্বারা হিতাকাঙ্ক্ষী এবং তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর সত্বগুণাবলম্বী ব্যক্তির পরামর্শানুযায়ী পাত্র বা কন্যা নির্ব্বাচিত হইলে, উপরিউক্তরূপ কোন প্রকার অনিষ্টের সম্ভাবনা কম বলিয়া আর্য্য শাস্ত্রকারগণ ঐ মঙ্গলময় বিধান করিয়া গিয়াছেন।

---

(১) उत्कृष्टायाभिरूपाय वराय सदृशाय च।
अप्राप्तामपि तां तस्मै कन्यां दद्याद् यथाविधि॥
काममामरणात् तिष्ठेद् गृहे कन्यर्त्तुमत्यपि।
न चैवैनां प्रयच्छेत् तु गुणहीनाय कर्हिचित्॥

মনু, ৯।৮৮,৮৯।

(২) "What," says Dr. Johnson, "can be expected but disappointment and repentance from a choice made in the immaturity of youth in the ardour of desire, without judgment, without foresight, without enquiry after conformity of opinions, similarity of manners, rectitude of judgment."........................ ....
They marry, and discover what nothing but voluntary blindness before had concealed, they wear out life in altercations, and charge nature with cruelty.

Combe's 'Constitution of Man' 135.

পুরাকালে আর্য্যগণ বর্ণবিভাগ অতি সতর্কতার সহিত রক্ষা করিতেন, সুতরাং প্রত্যেক বর্ণের বংশসমূহ বিশুদ্ধভাবে ও ধারাবাহিকরূপে চলিয়া আসিয়াছিল, সেই জন্য তখন বর ও কন্যা উভয়ে সমগুণাবলম্বী কি না তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইতে হইত না; কারণ সবর্ণ বিবাহ হইলেই প্রায় সমগুণাবলম্বীর সহিত পরস্পর বিবাহ হইত। আর্য্যগণের আধুনিক সমাজে সেই বর্ণবিভাগের ছায়ামাত্র যেন অবশিষ্ট আছে, বন্ধন ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে, গ্রন্থিসমূহ শিথিল হইয়া পড়িয়াছে; সেই জন্যই আজ দেখিতে পাইবে, উৎকৃষ্ট বর্ণের উচ্চকুলে জন্মিয়াও অনেকে আসুরিক ভাবে পূর্ণ, তাহারা কামরিপুকর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া নিকৃষ্ট গুণাবলম্বীর ন্যায় অতি জঘন্য আচরণ করিয়াও উৎকৃষ্ট বর্ণরূপে পরিগণিত হইতেছে। এখন যাহাতে বন্ধন দৃঢ় করিয়া সমাজকে পুনর্জ্জীবিত ও পুষ্ট করিতে পারা যায় তাহাই করা উচিত।

সবর্ণ ও অসবর্ণ বিবাহ।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, উচ্চ ও নীচ বর্ণে যদি পরস্পর অবিশেষে বিবাহ হয়, তাহা হইলে নিকৃষ্ট বর্ণ উৎকৃষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে সমাজের উন্নতি হইতে পারে, এবং তাঁহারা আরও বলেন যে, আর্য্যশাস্ত্রেও অসবর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধ হয় নাই, সুতরাং তাঁহাদের মতে ঐ প্রকার বিবাহ কর্ত্তব্য। ইহাতে সমাজ উন্নত হইতে পারে কি না, তাহাই প্রথমতঃ দেখা যাক। উৎকৃষ্ট বর্ণের সহিত নিকৃষ্ট বর্ণের নিয়ম ও বিধিরহিত নির্ব্বিশেষ বিবাহ হইলে, তাহাদের প্রায়ই বংশলোপ হয় এবং সন্তান জন্মিলেও, যদিও সে নীচবর্ণ পিতা বা মাতা হইতে উৎকৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু ক্রমাগত ঐরূপ সংমিশ্রণ হইলে ক্রমে ক্রমে সেই সমাজের ঐ উচ্চ ও নীচ উভয় বর্ণ ই একবারে লোপ-

প্রাপ্ত হইয়া, তাহাদের পরিবর্ত্তে তাহাদের মধ্যবর্ত্তী একটি সঙ্করবর্ণের সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে উচ্চবর্ণে যে সমস্ত উৎকর্ষ এবং নীচবর্ণে যে সমস্ত গুণ থাকায় সমাজের উপকার হয়, সেই সকলের অভাব হয়, অতএব ইহাতে সমাজের উন্নতি হইতে পারে না। যেমন, অশ্বজাতি ও গর্দ্দভজাতির কোন দেশে যদি নির্ব্বিশেষে সংমিশ্রণ হয়, তাহা হইলে তথায় স্বাভাবিক নিয়মে সাধারণতঃ তাহাদের বংশ একবারে লোপ হয়, যদিই তাহাদের বংশ থাকে, তাহা হইলেও ঐ উভয় জাতির স্বতন্ত্রতা ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া সেই স্থানে সমস্তই অশ্বতর হইয়া থাকে, ইহারা গর্দ্দভজাতি হইতে উৎকৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু ঘোটকজাতি হইতে নিকৃষ্ট হয়। এই প্রকার সংমিশ্রণে উৎকৃষ্ট জাতিটি বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং গর্দ্দভজাতি নিকৃষ্ট হইলেও, তাহারা নিরীহ কষ্টসহিষ্ণু প্রভৃতি হওয়ায় যে কার্য্যের উপযোগী, তাহা অশ্বতর দ্বারা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না, সুতরাং নীচ হইলেও একটি উপকারী জাতিও নষ্ট হইয়া যায়। অশ্ব ও গর্দ্দভ এই দুইটি পৃথক্ জাতির কথা ছাড়িয়া দিয়া এক জাতির মধ্যেই দুইটি পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর সংমিশ্রণসম্বন্ধে যদি বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলে তাহাদের বংশ একবারে লুপ্ত না হইলেও দুইটি বিশুদ্ধ শ্রেণীর লোপ হইয়া একটি সঙ্কর শ্রেণী উৎপন্ন হয়। যেমন, ঘোড়দৌড়ের অশ্বশ্রেণীর সহিত যদি কোথাও টাট্টু শ্রেণীর পরস্পর অবাধ সংমিশ্রণ ঘটে, তাহা হইলে তথায় উভয় শ্রেণী লোপপ্রাপ্ত হইয়া একটি স্বতন্ত্র সঙ্কর শ্রেণী উৎপন্ন হয়। সেই দেশে ঐ বিভিন্ন শ্রেণীর ঘোটকের দ্বারা যে সকল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রকারের কার্য্য সাধিত হইত ঐ সঙ্কর শ্রেণীর দ্বারা সেই সমস্ত হইতে না পারায় অসুবিধা হইয়া থাকে। দুইটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জাতি বা তদন্তর্গত দুইটি পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণী যাহাতে একবারে বিলুপ্ত না হইয়া যায়, অথচ তদ্ব্যতিরিক্ত যদি নীচশ্রেণী অপেক্ষা একটি উৎকৃষ্ট

শ্রেণী উৎপন্ন হয়, তাহা হইলেও কতকটা উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে।

যেরূপ পশুসম্বন্ধে বলা হইল, তদ্রূপ মনুষ্যসমাজেও হইতে পারে, সেই জন্য ঐ প্রকারে নিকৃষ্ট হইতে যাহাতে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট বংশ হইতে পারে, অথচ উৎকৃষ্টতর বংশও বিশুদ্ধ থাকে, সেই উদ্দেশ্যে এবং ক্রমোন্নতিদ্বারা উৎকৃষ্ট বর্ণ হওয়ার জন্য আর্য্যশাস্ত্রকারগণ কোন কোন স্থলে অসবর্ণ বিবাহ বিধেয় বলিয়া যদিও নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু যাহাতে মানবগণ অসংযত না হয়, তজ্জন্য সতর্কতার সহিত নিয়মসকল বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সবর্ণ বিবাহ হইয়া প্রত্যেক বর্ণ বিশুদ্ধ থাকাই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু সকল মনুষ্যই সংযত হইতে পারে না, সেই জন্য কামকিঙ্কর ব্যক্তিদিগের পক্ষে অসবর্ণ বিবাহও কতিপয় অবস্থায় সিদ্ধ হইতে পারে, কেবলমাত্র ইহাই তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন। সমাজের শৃঙ্খলা ও উন্নতি এবং বিবাহোৎপন্ন সন্তানের উৎকর্ষের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহারা বিধান করিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের প্রথমতঃ সবর্ণা স্ত্রী বিবাহ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু তাহাতে তৃপ্তি না হইলে কামপরবশ হইয়া যদি সে তদপেক্ষা নীচবর্ণে পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হয়, তাহা হইলে পর পর নিম্ন-বর্ণা স্ত্রীর সহিত বিবাহ ক্রমান্বয়ে নিকৃষ্ট হইয়া থাকে; অর্থাৎ শূদ্র কেবল শূদ্রাই বিবাহ করিবে এবং বৈশ্য কেবল বৈশ্যা ও শূদ্রাকে, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা ও শূদ্রাকে এবং ব্রাহ্মণ চারিবর্ণের স্ত্রীকেই বিবাহ করিতে পারে, এবং ভিন্ন বর্ণের মধ্যে দূরতর অপেক্ষা নিকট নিকৃষ্ট বর্ণের স্ত্রীই শ্রেষ্ঠ; সুতরাং ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণীর সহিত সংযোগই শ্রেষ্ঠতম, এতদ্ব্যতীত ভিন্নবর্ণীয়া স্ত্রী হইলে, ক্ষত্রিয়ার সহিত উহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট, তৎপরে ক্রমান্বয়ে বৈশ্যা ও শূদ্রার সহিত নিকৃষ্টতর ও নিকৃষ্টতম; ক্ষত্রিয়েরও ঐ প্রকার (১)। ইহার একটী কারণ এই যে, এক বর্ণ হইতে

(১) মনু, ৩।১২, ১৩।

অপর বর্ণটি যত অধিক দূর হইবে, সেই সংসর্গে সন্তান জন্মিবার সম্ভাবনা তত কম হইবে। এই প্রকার পশুপক্ষী ও উদ্ভিদ্গণের মধ্যেও ঘটিয়া থাকে, তাহা অনেকেই পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন (১)। মনুষ্যগণের উত্তমবর্ণের ঔরসে অধমবর্ণার গর্ভজাত সন্তানকে অনুলোমজ কহে।

অপর তিন বর্ণের পুরুষের পক্ষে শূদ্রাকে বিবাহ করা অতীব দোষ-জনক, ইহাই শাস্ত্রের বিধান (২)। বংশলোপ হওয়া ব্যতীত ইহার অপর একটি কারণ এই যে, সংসর্গদোষে ঐ পুরুষের উৎকৃষ্ট গুণ নষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং সে অধঃপতিত হয়। তমোগুণ সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট এবং ইহা শীঘ্র ও সহজে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অপর দুই গুণকে ক্ষীণ করিতে পারে, সুতরাং শূদ্রার সহিত বিবাহ হইলে, তমোগুণাবলম্বিনীর

---

(১) In treating this subject, two classes of facts, to a large extent fundamentally different have generally been confounded, namely the sterility of species when first crossed, and the sterility of the hybrids produced from them.

Pure species have of course their organs of reproduction in a perfect condition, yet when intercrossed they produce either few or no offspring. Hybrids, on the other hand, have their reproductive organs functionally impotent, as may be clearly seen in the state of male element in both plants and animals ; though the formative organs themselves are perfect in structure as far as the microscope reveals. In the first case the two sexual elements which go to form the embryo are perfect ; in the second case they are either not at all developed or are imperfectly developed. This distinction is important, when the cause of the sterility which is common to the two cases has to be considered.

Darwin's Origin of Species, Ch. IX, 285.

সকৃদুক্তস্ত মিত্রঞ্চ যঃ পুনঃ কন্যামুমিচ্ছতি।
স মৃত্যুমুপগৃহ্লাতি গর্ভমশ্বতরী যথা ॥ যাজ্ঞবল্ক্য।

(২) মনু, ৩।১৪—১৫।

সংসর্গে উচ্চবর্ণ ব্যক্তি সহজে নিকৃষ্ট তমোগুণাধিক হইবার ও উৎকৃষ্ট গুণ হারাইবার সম্ভাবনা, এই আশঙ্কাতেও শাস্ত্রকারগণ ঐরূপ বিবাহ হইতে বিরত করিবার অভিপ্রায়ে নানারূপ নিষেধবাক্য বলিয়া গিয়াছেন।

কেহ কামপরবশ হইয়া অসবর্ণ বিবাহ করিলে যদিও তাহা সিদ্ধ হইত, কিন্তু প্রথমতঃ সবর্ণা স্ত্রীর পাণিগ্রহণ না করিয়া ঐ প্রকার বিবাহ করা নিষিদ্ধ ছিল। এইরূপে প্রত্যেক বর্ণের বিশুদ্ধতা রক্ষিত হইত, এবং তাহাই শাস্ত্রকারগণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। যদি কেহ অসবর্ণ বিবাহ করিত তাহার সবর্ণা পত্নীই জ্যেষ্ঠা ও শ্রেষ্ঠারূপে পরিগণিত ও ধর্ম্মকার্য্যে প্রধান সহায় হইত (১), এবং তাহার সন্তানগণও উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য ও দায়াধিকারে অধিকতর অংশে সত্ত্ববান্ হইত (২)।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যেমন তির্য্যগ্‌জাতিতে বা উদ্ভিজ্জাদিতে দুইটি অসমান শ্রেণীর স্ত্রীপুরুষের পরস্পর সংমিশ্রণ হইলে, তাহাদের সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা কম হয়, তদ্রূপ মনুষ্যজাতির মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ অধিকতম পার্থক্যবিশিষ্ট দুইটি বর্ণের হইলে এবং তাহাদের যৌনসম্বন্ধ ঘটিলে, বংশলোপের আশঙ্কা থাকে, শাস্ত্রকারগণকর্তৃক ঐ প্রকার অসবর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ার ইহাও একটী কারণ। অনেকে বলিতে পারেন যে, ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসী, অথবা উন্নত ও প্রশস্ত নাসিকা, দীর্ঘ ও খর্ব্ব কায়, শ্বেত কৃষ্ণ পীত তাম্র বর্ণ ইত্যাদিরূপ বিভিন্ন প্রকার আকৃতি ও বর্ণবিশিষ্ট, স্ত্রী ও পুরুষের সংমিশ্রণে বংশবৃদ্ধি হয় তাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ নিয়ম তাহাদের পক্ষে বর্ত্তে না কেন? উপরিউক্তরূপ যৌনসম্বন্ধ অসবর্ণ সংমিশ্রণ নহে, এবং তাহা হইতে

(১) মনু, ৯।৮৫—৮৬।

(২) মনু, ৭০।৭০ ; ৯।৭৫৬।

জাত সন্তান সঙ্করবর্ণও নহে, কারণ ত্রিগুণের তারতম্যানুযায়ীই বর্ণবিভাগ হইয়া থাকে, বিভিন্ন দেশে বাস অথবা শরীরের বর্ণ বা আকৃতির পার্থক্য দ্বারা ঐ প্রকার বিভাগ হয় না। এক দেশের লোক সকলেই যে একই গুণবিশিষ্ট অর্থাৎ একই বর্ণ হয়, কিংবা শরীরের বিশেষ বিশেষ আকৃতি বা শ্বেতপীতাদি বর্ণের পার্থক্য দ্বারা ব্রাহ্মণাদি পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ হয়, তাহা নহে; সুতরাং কেবলমাত্র বিভিন্ন দেশবাসী অথবা বিভিন্ন প্রকার শরীরের আকৃতি ও বর্ণবিশিষ্ট স্ত্রীপুরুষের সংমিশ্রণ হইলেই যে, সন্তান সঙ্করবর্ণ হয়, বা তাহাদের বংশলোপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহা নহে। এই জন্যই আমরা কখন কখন দেখিতে পাই যে, এসিয়া ইউরোপ বা অন্য কোন মহাদেশবাসীর অথবা শ্বেত কৃষ্ণ বা পীতকায় ব্যক্তিগণের মধ্যে পরস্পর বিবাহ হইলে, তাহাদের অনেকের সন্তান জন্মিয়া থাকে এবং সেই সন্তানগণেরও বংশ লোপ হয় না। তাহারা ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসী অথবা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্ররূপ শরীরের বর্ণবিশিষ্ট হইলেও যে স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পর সমগুণাবলম্বী তাহাদের বংশলোপের আশঙ্কা থাকে না।

উচ্চবর্ণা স্ত্রীর নিকৃষ্ট বর্ণ পুরুষের সহিত সংসর্গকে প্রতিলোম বিবাহ কহে। শাস্ত্রকারগণ এই প্রকার বিবাহ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন এবং তাহাদের সন্তানগণকে নিকৃষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহার অনেকগুলি কারণ আছে, তন্মধ্যে একটি এই যে, স্ত্রীপুরুষের সঙ্গমে পুরুষের গুণ ও দোষ নানাপ্রকারে স্ত্রীতে যত শীঘ্র ও সহজে এবং স্থায়ীরূপে সঞ্চালিত হইয়া থাকে, স্ত্রীর গুণ ও দোষ পুরুষে সেরূপ হয় না; বিশেষতঃ স্ত্রী গর্ভধারণ করিলে পুরুষের শুক্র তাহার শোণিতের সহিত মিশ্রিত হইয়া শরীরে অন্তর্নিবিষ্ট থাকে, সুতরাং ইহাতে অধিকতররূপে পুরুষের গুণ ও দোষ স্ত্রীতে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। অতএব ইহা হইতে বুঝিতে পারা গেল যে, উচ্চবর্ণা

অর্থাৎ উৎকৃষ্টগুণাধিকা যদি নিকৃষ্ট গুণাবলম্বীর সহিত সংবদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহার উৎকৃষ্ট গুণ নষ্ট হইয়া নিকৃষ্ট গুণের আধিক্য হয়, সুতরাং তাহার অধিকতর অপকর্ষ সাধিত হইয়া থাকে (১)।

ইহা ব্যতীত ঐ প্রকার সংসর্গ নিষেধের অন্যান্য কারণের মধ্যে আরও একটি কারণ আছে। পশুগণের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক জাতির স্ত্রীর সহিত অপর জাতির পুরুষের সংমিশ্রণ হইলে জননীর অপেক্ষা জনকের সহিত সন্তানের অধিকতর সাদৃশ্য থাকে (২); এবং উহাদের উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পুরুষের সহিত সন্তানের যতটা সাদৃশ্য থাকে, পুরুষ নিকৃষ্ট শ্রেণীর হইলে পূর্ব্বোক্ত হইতে অধিকতর সাদৃশ্য হয়। অশ্ব ও গর্দ্দভ জাতির সংমিশ্রণে এই প্রকার ঘটিয়া থাকে তাহা আমরা দেখিতে পাই। ঘোটকগর্দ্দভীর সন্তানের সহিত ঘোটকের যতটা সাদৃশ্য, গর্দ্দভঘোটকীর সন্তানের সহিত গর্দ্দভের তাহা অপেক্ষা অধিকতর সাদৃশ্য হয় (৩)। এই নিয়ম মনুষ্যে প্রয়োজ্য হইলে,

---

(১) যাদৃগ্গুণেন ভর্ত্রা স্ত্রী সংযুজ্যেত যথাবিধি।
তাদৃগ্গুণা সা ভবতি সমুদ্রেণেব নিম্নগা॥

মনু, ৯।২২।

নদী যেমন সমুদ্রসহযোগে লবণাম্বু হইয়া থাকে, তদ্রূপ স্ত্রী যে প্রকার গুণাবলম্বী পুরুষের সহিত সংযুক্ত হয়, সেইরূপ গুণবিশিষ্টা হইয়া থাকে।

(২) Children resemble in feature and constitution, both parents, but I think more generally the father. In the breeding of horses and oxen, great importance is attached by experienced propagators, to the male.

Dr. Prichard's "Researches."
Vol. II, 551 (quoted in Combe's
"Constitution of Man.", p. 147.)

(৩) I think those authors are right who maintain that the ass has the prepotent power over the horse so that both the mule and

উচ্চবর্ণা স্ত্রীতে নীচবর্ণ পুরুষ কর্তৃক জাত সন্তান নিকৃষ্টপিতৃগুণাবলম্বী হইয়া থাকে (১), সুতরাং তাহা হইতে যে বংশ উৎপন্ন হয়, তাহার উৎকর্ষ না হইয়া অপকর্ষই হইয়া থাকে, অতএব এই প্রকার সংমিশ্রণে সমাজের উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে না। আর্য্য শাস্ত্রকারগণ কর্তৃক ঐ প্রকার বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ার ইহাও আর একটি কারণ।

কেহ কেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, গর্দ্দভ ও ঘোটকীর, অর্থাৎ পশুগণের মধ্যে কোন একটি নিকৃষ্ট জাতির পুরুষের সহিত উৎকৃষ্টতর জাতির স্ত্রীর সংমিশ্রণে অধিক সন্তান জন্মে না, এবং যাহারা জন্মে তাহাদের প্রায়ই বংশলোপ হইয়া থাকে (২)। এই নিয়ম যদি

---

the hinny resemble more closely the ass than the horse ; but that the prepotency runs more strongly in the male than in the female ass, so that mule which is the offspring of the male ass and mare, is more like an ass, than is the hinny which is the offspring of the female ass and stallion.

Darwin's "Origin of Species", Ch. IX, p. 261.

(১) पतिर्भार्य्यां संप्रविश्य गर्भो भूत्वेह जायते ।
जायायास्तद्धि जायात्वं यदस्यां जायते पुनः ॥
यादृशं भजते हि स्त्री सुतं सूते तथाविधम् ।
तस्मात् प्रजाविशुद्ध्यर्थं स्त्रियं रक्षेत् प्रयत्नतः ॥

মনু, ৯।৮, ৯।

পতি ভার্য্যায় প্রবিষ্ট হইয়া, তদ্‌গর্ভ হইতে পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করে; জায়া হইতে পুনর্জন্ম হয় বলিয়াই জায়ার জায়াত্ব। স্ত্রী যাদৃশ ভর্ত্তাকে ভজনা করে, নিশ্চয়ই তাদৃশ পুত্র সমুৎপাদন করিয়া থাকে, এ কারণ সৎপুত্রলাভার্থ স্ত্রী প্রযত্নে রক্ষনীয়া।

(২) Fecundation of the hybrid female by the male ass or the stallion is not very rare ; but it is otherwise with the male hybrid, no instance being recorded in which he has been prolific, though

মনুষ্যসম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে, তাহা হইলে উৎকৃষ্টবর্ণা স্ত্রীর সহিত নিকৃষ্টবর্ণের পুরুষের বিবাহ হইলে, তাহাদের বংশলোপের সম্ভাবনা থাকে। বোধ হয় শাস্ত্রে এই প্রকার বিবাহসম্বন্ধে নিষেধের ইহাও আর একটি কারণ।

পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, নানা কারণবশতঃ কোন ব্যক্তির বংশে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্ররূপ গুণাবলম্বী হইয়া ভিন্ন ভিন্ন বর্ণীয় সন্তান জন্মিতে পারে, কিন্তু তাহারা সমাজে সেই মূল পুরুষের বর্ণরূপেই পরিগণিত হইয়া থাকে। সুতরাং মধ্যে মধ্যে যদি সমাজ সংস্কার না হয়, তাহা হইলে কেবলমাত্র একই বর্ণের পৃথক্ পৃথক্ বংশ দেখিয়া বিবাহ দিলেই যে বরকন্যা উভয়েই প্রায় সমগুণাবলম্বী হয়, তাহা নহে। ইহা সামাজিক সবর্ণ বিবাহ হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে স্ত্রীপুরুষ সবর্ণ বা সমগুণাবলম্বী না হইতে পারে, এই জন্য আর্য্যগণ সামাজিক সবর্ণের মধ্যেত পরস্পর বিবাহকার্য্য সম্পাদন করিতেনই, তদ্ব্যতীত বরকন্যা সমগুণাবলম্বী কি না দেখিবার জন্য জ্যোতিষেরও আশ্রয় গ্রহণ করিতেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, মনুষ্য সত্বাদি গুণত্রয়ের যে পরিমাণ সংমিশ্রণ লইয়া দেহত্যাগ করে, পুনরায় ঠিক সেইরূপ স্বভাব বা ত্রিগুণ লইয়াই জন্মগ্রহণ করে। যেমন ত্রিগুণের বহুবিধরূপ সংমিশ্রণ

---

physically the animal appears to be perfect, and often exhibits an intense ardour for the female. The female mule, when fecundated, seldom reaches the natural term of pregnancy and rarely brings forth a living offspring.

Fecundation is not so certain between the ass and horse species as between the male and female of either species, for, while of four mares three at least will be fecundated by the stallion, as a rule only two will be so by the ass.

Encyclopædia Britanica, 9th Edition, vol. XVII, p. 13.

হইতে পারে, সেইরূপ গ্রহনক্ষত্রাদিরও অসংখ্যরূপ অবস্থান হইতে পারে। আর্য্যগণ বহুকাল ধরিয়া সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, মনুষ্যগণ ভূমিষ্ঠকালে ঐ সকল গ্রহনক্ষত্রাদির মধ্যে স্থূল কয়েকটির পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সংস্থিতিবশতঃ জাত ব্যক্তিগণের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্ররূপ মানসিক প্রকৃতি হইয়া থাকে। ইহা হইতে তাঁহারা কতকগুলি নিয়ম স্থির করিয়াছেন যে, উহাদের কতিপয় বিশেষ বিশেষ রূপ সংস্থিতির সময়ে জাত মনুষ্য নির্দ্দিষ্ট বিভিন্ন বিভিন্ন রূপ গুণের আধিক্য লইয়া জন্মগ্রহণ করে। জন্মকালীন সময় জানিলে ঐ সকল নিয়মানুসারে বুঝিতে পারা যায় যে, জাত ব্যক্তি কোন্ গুণাবলম্বী, অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে স্বাভাবিক কোন্ বর্ণের অন্তর্গত। এইরূপ বরকন্যার বর্ণ স্থির করিয়া উভয়ে যদি সমানবর্ণ হয়, তাহা হইলে সেই জোটকই উৎকৃষ্ট - সেই বিবাহই শ্রেষ্ঠ। এইরূপ হইলেই উভয়ে প্রায় সমগুণাবলম্বী হয়, এবং তাহাদের মিলনে উভয়েরই ক্রমে ক্রমে উৎকর্ষ সাধিত হয় ও তাহাদের দীর্ঘজীবী সুসন্তান জন্মিয়া থাকে এবং বংশলোপেরও সম্ভাবনা কম হয়। পর পর নিকৃষ্টবর্ণের সহিত বিবাহ জ্যোতিষ-মতেও ক্রমান্বয়ে অধম এবং প্রতিলোমবিবাহ অর্থাৎ উৎকৃষ্টবর্ণার সহিত নিকৃষ্টের বিবাহ একবারেই নিষিদ্ধ। (১)

---

(১) জ্যোতিষ মতে বর্ণনির্দ্ধারণের নিম্নলিখিত নিয়মটি অন্যতম,—

ক্ষনৃবিট্ শূদ্রবিপ্রাঃ স্যুঃ ক্রমাম্মেষাদিরাশয়ঃ।

অতঃ বর্ণাধিকা কন্যা নৈবোদ্বাহ্যা কদাচন॥

জ্যোতিষকল্পদ্রুম, ৪।৪৯।

মেষাদি রাশিতে জাত ব্যক্তি ক্রমান্বয়ে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও বিপ্রবর্ণ হইয়া থাকে। বর্ণাধিকা কন্যা কখনই বিবাহ্যা নহে।

রক্তসম্পর্কীয়গণের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ।

অনেকে বলিতে পারেন যে, যদি সমগুণাবন্বীর সহিত বিবাহই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে নিজ বংশের মধ্যে পরস্পর বিবাহ হইলে ত বিশেষরূপে সমানগুণযুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যেই হয়, সুতরাং ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বিধেয়। কিন্তু প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী, সুতরাং শাস্ত্রের বিধানমতে, এ প্রকার বিবাহ একেবারেই বিধেয় নহে। পরিণয়কার্য্যে স্ত্রীপুরুষ কেবলমাত্র যে সমগুণাবন্বী হইবে তাহা নহে; যদিও ইহারই উপরে বিশেষরূপে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, তথাপি এতদ্ব্যতিরিক্ত আরও অনেক বিষয় আছে, যাহা বিচার করিয়া স্ত্রী নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য, তন্মধ্যে একটি নিয়ম এই যে, নিকট রক্তসম্পর্কীয়া পরিত্যজ্যা। আর্য্যশাস্ত্রকারগণ যদিও সবর্ণা স্ত্রী বিবাহ করিবার বিধি করিয়াছেন, কিন্তু উপরিউক্ত কারণবশতঃ পিতার সগোত্রা ও মাতার সপিণ্ডাকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন (১)। ঐ নিয়মদ্বারা ঘনিষ্টরক্তসম্পর্কীয়ামাত্রই পরিত্যক্তা। ইহুদী, গ্রীক, রোমানপ্রভৃতি পুরাতন এবং খ্রীষ্টান্, মুসলমানপ্রভৃতি আধুনিক সমাজে কেবলমাত্র অতি সন্নিকট রক্তসম্পর্কীয়াগণের মধ্যেই পরস্পর বিবাহ নিষিদ্ধ, কিন্তু আর্য্যশাস্ত্রমতে অতি দূরতর রক্তসম্পর্কীয়াও অবিবাহ্যা।

যদি একই বৃক্ষের দুইটি ফলের কিংবা এক বৃক্ষের দুইটি বীজ হইতে উৎপন্ন দুইটি বৃক্ষের দুইটি পরাগ মিশ্রিত করিয়া পরীক্ষা করা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, তাহা হইতে যে ফল উৎপন্ন হয়, তাহা সাতিশয় পুষ্ট হয় না এবং সেই ফলের বীজ হইতে প্রায়ই বৃক্ষ জন্মে না, যদিও কোনটিতে জন্মে তাহা সতেজ

(১) মনু, ৩।৪।৫,

ও সুপুষ্ট হয় না। পশুপক্ষীগণের মধ্যেও একই স্ত্রীপুরুষ হইতে উৎপন্ন বংশের মধ্যে যদি পরস্পর সংমিশ্রণ ঘটে, তাহা হইলে তাহাদের সন্তানগণ অপেক্ষাকৃত রুগ্ন, শীর্ণ ও স্বল্পায়ু হইয়া থাকে এবং কিছুদিন পরে তাহাদের একেবারে বংশলোপ হইয়া যায়। ঐরূপ মনুষ্যজাতিতে নিকট রক্তসম্পর্কীয়গণের মধ্যে পরস্পর বিবাহ হইলে স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই এবং তাহাদের সন্তানসন্ততিগণেরও শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা ও তেজহীনতা হয়, এবং তাহাদের অধিক সন্তান জন্মে না ও শীঘ্রই বংশলোপ হইয়া যায় (১)। হিন্দুসমাজে প্রত্যেক বর্ণের অন্তর্গত অনেকগুলি শ্রেণী বা জাতি আছে, এই এক একটি শ্রেণীর মধ্যেই বিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকায়, যে সকল শ্রেণী অতি ক্ষুদ্র সেই সকল শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিসমূহের নিকট রক্ত-সম্পর্কীয়গণের মধ্যে পরস্পর বিবাহ ব্যতীত উপায় থাকে না, সুতরাং

---

(১) Consanguinity in the parents exerts a deteriorating influence on the children. The degeneracy, and even, idiocy of some of the noble and royal families of Spain and Portugal, from marrying nieces and other near relatives is well known and in these cases defective brains may be observed.

Combe's "Constitution of Man", 141.

Another law of the animal kingdom deserves attention, namely, that by which marriages between blood relations tend to the deterioration of the physical and mental qualities of the offspring. In Spain, kings marry their nieces, and in this country first and second cousins marry without scruple, although every physiologist will declare that this is in opposition to the institutions of Nature.

This law holds also in the vegetable kingdom. "A provision of a very simple kind, is in some cases made to prevent the male and female blossoms of the same plant from breeding together, this being found to hurt the breed of vegetables, just as breeding in and in does the breed of animals. It is contrived that the dust shall be

ঐ কারণবশতঃ অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রেণী লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং অনেকগুলি লুপ্তপ্রায় হইয়াছে (১)।

হিন্দুগণ! তোমরা শারীরিক ও মানসিক বল হারাইয়া এবং ভ্রমবশতঃ কেবলমাত্র পাশবিক বলকেই শ্রেষ্ঠ ভাবিয়া, তাহার অভাব হওয়াতে নিজকে ধিক্কার দিয়া বৃথা মনোদুঃখে দিনযাপন করিতেছ। তোমরা সংযম শিক্ষা হারাইয়াছ, পূর্ব্বপুরুষদিগের নিয়মসকল অমান্য করিয়া তাঁহাদের দর্শিত পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছ, সেই জন্যই বোধ হয় তোমাদের এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। মনে হইতেছে যে পূর্ব্বপুরুষগণ তাঁহাদের অধম অকৃতী নিরাশ্রয় সন্তানগণকে অলক্ষিতভাবে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া যেন বলিতেছেন যে,

---

shed by the male blossom before the female is ready to be affected by it, so that the impregnation must be performed by the dust of some other plant, and in this way the breed be crossed."

If two near relations, in robust health and possessing very favourably developed brains, unite in marriage, their offspring may not be deteriorated *so much* below the common standard of the country as to attract particular attention, and in such cases the law of nature is supposed not to hold good; but it does not operate, for to a law of nature there is no exception. The offsprings are doubtless inferior to what they *would have been*, if the same parents had united with strangers in blood, of *equal vigour and cerebral development.* Whenever there is any remarkable deficiency in parents who are related in blood, these appear in mixed and aggravated forms in the offspring. This fact is so well known, and so easily ascertained, that I forbear to enlarge upon it.

Combe's 'Constitution of Man', p. 163.

(১) গয়ার গয়ালিগণের সংখ্যা অত্যন্ত কম হইয়া প্রায়ই বংশলোপ হওয়ার ইহাও অন্যতম কারণ। আণ্ডামানদ্বীপে আদিম অধিবাসীদিগের ও সিকিমবাসী লেপচাদিগের যে বংশলোপ হইতেছে, তাহার কারণও এইরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

"আমাদের প্রদর্শিত পথে গমন কর, আমাদের নির্দ্দিষ্ট নিয়ম পালন কর, গৃহস্থ হইয়াও সংযমী হও, তাহা হইলে দেখিবে যে পাশববল অতি তুচ্ছ, তোমাতে সকল দেবতার দৈবী শক্তি সঞ্চারিত হইবে, তোমার দশেন্দ্রিয় দমিত হইয়া শক্তিময়ী তোমাতে আবির্ভূতা হইবেন। তাঁহার নিকট ছাগমহিষাদিরূপ কামক্রোধাদি রিপুগণকে বলিপ্রদান কর, আহারনিদ্রাদি পশুবৃত্তিসকলকে দমন করিয়া রাখ, দম্ভদর্পঅভিমানপ্রভৃতি আসুরিক ভাবসকলকে নিহত কর, তাহা হইলে তুমি কার্ত্তিকের ন্যায় সৌন্দর্য্য-কান্তি-শৌর্য্য-বীর্য্য-সম্পন্ন, গণপতির ন্যায় বিঘ্নবিনাশক, সুদূরদর্শী, প্রখরবুদ্ধি ও জ্ঞানবান্, সরস্বতীর ন্যায় বিদ্বান্, এবং লক্ষ্মীর ন্যায় ঐশ্বর্য্যশালী হইবে। যাহাদের এই প্রকার অবস্থা হয়, অসীমবলযুক্ত পশুশ্রেষ্ঠ কেশরীও তাহার পদদলিত হইয়া বাহন হয়, এবং দৈত্য বা অসুরের ন্যায় বলশালী ব্যক্তিও তাহার পরাক্রম সহ্য করিতে পারে না।"

বিধবাবিবাহ এবং ইহা কাহাদের কর্ত্তব্য ও কাহাদের অকর্ত্তব্য।

মানবগণের মধ্যে যাহারা পশু হইতে কিয়ৎপরিমাণে উন্নত, সুতরাং যাহাদের তমোগুণ অতিশয় প্রবল, তাহাদের দাম্পত্যসম্বন্ধ অত্যন্ত শিথিল, তাহারা পশুর ন্যায় স্বেচ্ছাচারিতাপূর্ণ এবং তাহাদের স্ত্রীগণ যখন যাহাকে হউক পতিরূপে গ্রহণ করে। তাহাদের অপেক্ষা যে মনুষ্যগণ কিঞ্চিৎ উন্নত, অর্থাৎ যাহাদের তমোগুণ তাহাদের হইতে কিছু কম, তাহাদের সমাজে এই প্রকার বিধি প্রচলিত আছে যে, স্ত্রীগণ কামরিপুচরিতার্থতার জন্ত কিয়ৎকাল কোন পুরুষের নিকট পত্নীভাবে থাকিবার চুক্তি করিয়া থাকে; ইহাই তাহাদের মধ্যে বিবাহ নামে অভিহিত। আবার উহা হইতে যাহারা আরও কিছু উন্নত,

তাহাদের সমাজে পতির জীবনকাল পর্য্যন্ত অথবা যতদিন কতকগুলি শর্ত্তানুযায়ী উভয়ে চলিতে পারে, ততদিনই, পুরুষস্ত্রী পতিপত্নীভাবে অবস্থিতি করিয়া বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ থাকে, নতুবা ঐ সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া যায়।

হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী বিবাহ চুক্তিবন্ধন নহে, পশুর ন্যায় কামরিপু-চরিতার্থতাও ইহার উদ্দেশ্য নহে। চরম লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য স্ত্রীপুরুষ উভয়ে যে বিশাল পথের পথিক, উভয়ে পরস্পরের সত্তা এক করিবার চেষ্টা করিয়া ক্রমশঃ উৎকর্ষ লাভ করিতে করিতে যে অনন্ত পথে অগ্রসর হইয়া থাকে, সেই পথে উভয়ে পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিবার জন্য পবিত্র বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হইয়া থাকে, ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ; অর্থাৎ ধর্ম্মাচরণের জন্য একজন অপরের সাহায্য করিয়া থাকে, তাহাই বিবাহের একটি প্রধান উদ্দেশ্য। ধর্ম্মোপার্জ্জনের সুবিধার্থ এবং সাংসারিক সুব্যবস্থাবিধানের জন্যই এই বিবাহবন্ধন বিহিত। সন্তানোৎপাদনও ইহার একটি মুখ্য উদ্দেশ্য; ইহজীবনের সহায়ের জন্য এবং পারলৌকিক উপকারার্থ পুত্রের প্রয়োজন। কাম-রিপুচরিতার্থতা ইহার আনুষঙ্গিক ফলমাত্র। এ বিবাহে পাশবিকভাব নাই, সুতরাং এ বন্ধন কখনও ছিন্ন হইবার নহে। পশুগণের স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গ স্বেচ্ছামত বিচ্ছিন্ন হয়, অর্থাৎ উহাদের একটি পূর্ব্বসঙ্গীকে ভুলিয়া গিয়া অন্যকে সম্মুখে পাইয়া কামরিপুচরিতার্থ করিয়া থাকে; পশু হইতে যে সকল মনুষ্য কিয়ৎপরিমাণে উন্নত, যাহাদের পাশবিক ভাব অধিক পরিমাণে হ্রাস হয় নাই, তাহাদেরও বিবাহবন্ধন ঐ প্রকারে যখন ইচ্ছা ছিন্ন হইয়া থাকে।

আর্য্যশাস্ত্রে কোন বিষয়েই সকলের জন্য একই প্রকার নিয়ম বিধিবদ্ধ হয় নাই; ইহাই ইহার বিশেষত্ব ও উৎকর্ষ, যে ব্যক্তি পশু-ভাবাপন্ন সে যাহাতে প্রকৃত মনুষ্য হইতে পারে, এবং মানুষ যাহাতে

দেবভাবাপন্ন হইতে পারে, শাস্ত্রকারগণ তাহারই উপায় উদ্ভাবন করিয়া সত্বাদি ত্রিগুণের কোনটির প্রবলতা ও কোনটির দুর্ব্বলতানুযায়ী মনুষ্যগণকে চারিবর্ণে বিভাগ করিয়াছেন এবং প্রত্যেক বর্ণের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কর্ত্তব্য কার্য্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন, এ সমস্ত পূর্ব্বে বিশেষরূপে বলা হইয়াছে। ব্যক্তিবিশেষের স্বেচ্ছাচারিতা বা স্বার্থপরতা এ বিভাগের ভিত্তি নহে। যাঁহাদিগকে স্বার্থপরতা কখনও স্পর্শ করিতেও সাহসী হয় নাই, সেই নিঃস্বার্থ ও লোকহিতৈষী আর্য্যঋষিগণের গভীর চিন্তাপ্রসূত নিয়মসকল আজ আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে পদদলিত করিয়া অধঃপতিত হইতেছি।

পত্নীর কি জন্য একমাত্র পতির অনুসরণ করা উচিত, এস্থলে বাহুল্যভয়ে তৎসম্বন্ধে বিশেষরূপে আলোচনা কর্ত্তব্য বোধ করিলাম না। কেবলমাত্র সমাজের শৃঙ্খলার জন্য শাস্ত্রকারগণ এ নিয়ম করেন নাই। ইহাতে স্ত্রীগণের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধিত হয়, সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে সমাজে সুখশান্তির প্রসার হইয়া থাকে। পুরুষগণ স্বকীয় অধিকারবিস্তারের জন্য স্বার্থপরতাবশতঃ যে এই প্রকার নিয়ম করিয়াছেন ইহা কোনরূপেই মনে করা উচিত নয়। পুরুষের সহিত রমণীর কখনই সমান অধিকার হইতে পারে না। স্বভাববশতঃই ইহাদের আকৃতি, প্রকৃতি, মানসিকভাব প্রভৃতি পুরুষের হইতে বিভিন্ন, সুতরাং তাহাদের কার্য্যও বিভিন্নরূপ হইয়া থাকে। আবার সকল মহিলার পক্ষেও একই প্রকার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইতে পারে না, যে তমোগুণাবলম্বিনী সে কি সত্বগুণাবলম্বিনী দেবীস্বরূপা রমণীর কর্ত্তব্যপালনে সক্ষম হইতে পারে? কিংবা শেষোক্ত যদি প্রথমোক্ত রমণীর কর্ত্তব্য কার্য্য আচরণ করে, তাহা হইলে কি তাহার অপকর্ষ সাধিত হয় না? তমোগুণাধিকা রমণী স্বভাবতঃ কামপ্রবলা হইয়া হিতাহিতজ্ঞানশূন্যা হয়, এই জন্য যাহাতে সে বিপথগামিনী হইয়া সমাজের কণ্টকস্বরূপ না হয় এবং

যাহাতে তাহার নিজেরও উৎকর্ষসাধনের ব্যাঘাত না হয়, তাহারই প্রতিবিধানার্থ বৈধব্যদশায় পত্যন্তর গ্রহণ করা তাহার পক্ষে কর্ত্তব্য হইতে পারে, কিন্তু অপরের পক্ষে নহে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রবৃত্তির ভিতর দিয়া ক্রমে ক্রমে নিবৃত্তির দিকে লইয়া গিয়া তাহার উৎকর্ষ সাধন করাই আর্য্যশাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য। বেগবান্ প্রবৃত্তিস্রোত একেবারে অকস্মাৎ রোধ করিলে বান্ধ ভাঙ্গিয়া যায়; এই জন্য ধীরে ধীরে উহাকে সংযত করিতে হয়, ক্রমশঃ তাহাকে নিবৃত্তির দিকে লইয়া যাইতে হয়। যে উৎকৃষ্ট গুণাবলম্বিনী তাহাকেও প্রবৃত্তির স্রোতে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নহে, তাহা হইলে ঐ স্রোতে তাহাকেও টানিয়া লইয়া যাইতে পারে, এবং সহজেই সে তাহাতে ভাসিয়া গিয়া অধঃপতিতা হইতে পারে, তখন তাহাকে সংযত করিয়া নিবৃত্তির দিকে লইয়া যাওয়া অত্যন্ত কষ্টকর হয়, এইজন্যই হিন্দুশাস্ত্রকারগণ তাহাদিগকে একটির অতিরিক্ত পতি পাইবার প্রলোভন দেন নাই। রমণীদিগকে ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে লইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে পৃথক্ পৃথক্ গুণানুযায়ী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নিয়ম তাঁহারা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহারা পুরুষের জন্য যেমন বর্ণভেদে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নিয়ম করিয়াছেন, স্ত্রীগণের সম্বন্ধেও তদ্রূপ করিয়াছেন।

পতির মৃত্যুর পরে পত্যন্তর গ্রহণ করিতে শাস্ত্র নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু সকল রমণীকেই ঐ প্রকার নিষেধ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। ভগবান্ মনু বলেন,—

"ন দ্বিতীয়শ্চ সাধ্বীনাং ক্বচিদ্ভর্ত্তোপদিশ্যতে।" (১)

"কোন শাস্ত্রেই সাধ্বী স্ত্রীগণের দ্বিতীয় ভর্ত্তা গ্রহণের উপদেশ নাই।" সুতরাং যে তমোগুণবশতঃ অসাধ্বী বা অসাধ্বী হইবার

(১) মনু, ৫।১৬২।

সম্ভাবনা, তাহার পক্ষে ঐ নিয়ম প্রয়োজ্য নহে। তিনি আরও বলিয়াছেন,—

> নান্যস্মিন্ বিধবা নারী নিযোক্তব্যা দ্বিজাতিভিঃ।
> অন্যস্মিন্ হি নিযুঞ্জানা ধর্মং হন্যুঃ সনাতনম্॥
> নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্ত্যতে ক্বচিৎ।
> ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ॥
> অয়ং দ্বিজৈর্হি বিদ্বদ্ভিঃ পশুধর্মো বিগর্হিতঃ। ইত্যাদি। (খ)

"দ্বিজগণ অর্থাৎ শূদ্রব্যতীত অপর তিনবর্ণ ব্যক্তিগণকর্ত্তৃক বিধবা নারী অন্য পুরুষগমনে নিয়োজিতা হইতে পারে না, যে হেতু, যাহারা তাহাদিগকে ঐ প্রকার নিযুক্ত করে, তাহারা সনাতন ধর্ম্ম নষ্ট করে। বিবাহে যে সকল মন্ত্র আছে তাহাতে নিয়োগসম্বন্ধে কিছু উল্লেখ নাই এবং শাস্ত্রে বিবাহবিধিতে বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহ উক্ত হয় নাই। বিদ্বান্ দ্বিজগণকর্ত্তৃক ইহা বিগর্হিত পশুধর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে।"

উপরিউক্ত বচনসমূহ হইতে ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় যে, মহর্ষি মনুর মতে শূদ্র ব্যতীত অপরবর্ণের মধ্যে বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ, কিন্তু শূদ্রের হইতে পারে। তিনি ইহাকে বিগর্হিত পশুধর্ম্ম বলিয়াছেন, সুতরাং যাহারা পশু হইতে কিয়ৎ পরিমাণে উন্নত, অর্থাৎ যাহারা পশুভাবাপন্ন, তাহাদেরই মধ্যে এই পশুধর্ম্ম থাকিতে পারে, তাহাদেরই এই প্রকার বিবাহ হইতে পারে। তমোগুণাধিক বর্ণই স্বভাবতঃ অধিকতর পাশবিক ভাবযুক্ত, সুতরাং তাহাদেরই

(খ) মনু, ৯।৬৪-৬৮।

মধ্যে বিধবাবিবাহ বিধেয় হইতে পারে, অতএব শূদ্রা বিধবার বিবাহ হইলে কোন দোষ নাই।

শাস্ত্রকারগণ যাহাদিগকে পত্যন্তরগ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, তাহাদিগকে কেবল ঐ প্রকার নিষেধ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, যাহাতে তাহারা আর প্রবৃত্তির স্রোতে ভাসিয়া না যাইতে পারে, সংযত হইতে সক্ষম হয়, এবং ক্রমে ক্রমে উৎকৃষ্ট গুণের আধিক্য লাভ করিতে করিতে উৎকর্ষের দিকে ধাবিত হইতে পারে, তজ্জন্য কেবল পুরুষসঙ্গ নহে, অন্যান্য নানাপ্রকার কার্য্যও নিষেধ করিয়াছেন, এবং যাহাতে রিপুগণ প্রবল হইতে না পারে, ও ইন্দ্রিয়গণ সংযত হয়, সেই উদ্দেশ্যে আহারাদিদ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয়ের কার্য্যসাধন-সম্বন্ধেও নানাপ্রকার বিধান করিয়াছেন। যাহাতে তমঃ ও রজোগুণের ক্রমে ক্রমে হ্রাস এবং সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয়, সেই প্রকার কার্য্যই তাহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শাস্ত্রবিহিত এই সকল কর্ত্তব্য কার্য্যপালন এবং অকর্ত্তব্য কার্য্যের পরিহারই ব্রহ্মচর্য্য। ঐ প্রকার রমণীগণের কর্ত্তব্যসম্বন্ধেই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

> कामन्तु क्षपयेद्देहं पुष्पमूलफलैः शुभैः।
> न तु नामापि गृह्णीयात् पत्यौ प्रेते परस्य तु॥
> आसीतामरणात् क्षान्ता नियता ब्रह्मचारिणी।
> यो धर्म एकपत्नीनां काङ्क्षन्ती तमनुत्तमम्॥
> मृते भर्त्तरि साध्वी स्त्री ब्रह्मचर्य्यव्यवस्थिता।
> स्वर्गं गच्छत्यपुत्रापि यथा ते ब्रह्मचारिणः॥ (১)

"পতি মৃত হইলে স্ত্রী আগ্রহের সহিত পবিত্র পুষ্পফলমূলাদি আহার দ্বারা দেহ ক্ষীণ করিবেন, কিন্তু ব্যভিচারবুদ্ধিতে পরপুরুষের

(১) মনু, ৫।১৫৭, ১৫৮, ১৬০।

নাম গ্রহণও করিবেন না। একমাত্রপতিপরায়ণা স্ত্রীদিগের যাহা পরম ধর্ম্ম সেই ধর্ম্ম অভিলাষিনী, ক্লেশসহিষ্ণু, নিয়মচারিণী সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক দেহত্যাগপর্য্যন্ত অবস্থান করিবেন।

সাধ্বী স্ত্রী অপুত্রা হইলেও স্বামীর মৃত্যুর পরে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মচারীর ন্যায় স্বর্গে গমন করেন।"

মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যব্রতে স্থিতা।
সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥ (১)

"স্বামীর মরণান্তে যে নারী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, তিনি মৃত্যুর পর ব্রহ্মচারীর ন্যায় স্বর্গলাভ করেন।"

শাস্ত্রে যে বর্ণের পুরুষগণের জন্য গৃহস্থাশ্রমের ধর্ম্ম ব্যতীত অন্য কোন আশ্রমের কর্ত্তব্য বিহিত হয় নাই, সুতরাং ব্রহ্মচর্য্য আচরণের বিধি নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, সেই শূদ্রবর্ণের স্ত্রীগণ কি প্রকারে তাহা আচরণ করিবে এবং শাস্ত্রকারগণ কেনই বা সেরূপ নিয়ম প্রচার করিবেন? পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাঁহারা একেবারে হঠাৎ প্রবৃত্তির প্রবল স্রোত রোধ করিবার জন্য প্রয়াস পান নাই; প্রবৃত্তির পথ দিয়া সম্ভবমত ধীরে ধীরে সংযম অভ্যাস দ্বারা মনুষ্যগণকে নিবৃত্তির দিকে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহারা উপদেশ দিয়াছেন। তমোগুণ-প্রবলা পিশাচপ্রকৃতি রমণী যতগুলি পতিরই অঙ্কশায়িনী হউক না কেন, কিছুতেই তাহার তৃপ্তি হইবে না, সে নিরপত্যাই হউক বা পুত্রপৌত্রাদিসমন্বিতাই হউক, সে বালিকাবস্থাতেই বিধবা হউক বা বৃদ্ধাবস্থাতেই পতিহীনা হউক, তাহার মানসিক নীচপ্রবৃত্তিসমূহ কখনই মন্দীভূত হয় না, তাহার মনের আকাঙ্ক্ষা যেন প্রশমিত হইবার নয়। এ জন্য ঐ প্রকার স্ত্রীগণকে কিয়ৎপরিমাণে সংযত

(১) পরাশরসংহিতা,।৪।২৭।

করিবার উদ্দেশ্যে, বৈধব্যাবস্থায় পুনরায় বিবাহবন্ধনে বদ্ধ করিয়া দিলে, তাহারা এককালে কেবল একটিমাত্র পুরুষেরই অনুগামিনী হইয়া থাকিতে পারে; আর্য্যশাস্ত্র বোধ হয় ঐ প্রকার নারীগণের জন্যই বিধবাবিবাহের বিধান করিয়া গিয়াছেন। তাহাদেরই সম্বন্ধে বোধ হয় শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥ (১)

"স্বামী যদি নিরুদ্দেশ, মৃত, সন্ন্যাসী, ক্লীব, বা পতিত হন, তাহা হইলে নারী পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারে।"

এই শ্লোকের ঠিক পরেই আবার ঐ গ্রন্থে বিধবাগণের জন্য ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা আছে তাহা পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে (২)।

অতএব পূর্ব্বোক্ত শ্লোকসমূহ হইতে ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে, ব্রহ্মচর্য্য অথবা পত্যন্তরগ্রহণ সকল বিধবার পক্ষেই যে নির্ব্বিশেষে বিধেয় তাহা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে।

যে রমণী সত্ত্বগুণাধিকা তাহার ত কথাই নাই, এমন কি যাহার সত্ত্বগুণ অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল তাহার পক্ষেও পত্যন্তর গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। এই কারণবশতঃই হীনবর্ণা স্ত্রীগণের বিধবাবিবাহ শাস্ত্রানুযায়ী বিহিত হইতে পারে, কিন্তু অন্য কোন বর্ণীয়ার, অর্থাৎ ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বা বৈশ্যার সম্বন্ধে সে বিধি প্রয়োজ্য হইতে পারে না। যদি ইহারা কেহ কামপরবশ হইয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দ্বিতীয়বার বিবাহ করে, তাহা হইলে ঐ বিবাহ সিদ্ধ হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহা অতি নিকৃষ্ট বিবাহরূপে গণ্য হয় এবং ঐ স্ত্রীকে পুনর্ভূ ও ঐ বিবাহোৎপন্ন সন্তানকে

---

(১) পরাশরসংহিতা, ৪।২৬।

(২) পরাশরসংহিতা, ৪।২৭।

পৌনর্ভব বলে, ঐ পৌনর্ভব সন্তান হেয় ও নিকৃষ্ট সন্তানরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে (১)। পৌনর্ভব দায়াধিকারসম্বন্ধেও অতি নিকৃষ্টরূপে গণ্য হয়। যে স্ত্রীর কামপ্রবৃত্তি প্রবল সে দ্বিজারূপে পরিগণিতা হইতে পারে না, সুতরাং ঐ কামুকী স্ত্রী কামপরবশ হইয়া ঐ প্রকার বিবাহ করে বলিয়া শূদ্রাস্বরূপ হইয়া থাকে এবং তাহার সংসর্গে দ্বিজের শূদ্রা স্ত্রী পরিণয়ের ন্যায় অবনতি হইয়া থাকে।

শূদ্রব্যতীত অন্যান্য বর্ণের রমণীগণের সকলের পক্ষেই যে ব্রহ্মচর্য্যপালনের সমান নিয়ম তাহাও নহে, যে হেতু সকল বর্ণের প্রকৃতি, প্রবৃত্তি এবং শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা একই প্রকার নহে।

শূদ্রপুরুষগণ ব্রহ্মচর্য্যে অধিকারী নহে, সুতরাং শূদ্রা বিধবার ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, এই জন্য তাহাদের পক্ষে পুনরায় বিবাহ নিষিদ্ধ নহে, ইহা বুঝা গেল ; কিন্তু এই জন্য অনেকে বলিতে পারেন যে, যে দ্বিজ, অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য ব্রহ্মচর্য্যহীন সে শূদ্রভাবাপন্ন, সুতরাং তাহার বংশের বিধবা রমণীগণের জন্য ব্রহ্মচর্য্য কি প্রকারে বিহিত হইতে পারে ? তাঁহারা বলিতে পারেন যে, কেবল-মাত্র উপবীত গলে ধারণ করিলে দ্বিজ হয় না, শাস্ত্রমতে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন না করিলে সে শূদ্ররূপে পরিগণিত হয়, ঐ প্রকার উপবীত-ধারীর বংশের পুরুষগণ যখন নির্দ্দিষ্টকাল নিয়মিতরূপে শাস্ত্রানুযায়ী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করে না, ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করা প্রয়োজনীয় তাহাও জানে না, এমন কি, ইহা কি তাহাও জ্ঞাত নহে, সেই বংশের রমণীগণ কি প্রকারে উহা অবলম্বন করিবে ? সুতরাং শাস্ত্রমতে সেই বংশের বিধবাগণের বিবাহ নিষিদ্ধ হইবে কেন ? বাল্যে ও কৈশোরে যাহারা কেবল শিক্ষা করিয়াছে যে, অর্থোপার্জ্জনই

(১) মনু, ৯।১৭৫।

জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, ধন মান ঐশ্বর্য্যের লালসায় ব্যস্ত হওয়াই প্রকৃত মনুষ্যত্ব, এই রক্তমাংসময় দেহের সুখই পরম সুখ, তাহারা যৌবনে কি প্রকারে সংযমী হইবে? যাহারা শিক্ষা ও সঙ্গদোষে প্রথম হইতেই অসংযমী হইতে অভ্যাস করিয়াছে, তাহাদের যৌবনে সংযমী হওয়া দুষ্কর, সেই সকল অসংযমীর কন্যাও অসংযতা ও রিপুপ্রবলা হইয়া জন্মগ্রহণ করে, সুতরাং তাহারা দ্বিজগুণসম্পন্না থাকে না, অতএব এইপ্রকার বিধবার বিবাহ শাস্ত্রানুযায়ী কি প্রকারে নিষিদ্ধ হইতে পারে? ইত্যাদিরূপ অনেকে বলিতে পারেন। অধুনা অধিকাংশ দ্বিজবংশের বালকের প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্যত দূরের কথা সামান্যরূপ সংযমশিক্ষাও হয় না; ঐ সকল বংশের বালিকাগণও কোনরূপ সংযমশিক্ষা প্রাপ্ত হয় না, যাহারা শিক্ষিতা অথবা যাহারা উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত বলিয়া পরিগণিতা, তাহাদের সেই শিক্ষা কোন্ নামে অভিহিত হইতে পারে তাহা বলা যায় না, ইহাকে কুশিক্ষা বলিলেও ক্ষতি নাই, কারণ ইহাতে সংযম শিক্ষা নাই। এই রক্তমাংসময় দেহের সুখই চরম সুখ ক্রমাগত ইহাতে সেই জ্ঞানই হয়, এই প্রকার শিক্ষার দোষেই যে সকল বালিকা অকালে যৌবন পাইয়া হিতাহিতজ্ঞানশূন্যা হয়, যাহারা নাটক উপন্যাস প্রভৃতিতে বর্ণিত প্রেমিকপ্রেমিকার স্বাধীন প্রণয় বা স্বেচ্ছাচারিতার চিত্র মনে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে এবং সেই সকল যৌবনে যখন তখন মনে স্ফুরিত হইয়া যাহাদিগকে উত্তেজিত করে, তাহারা বিধবা হইলে ব্রহ্মচর্য্য করিবে কি প্রকারে, তাহাদের পক্ষে বিবাহই শ্রেয়ঃ, এই প্রকারও অনেকে বলিয়া থাকেন। অধুনা সমাজের যে প্রকার অবস্থা হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাতে তাঁহাদের কথাই ঠিক, কিন্তু ইহাও দেখিতে হইবে যে, ঐ সমাজে কতকগুলি দোষ ঘটিয়াছে বলিয়া কি তাহাকে একবারে ভাঙ্গিয়া ফেলা কর্ত্তব্য? তাহা হইলে যে পৃথিবীর মধ্যে একটি উৎকৃষ্ট

আদর্শসমাজ একবারে লোপপ্রাপ্ত হইয়া গেল, তাহাতে আর লাভ কি? ভাঙ্গা অতি সহজ, কিন্তু গড়া অতি কঠিন, অতএব যুগযুগান্তর ধরিয়া যাহা গঠিত হইয়া আসিয়াছে, তাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিলে যে সবই একেবারে গেল। উৎকৃষ্টের দিকেই যাইতে হয়, তাহাকেই আদর্শ করিয়া কার্য্য করিতে হয়, সুতরাং অতীতের সেই উৎকৃষ্টতম আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া এই সমাজকে যাহাতে পুনর্জীবিত করিতে পারা যায়, তাহারই চেষ্টা করা কি কর্ত্তব্য নহে? যাহাতে দ্বিজ-বালকগণকে সৎশিক্ষা দিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে বাধ্য করিয়া তাহাদিগকে প্রকৃত মনুষ্য করিতে পারা যায়, এখনও সময় থাকিতে যদি তাহাই করা হয়, তাহা হইলে তাহাই কি শ্রেয়ঃ নহে? তাহা হইলে ঐ সকল বালকের কন্যাগণ জিতেন্দ্রিয়া হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে এবং তৎপরে সৎশিক্ষা পাইয়া রক্তমাংসময় দেহের সুখকে তুচ্ছজ্ঞান করিবে এবং এক পতি ভিন্ন অন্য পুরুষের আশ্রয়গ্রহণ ঘৃণার চক্ষে দেখিবে। ঐ প্রকার অবস্থায় তাহাদের বৈধব্যদশা দেখিতে পিতামাতারও স্নেহের হৃদয় তুষানলে দগ্ধ হইবে না, বরং গৌরবের সহিত স্পর্দ্ধাসহকারে বলিবে যে "আজ আমাদের ব্রহ্মচারিণী দুহিতা আমাদিগকে পবিত্র করিল, আমাদের কুল উজ্জ্বল করিয়া পূর্ব্ব পুরুষগণকে উদ্ধার করিল।"

আধুনিক হিন্দুসমাজে বর্ণবিভাগের যেন কঙ্কালমাত্র অবশিষ্ট আছে, তাহা দেখিলে বোধ হয় যেন ইহার জীবনীশক্তি প্রায় লোপ হইয়া আসিতেছে। উভয়েই সত্ত্বগুণাবলম্বী এইরূপ স্ত্রীপুরুষের বিবাহ এক্ষণে অতি বিরল হইয়াছে, এতদ্ব্যতীত যে বর্ণের, অর্থাৎ যে গুণাবলম্বীর, যে সকল কার্য্য কর্ত্তব্য, অর্থাৎ যে প্রকার আহারাদি এবং ইন্দ্রিয়সমূহের অন্যান্য কার্য্যদ্বারা সত্ত্বাদি বিশেষ বিশেষ গুণের হ্রাস বা বৃদ্ধি হইয়া উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে, সেই সমুদায়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, শাস্ত্রে

যে বর্ণের পক্ষে যে সমস্ত বিধি ও নিষেধ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তদনুযায়ী সকলে চলে না, এবং উচ্চবর্ণজাত কেহ নীচবর্ণীয়ের গুণাবলম্বী হইয়া কোন ঘৃণিত কার্য্যের আচরণ করিলে তাহারও প্রতি সমাজের আর শাসনও নাই। এই সকল কারণবশতঃই বর্ণের বিশুদ্ধতা এক্ষণে রক্ষিত হয় না, সুতরাং অন্যান্য সমাজের ন্যায় এই সমাজও যেন ক্রমে ক্রমে সঙ্করবর্ণের সমাজ হইয়া পড়িতেছে। এই জন্যই বর্ত্তমান সময়ে দেখিতে পাই যে, এই সমাজে পবিত্র ব্রাহ্মণকুলেও অসংখ্য পিশাচ পিশাচী জন্মগ্রহণ করিয়া যথেচ্ছভাবে পৈশাচিক বৃত্তির অনুসরণ করিয়াও উৎকৃষ্টবর্ণরূপে পরিগণিত হইতেছে, আবার অনেক নীচকুলসম্ভূত দেবপ্রকৃতি পুরুষ ও দেবীস্বরূপা রমণীও নিম্নবর্ণরূপে পরিগণিত হইয়া জীবন অতিবাহিত করিতেছে। পূর্ব্বোক্তরূপে বর্ণের বিশুদ্ধতা রক্ষিত হইলে ঐ প্রকার বংশজাত অসামঞ্জস্য ঘটে না, তাহা হইলে সত্ত্বগুণাবলম্বীর কুলে সত্ত্বগুণাবলম্বীর ও তমোগুণাধিকের কুলে তমোগুণাবলম্বীরই জন্ম হয় এবং তাহারা সেই সেই গুণানুযায়ী শাস্ত্রবিহিত কর্ত্তব্যকার্য্য পালন করিয়া ক্রমে ক্রমে উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে। অনেকে বলিতে পারেন যে, যখন বর্ণের বিশুদ্ধতা রক্ষিত হইতেছে না, তখন এক একটি নিকৃষ্ট গুণের বিধবাকে বাছিয়া বিবাহ দেওয়া কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে, সুতরাং সমাজের আধুনিক অবস্থায় কোনরূপ সাধারণ নিয়ম করা উচিত, হয়ত সকল বিধবারই বিবাহ বিহিত হউক, না হয়ত কাহারই হওয়া উচিত নহে। কিন্তু বিধবামাত্রেরই প্রতি এই প্রকার সর্ব্বপ্রযোজ্য সাধারণ নিয়ম হইলে অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট হইতে পারে না, এবং সমাজের বিশৃঙ্খলতা ভিন্ন সুশৃঙ্খলতা হইবারও সম্ভাবনা নাই। সুতরাং বর্ণবিভাগকে দৃঢ় করিয়া যাহাতে পৃথক্ পৃথক্ বর্ণের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নিয়মানুযায়ী কার্য্য হয় তাহাই করা কর্ত্তব্য। যদিও হিন্দুসমাজ মৃতপ্রায় হইয়াছে, কিন্তু এখনও ইহার

জীবন আছে, সুতরাং মৃতসঞ্জীবনী প্রদান করিয়া যাহাতে ইহাকে পুনঃ পুষ্ট ও সবল করিতে পারা যায়, তাহারই উদ্যোগ ও আয়োজন করা কি সর্ব্বোতোভাবে কর্ত্তব্য নহে? এখনও বর্ণবিভাগকে যাহাতে বিশুদ্ধভাবে রাখিতে পারা যায়, তাহারই অনুষ্ঠান করা কি সঙ্গত নয়?

হিন্দুবিধবাগণ! তোমাদের জন্য অনেকেই কাঁদিয়াছে, তোমরা সকলেই এক পতি হারাইয়া পত্যন্তরগ্রহণপূর্ব্বক আজীবন পুরুষের অঙ্কশায়িনী হইতে পাও না, তোমরা আমরণ নিকৃষ্টবৃত্তি চরিতার্থ করিতে পাওনা, এইজন্য কেহ কেহ কাঁদিয়াছে, তোমরা মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত উৎকৃষ্ট বসনভূষণে সুসজ্জিত হইয়া স্বামীসোহাগিনী হইতে পাও না, এই জন্যও কেহ কেহ কাঁদিয়াছে, আবার কেহ কেহ বা, তোমরা সুকোমল শয্যায় শয়ন ও ইচ্ছানুযায়ী বিবিধ খাদ্যদ্রব্যদ্বারা রসনার তৃপ্তি সাধন করিতে পাও না, এই জন্যও কাঁদিয়াছে; এইরূপে নানাজনে নানা প্রকারে বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিয়াছে। আমিও তোমাদের জন্য নীরবে রোদন করিয়াছি, কিন্তু ঐ সব কারণে রোদন করি নাই, তোমরা কেহ কেহ সৎশিক্ষা পাও না এবং কেহ কেহ ব্রহ্মচর্য্যের অধিকারিণী হইয়া ব্রহ্মচর্য্যের প্রকৃত পথ অবলম্বন করিবার সুযোগ না পাইয়া পিতামাতা ও শ্বশুরকুলে কেবল স্বেচ্ছাচারিতা ও বিলাসিতাই দেখিতে পাও এবং তাহারই স্রোতে ভাসিয়া গিয়া দিগ্বিদিগ্ জ্ঞানশূন্য ও কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইয়াছ বলিয়াই কাঁদিয়াছি। তোমাদের সকলেরই এক অবস্থা করিবার জন্য অনেকেরই প্রয়াস—উহারা কেহ কেহ বা তোমাদের সকলকেই পতিযুক্তা করিবার, আবার কেহ কেহ বা পতিশূন্যা রাখিবার জন্য অভিলাষী—এই সকল ব্যক্তির প্রয়াস ও অভিলাষ দেখিয়া কাঁদিয়াছি ও কাঁদিতেছি। তোমাদের সকলেরই এক দশা কিংবা উৎকর্ষসাধনের একই পথ হইতে পারে না; কারণ

তোমাদের একজন যাহা চায় অপরে তাহা চায় না, একজনের যাহাতে তৃপ্তি হয় অপরের তাহাতে হয় না, একজনের যাহাতে উপকার অপরের তাহাতে অনিষ্ট হয়। যে রমণী সত্ত্বগুণাবলম্বিনী পূর্ব্বোক্তরূপ নশ্বর ও অকিঞ্চিৎকর সুখের অভাবে তাঁহার কোনই কষ্ট হয় না; অনন্যচেতা হইয়া ইষ্টদেবজ্ঞানে যিনি একপুরুষকে পতিভাবে পূজা করিয়াছেন, তিনি অযথাপ্রবৃত্তিচরিতার্থতার জন্য অন্য পুরুষকে তাঁহার স্থানে বসাইয়া ভজনা করিতে অত্যন্ত ঘৃণাবোধ করেন; যাঁহার মানসিক সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট হইয়াছে, তিনি অঙ্গাভরণ দ্বারা শরীরের শোভাবর্দ্ধনকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন, এবং যিনি কেবল শরীররক্ষার্থই আহারাদির প্রয়োজন বিবেচনা করেন, তিনি তদুদ্দেশ্যব্যতীত অন্য কোন কারণে আহারাদি করা অপ্রয়োজনীয় ও অনিষ্টকর বিবেচনা করেন; ইহাই আমার ধারণা বলিয়া অন্যান্য সকলের ন্যায় কাঁদি নাই। কেহ কেহ ঐ প্রকার সত্ত্বগুণাবলম্বিনী বিধবা রমণী দেখে নাই, অথবা দেখিলেও নিজ নীচ-প্রকৃতিবশতঃ মোহমুগ্ধ হইয়া তাহাকে চিনিতে পারে নাই, এই জন্য হিন্দুবিধবামাত্রেরই প্রতি সমভাবে ও গুণনির্ব্বিশেষে তাহারা যে অযথা কটূক্তি প্রয়োগ করিয়াছে, সেই জন্যও কাঁদিয়াছি।

সত্ত্বগুণাবলম্বিনী দেবীসদৃশী হিন্দুবিধবাগণ যে প্রকার কঠোর ব্রহ্ম-চর্য্য অবলম্বন করেন, তাহার তুলনায় স্বামীর সহিত একচিতাশায়িনী সতীর অগ্নিপরীক্ষা কোন্ তুচ্ছ। তাঁহাদের জ্বলন্ত পাতিব্রত্যতেজের সমীপস্থ হইলে নীচপ্রকৃতি মনুষ্যের আসুরিকভাবও বিলুপ্ত হইয়া যায়। এখনও তাঁহারা জগতের রমণীগণের আদর্শস্বরূপা হইয়া শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছেন। যে হিন্দুগৃহে ঐ প্রকার দেবীস্বরূপা হিন্দু-বিধবারমণী বিরাজমানা, সেই গৃহই মঙ্গলময় হইয়াছে, তিনি যে কুলে সঞ্জাতা ও পরিণীতা, সেই উভয় কুলই পবিত্র হইয়াছে। হায়! আজ

হিন্দুনামধারী অনেকেই বিকৃতবুদ্ধিবশতঃ গৃহের প্রকৃত অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে চিনিতে না পারিয়া তাঁহাদের অনাদর করিয়া শ্রীভ্রষ্ট হইতেছে (১)।

বাণপ্রস্থ।

যৌবনকাল অতিক্রম করিয়া যখন প্রৌঢ়াবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়, যখন সংযমশিক্ষায় অভিজ্ঞ এবং ইহার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায়, যখন রজোগুণের ন্যূনতা হইতে থাকে, এবং যখন লোলচর্ম্ম ও পলিত কেশ হইতে আরম্ভ হয় ও পুত্রেরও পুত্র জন্মে এবং গৃহস্থাশ্রমে ভোগ্যবস্তু সকলে ভোগস্পৃহা ও কামনার প্রখরতা হ্রাস হইয়া বৈরাগ্যের কিয়ৎপরিমাণে উদয় হয়, তখন সস্ত্রীক অথবা একাকী বনে বা কোন নির্জ্জন স্থানে গমন করিয়া তথায় বাস ও অযত্নলব্ধ ভোজ্যদ্রব্য আহার করিয়া তপশ্চরণ করতঃ ব্রহ্মচিন্তায় মনকে মগ্ন করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হয় (২)। ইহাকে বাণপ্রস্থাশ্রম কহে, ইহা জীবনের তৃতীয় ভাগে, অর্থাৎ পঞ্চাশৎ বৎসরের পরে অবলম্বনীয়। যাহার মন ইহার

---

(১) यत्र नार्य्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ।
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्व्वास्तत्राफलाः क्रियाः ॥
शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम् ।
न शोचन्ति तु यत्रैता वर्द्धते तद्धि सर्व्वदा ॥

मनु, ३।५६,५७।

যে পরিবারে নারীগণ সম্যক্ সমাদৃতা হন, দেবতারা তথায় প্রসন্ন থাকেন; আর যে বংশে তাঁহারা সম্মানিতা হন না, তথায় ক্রিয়াকর্ম্ম সমস্তই নিস্ফল।

যে পরিবারমধ্যে স্ত্রীগণ সম্মান ও আদরপ্রদর্শনের অভাবে সদাই দুঃখিত থাকেন, সেই কুল শীঘ্রই বিনষ্ট হয়; আর যে বংশে তাঁহাদের কোন দুঃখ নাই, তাহা সর্ব্বদাই শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

(২) মনু, ৬।:—৩২।

উপযোগী অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই, প্রৌঢ়াবস্থায় যাহার যৌবনের প্রবল রজোগুণ প্রশমিত না হইয়া তমোগুণকর্ত্তৃক ইহা পরাভূত হয়, সে ঐ আশ্রমের অধিকারী নহে, তাহার গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। এই জন্য এই আশ্রম কেবল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরই অবলম্বনীয়; বৈশ্য ও শূদ্রের সত্ত্বগুণ হইতে তমোগুণ প্রবল, সুতরাং তাহারা সংযমী হইয়া থাকিতে সমর্থ হয় না এবং তাহাদের বৈরাগ্য জন্মে না বলিয়া সংসারের মায়ামমতা কাটাইয়া ইহা কিয়ৎপরিমাণেও ত্যাগ করিতে সক্ষম হয় না, এই জন্য তাহারা মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া সংসারধর্ম্ম নির্ব্বাহ এবং সংযম সাধনা করে, বাণপ্রস্থাশ্রমের ইহারা অধিকারী নহে।

সন্ন্যাস।

প্রৌঢ়াবস্থা অতিক্রম করিলে সাধারণতঃ সকলের তমোগুণের অপেক্ষাকৃত আধিক্য হইতে থাকে, কিন্তু যাঁহাদের স্বভাবতঃ সত্ত্বগুণ অধিক, যাঁহারা উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণবর্ণ, তাঁহাদের তমোগুণ অধিক হইতে পারে না। তাঁহারা বাণপ্রস্থাশ্রমে জীবনের তৃতীয় ভাগ যাপন করিয়া চতুর্থভাগে পঁচাত্তর বৎসর বয়সের পরে, বার্দ্ধক্যাবস্থায় সর্ব্বাসক্তিত্যাগ-পূর্ব্বক সংসারচিন্তা দূর করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বনকরতঃ নির্জ্জনে অবস্থান করিয়া সর্ব্বদাই ব্রহ্মচিন্তায় রত থাকেন। যাঁহাদের সত্ত্বগুণ অধিক তাঁহারাই কেবল এই আশ্রমের অধিকারী, অন্য তিন বর্ণ নহে।

দেহাভিমানী ব্যক্তি কখনই সমস্ত কর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না, একবারে ত্যাগী হইতে পারে না। যিনি কর্ম্মের ফলত্যাগী, তিনিই প্রকৃত ত্যাগী, তিনিই যথার্থ সর্ম্ম্যাসী (১)।

---

(১) न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः।
यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते॥

गीता, १८।११।

অন্তঃশুদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত যজ্ঞদানতপঃপ্রভৃতি কাম্যকর্ম্ম করিতেই হয় এবং ঐ প্রকার কর্ম্মের ফলাভিসন্ধিত্যাগও ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করিতে হয় (১)। কাম্যকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে করিতে যতদিনে অন্তঃকরণ শুদ্ধ না হয় ততদিন কর্ম্মের ফলকামনা আপনা হইতেই মনে উদয় হয়, তাহা নিবারণ করা বড়ই কঠিন (২)। যাঁহার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া সত্ত্বগুণের বিশেষ বৃদ্ধি হইয়াছে, তাঁহাকেও নিত্যকর্ম্ম করিতে হয়, কিন্তু ঐ সকলের জন্য তাঁহার মনে কামনার উদয় হয় না, তখন আপনা হইতেই তিনি কাম্যকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া থাকেন। মোহবশতঃ নিত্যকর্ম্ম ত্যাগ করাকে তামস ত্যাগ কহে (৩)। কর্ম্মানুষ্ঠান কষ্টসাধ্য মনে করিয়া দৈহিক ক্লেশের ভয়ে যে কর্ম্মত্যাগ তাহা রাজস ত্যাগ; এই ত্যাগের দ্বারা প্রকৃত ত্যাগের ফল লাভ হয় না (৪)। কর্ত্তব্যবোধে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া কর্ম্মের ফলকামনা ও উহাতে আসক্তি ত্যাগ করিয়া যে নিত্যকর্ম্ম করা যায়, সেই ত্যাগ সাত্ত্বিক ত্যাগ বলিয়া কথিত হয় (৫)। যিনি ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত হইয়া সাত্ত্বিকত্যাগপরায়ণ হন, সত্ত্বগুণ তাঁহাকে আশ্রয় করে, তিনি তত্ত্বজ্ঞানবিশিষ্ট হইয়া দুঃখজনক কর্ম্মে দ্বেষ ও সুখকর কর্ম্মে প্রীতি বোধ করেন না; সুখদুঃখ উভয়ই তাঁহার পক্ষে সমান (৬)। শাস্ত্রকারগণ

---

(১) যজ্ঞদানতপঃ কর্ম ন ত্যাজ্যমিত্যাদয়ঃ।

গীতা, ১৮।৫,৬।

(২) মনু, ২।২-৫।

(৩) নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ ইত্যাদি। গীতা, ১৮।৭।

(৪) দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম ইত্যাদি। গীতা ১৮।৮।

(৫) কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম ইত্যাদি। গীতা ১৮।৯।

(৬) ন দ্বেষ্ট্য কুশলমিত্যাদি। গীতা, ১৮।১০।

সকলকে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া কর্ম্মত্যাগ করিয়া অরণ্যে বাস করিতে অথবা কেবলমাত্র ভিক্ষাবৃত্তির অনুষ্ঠান করিতে বলেন না। যাহারা উপযোগী না হইয়া ঐ প্রকার করে তাহারা কপট সন্ন্যাসী। সুরম্য অট্টালিকায় সুকোমল শয্যোপরি শয়নে এবং নিবিড় অরণ্যে বৃক্ষতলে কঙ্করবহুল ভূমিশয্যায় বিশ্রামলাভে যাঁহার মন সমভাবে থাকে, সুমিষ্ট দ্রব্য আহার বা অন্য কোন প্রকার সংসারের ভোগ্য বিষয় উপভোগে এবং জীবনধারণোপযোগী যদৃচ্ছালব্ধ বস্তু লাভে যাহার মনের ভাবের পরিবর্ত্তন হয় না, অর্থাৎ যিনি একটিতে অনুরাগ বা সুখ ও অপরটিতে দ্বেষ বা দুঃখ অনুভব করেন না, তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী। নতুবা যে ব্যক্তি কষ্টবোধে বা ক্ষণিক বৈরাগ্যের উদয় হওয়ায়, অথবা অন্য কোন কারণে গৃহত্যাগ করে, সে সন্ন্যাসী নহে; সে হয়ত এক সংসার ছাড়িয়া অরণ্যে বা অন্য কোন স্থানে গিয়া আবার অন্য সংসার পাতিয়াছে, অথবা মনে মনে সংসারসুখের চিত্র অঙ্কিত করিয়া সেই সুখ অনুভব করিতেছে, কিংবা হয়ত ভাবিতেছে যে "স্ত্রীপুত্রদিগকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, তাহাদের কতই কষ্ট হইতেছে, আহা! হয়ত তাহারা আমার অভাবে দুঃসহ যন্ত্রণাভোগ করিয়া কাতরস্বরে রোদন করিতেছে"; ব্রহ্মচিন্তার পরিবর্ত্তে নির্জ্জনে বসিয়া সে এই প্রকার অসংখ্য দুশ্চিন্তার জ্বালায় উত্যক্ত হইতেছে।

পবিত্র ও পূজ্য কি।

যাহাতে অধিক সত্ত্বগুণ আছে ও যাহা দর্শনস্পর্শনাদিতে ঐ গুণ বৃদ্ধি করে, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা ও সকলের পক্ষেই পবিত্র, আর্য্যগণ তাহাতেই ঐ গুণের পূজা করিয়া থাকেন; সেই জন্যই তাঁহারা

প্রস্তরাদি স্থাবরের মধ্যে শিলাবিশেষে, অপের মধ্যে গঙ্গাজলে (১) বৃক্ষের মধ্যে অশ্বত্থে, গুল্মের মধ্যে তুলসীতে, পশুর মধ্যে গোজাতিতে এবং মনুষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণে, সত্ত্বগুণেরই পূজা করেন। সত্ত্বগুণাধিকের পক্ষে রজঃ বা তমোগুণাধিক বস্তু বা ব্যক্তি পবিত্র নহে। যাহাদের রজঃ বা তমোগুণ অধিক তাহারা ঐ সকলে এবং তদপেক্ষা অল্প সত্ত্বগুণান্বিত অথবা রজোগুণাধিক সত্ত্বগুণবিশিষ্ট বস্তু ও ব্যক্তিতে সত্ত্ব ও রজোগুণের পূজা করিয়া থাকে এবং তাহাদের পক্ষে ঐ সমস্তই পবিত্র।

যাহাতে উৎকৃষ্ট গুণের পূজা করা যায়, তাহা যেমন পবিত্র হওয়া প্রয়োজন, তেমনই পূজার উপকরণ, অর্থাৎ যাহা দ্বারা পূজা করা যায়, তাহাও পবিত্র হওয়া কর্ত্তব্য। যাহা দর্শন, স্পর্শন ও আঘ্রাণে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি করে, এমন পত্র, পুষ্প, বা তৃণ দ্বারা, যাহা পান বা ভোজনে ঐ গুণ বৃদ্ধি করে, এমন দ্রব্য দ্বারা, যাহা শ্রবণ করিলে ঐ গুণের আধিক্য

---

(১) গঙ্গাজল সকল জল অপেক্ষা পরিষ্কার কিন্তু কি প্রকারে ইহাতে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি করে এবং কি জন্যই বা ইহা পবিত্র, তাহা আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্‌গণ কিছুই বলেন না, তবে ইহাতে কতকটা তমোগুণ নাশ করে এবং ইহাকে অন্ততঃ বর্দ্ধিত হইতে দেয় না, তাহা প্রকারান্তরে স্বীকার করেন, কারণ তাঁহারা বলেন যে, ইহাতে কীটাণু জন্মিতেও পারে না এবং নষ্টও হয়, সুতরাং কীটাণু জনিত ব্যাধি ইহাতে উৎপন্ন হইতে দেয় না। অনেকে দেখিয়া থাকিবেন যে, অন্য কোন জল কিছুদিন থাকিলেই তাহাতে কৃমি জন্মে, কিন্তু গঙ্গাজল বহুকাল থাকিলেও কৃমি উৎপন্ন হইতে পারে না। একজন পাশ্চাত্যবিজ্ঞানবিৎ লিখিয়াছেন যে:—"Since I originally wrote this pamphlet I have discovered that the water of the Ganges and the Jumna is hostile to the growth of the Cholera microbe, not only owing to the absence of food materials, but also owing to the actual presence of an antiseptic that has the power of destroying this microbe. At present I can make no suggestion as to the origin of this mysterious antiseptic.

Preface to the 5th edition of Mr. E. H. Hankin's Pamphlet on "The Cause and Prevention of Cholera."

আর অন্য আকর্ষণের দ্বারা বিচলিত না হইয়া, আমার সেই আকাঙ্ক্ষিত রজ্জুটি আমি দৃঢ়রূপে ধরিতে সক্ষম হই!

কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

কোন্ কার্য্য কর্ত্তব্য এবং কোন্‌টিই বা অকর্ত্তব্য তাহা বুঝিতে পারা দুষ্কর, এমন কি বুদ্ধিমান্ মহাত্মাগণও কখন কখন ইহা স্থির করিতে না পারিয়া ভ্রমে পতিত হইয়া থাকেন (১)। যখন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি-গণ এইরূপ ভ্রমে পতিত হন, তখন অপর সাধারণ ব্যক্তির ত কথাই নাই। তাহারা যে নিজ প্রকৃতিবশতঃ এবং কামক্রোধাদি রিপুগণ কর্ত্তৃক চালিত হইয়া সহজেই ভ্রমে পতিত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, তাঁহাদের চিন্তাশক্তি আছে, তাঁহারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে পারেন, তাঁহারা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, সুতরাং স্বয়ং বিবেচনা করিয়া যে সকল বিষয় নিজ কর্ত্তব্য স্থির করিবেন, সেই সমস্তই তাঁহাদের কর্ত্তব্য কার্য্য। কিন্তু কাহাকেও ত স্বাধীন দেখি না, সুতরাং স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবে কে এবং তাহার ক্ষমতাই বা কোথায়? যাঁহারা জীবন্মুক্ত তাঁহারা ব্যতীত সকলেই যে নিজ নিজ ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির দাস, অধিকাংশই যে স্বার্থে অন্ধ, ইন্দ্রিয়গণের আজ্ঞাবাহী ভৃত্য এবং কামক্রোধাদি রিপুগণের ক্রীড়া-পুত্তলিকা, সুতরাং এ সকলের স্বাধীনতা কোথায়?

যে কার্য্যে যাহার উৎকর্ষ সাধিত হয়, তাহাই তাহার কর্ত্তব্য

---

(১) কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।

গীতা, ৪।১৬।

কার্য্য। যে ব্যক্তি যে প্রকার গুণাবলম্বী সে সেই গুণের কার্য্যকে কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া মনে করে, কিন্তু কেবলমাত্র সেই কর্ম্ম আচরণে তাহার উৎকর্ষ সাধিত হয় না, সুতরাং উহা তাহার কর্ত্তব্য কার্য্য নহে। যাহার যে রিপু প্রবল সে তাহাদ্বারা উত্তেজিত হইয়া যে কার্য্য করে, তাহাকেই সে কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া মনে করিয়া থাকে। যে কামুক সে যে কোন প্রকারে হউক ইন্দ্রিয়চরিতার্থ করাকে, যে ক্রোধী সে যে কোন প্রকারে হউক প্রতিহিংসাদি কার্য্য সাধন করাকে, যে লোভী সে যে কোন প্রকারে হউক লোভের বস্তু প্রাপ্তিকে, কর্ত্তব্য কার্য্য মনে করে। যে তমোগুণাবলম্বী তাহার ঐ তিনটি রিপু রজোগুণ-বশতঃ প্রথমতঃ উদ্রিক্ত হইয়া তমোগুণে তাহার হিতাহিত জ্ঞান লোপ করে, তখনই সে দুষ্কার্য্য করিয়া থাকে, এবং ঐ দুষ্কার্য্যকেই সে তখন কর্ত্তব্য কার্য্য মনে করিয়া থাকে। যেমন লোভ অত্যুৎকট হইলে তমোগুণের প্রবলতাবশতঃ মনুষ্য পরদ্রব্য অপহরণ করিয়া থাকে। সুতরাং যে তমোগুণাধিক সে স্বভাববশতঃ চুরি করিয়া থাকে এবং ইহাকেই সে কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করে। ঐ প্রকার যে রজোগুণাধিক সে রজোগুণের কার্য্যকেই কর্ত্তব্য কার্য্য মনে করে। কিন্তু ঐ সকল ব্যক্তির ঐ সমস্ত কর্ত্তব্য কার্য্য নহে, কারণ কেবলমাত্র ঐ প্রকার কার্য্য করিলে তাহার উৎকর্ষ লাভ করাত দূরের কথা বরঞ্চ অপকর্ষই সাধিত হইয়া থাকে। অতএব নিজের কর্ত্তব্যজ্ঞানের উপর নির্ভর করিলে নিজ গুণানুযায়ী কার্য্যকে কর্ত্তব্যকার্য্য মনে করিয়া কেবলমাত্র তাহারই আচরণের দ্বারা ঐ প্রকার দুর্দ্দশা ঘটিয়া থাকে। এমন কি যাঁহার সত্ত্বগুণ কিয়ৎ পরিমাণে প্রবল তিনিও গুণান্তরের ক্ষণিক প্রাধান্যবশতঃ ভ্রমে পতিত হইতে পারেন এবং উৎকর্ষলাভের জন্য যে কার্য্য তাঁহার কর্ত্তব্য সেই সকল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে স্বয়ং আলোচনা করিয়া নির্দ্ধারণপূর্ব্বক অনুষ্ঠান

করাও তাঁহার পক্ষে সকল সময়ে সহজ ও সুবিধাজনক হয় না। এই সকল কারণবশতঃ কর্ত্তব্য কার্য্য স্থিরীকরণে সকল সময়ে কেবলমাত্র নিজ বিবেচনার উপর নির্ভর করিতে পারা যায় না; অতএব যাঁহারা প্রকৃষ্টরূপে সত্ত্বগুণাধিক এমত পূর্ব্ববর্ত্তী ও তাৎকালিক মহাত্মাগণ যে প্রকার গুণাবলম্বী ব্যক্তির পক্ষে যে সকল কার্য্য কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন, সেই সমস্ত আচরণ করিয়া এবং যে সকল অকর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তৎসমুদয় হইতে বিরত হইয়া, নিজ নিজ জীবনের গন্তব্য পথ অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। ঐ সমস্ত বিধি ও নিষেধবাক্যই শাস্ত্র।

যে যে পথেই যাক্ না কেন, তাহার শাস্ত্রবাক্যের উপর একান্ত নির্ভরতার প্রয়োজন, নতুবা পদস্খলিত হইয়া পথভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা। শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া ইচ্ছামত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে অন্তঃকরণেরও শুদ্ধি হয় না। আর্য্যমহাত্মাগণ পৃথক্ পৃথক্ অধিকারীর পক্ষে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র যে সকল বিধি ও নিষেধ বাক্য বলিয়া গিয়াছেন, সেই সমস্তই আর্য্যশাস্ত্র। নিকৃষ্টতম পশুভাবাপন্ন ব্যক্তি হইতে উৎকৃষ্টতম দেবভাবাপন্ন মনুষ্য পর্য্যন্ত সকলের গন্তব্য পথই ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে, সকলের উপযোগী কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য কার্য্য ইহাতে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যিনি যে পথের পথিক, তিনি সেই পথের প্রদর্শক আর্য্যশাস্ত্রের অংশকে অবলম্বন করিয়া তাহারই উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া চলিবেন, উহাতে যে সকল কার্য্য কর্ত্তব্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, সেই সমস্ত গুরুর উপদেশানুযায়ী বিধিমত আচরণ করিয়া ও অকর্ত্তব্য কার্য্য হইতে বিরত হইয়া অবিচলিতভাবে অগ্রসর হইবেন (১)।

---

(১) यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य इत्यादयः। गीता, १६।२३,२४।

শাস্ত্র এবং শাসন।

যাহাদ্বারা শাসিত হইয়া প্রত্যেক মনুষ্য নিজ জীবনের গন্তব্য পথে উৎকর্ষের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে এবং তাহা হইতে ভ্রষ্ট না হইয়া স্বকীয় উৎকর্ষের বিঘ্ন ঘটাইতে ও অপরের শান্তির ব্যাঘাত জন্মাইতে না পারে, তাহাই প্রকৃত শাস্ত্র। শাস্ত্রের বাক্যানুযায়ী নিজ গন্তব্য পথে অবিচলিতভাবে না চলিলে যে ফল ভোগ করিতে হয়, তাহাকেই শাস্তি বলে। শাস্ত্রবিধিলঙ্ঘনকার্য্যকে অর্থাৎ শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য কার্য্যের অবহেলন ও অকর্ত্তব্য কার্য্যের আচরণকে পাতক বা প্রত্যবায় বলে এবং যে ঐ প্রকার করে তাহাকে পাতকী কহে।

ভিন্ন ভিন্ন দেশে দণ্ডবিধিপ্রভৃতি যে সমস্ত আইন প্রচলিত আছে, তাহাও এক প্রকার শাস্ত্র। মনুষ্য কোন প্রকার কার্য্য করিয়া যাহাতে অপরের অশান্তির কারণ না হইতে পারে, যাহাতে সমাজের কণ্টকস্বরূপ না হয়, তাহাই আধুনিক দণ্ডবিধির প্রধান উদ্দেশ্য। বিধিলঙ্ঘনকার্য্যের জন্য যে ব্যক্তি অপরাধী, তাহাকে কেবল ইহ জীবনে যেঁ সকল শারীরিক বা আর্থিক দণ্ডভোগ করিতে হয়, তাহারই বিধান ইহাতে আছে। ইহ জীবনের সীমার বাহিরে ইহা যায় নাই এবং বিধি-অনুযায়ী চলিলে কোন প্রকার পুরস্কারের প্রলোভনও ইহাতে নাই; ইহার নিয়মসমূহও সকলের পক্ষেই সমানরূপে প্রযোজ্য, অন্ততঃ ইহাই আধুনিক বিধানকর্ত্তাগণ প্রকাশ করিয়া থাকেন। উক্তরূপ পুরস্কারের প্রলোভন এবং পর-জীবনে দণ্ডের ভয় না থাকিলে কেবলমাত্র ইহজীবনে দণ্ডের ভয় তত কার্য্যকর হয় না। চোরকে চুরি করিও না বলিয়া কেবলমাত্র উপদেশ দিলে ত কোনই ফল হয় না, তদতিরিক্ত তাহাকে কারাগারবাস-প্রভৃতি দণ্ডের ভয় দেখাইলে অথবা ঐরূপ কোন দণ্ড প্রদান করিলেও

যথোপযুক্ত ফল হয় না। উহার সঙ্গে সঙ্গে যদি ঐ প্রকার কার্য্য অকরণের অথবা সৎকার্য্যকরণের জন্ত ইহজীবনে বা পরজীবনে ঈশ্বরকর্ত্তৃক পুরস্কৃত এবং অকর্ত্তব্য কার্য্য আচরণবশতঃ কিংবা কর্ত্তব্য কার্য্য অকরণবশতঃ যদি তাঁহাকর্ত্তৃক ইহ বা পর জীবনে দণ্ডিত হইবার বিষয়ে তাহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাইতে পারা যায়, তাহা হইলে বিশেষ কার্য্যকর হয়। এই জন্ত দণ্ডবিধিব্যতীত সকল দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রেই পরজীবনে ঐ প্রকার পুরস্কার ও দণ্ডের বিষয় উল্লেখ আছে; কিন্তু আর্য্যশাস্ত্র ইহার অতিরিক্ত আরও বিধান করিয়াছেন। ইহাতে ইহ জীবনে দণ্ডের ব্যবস্থা আছে এবং পরজীবনেও পুরস্কারের প্রলোভন ও দণ্ডের ভয়প্রদর্শনও আছে, আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক মনুষ্যের প্রত্যেক কার্য্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, তাহার প্রকৃতির যাহাতে উৎকর্ষ সাধিত হয়, সে যাহাতে ক্রমে ক্রমে উৎকৃষ্টতর গুণ লাভ করিতে পারে, অর্থাৎ তমোগুণাধিক যাহাতে রজোগুণাবলম্বী এবং রজোগুণাধিক যাহাতে সত্ত্বগুণাবলম্বী হইতে পারে, আর্য্যশাস্ত্রকারগণ তাহারও বিধান করিয়া গিয়াছেন। সেই সকল আচরণ করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে গুণের পরিবর্ত্তন হইতে হইতে যখন তমোগুণ হ্রাস হইয়া আইসে, তখন চৌর্য্য ব্যভিচার প্রভৃতি নীচ প্রবৃত্তিসকল মন্দীভূত হইতে থাকে। ঐরূপে তমোগুণের হ্রাস হইয়া স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইলেই চোরের আর পরদ্রব্যাপহরণ করিতে প্রবৃত্তি হয় না, নতুবা যত দিন তাহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন না হয়, তত দিন সে, যে প্রকার সঙ্গতিশালী বা সঙ্গতিহীন অবস্থাপন্নই হউক না কেন, চৌর্য্যবশতঃ তাহাকে যতই দণ্ডভোগ করিতে হউক না কেন, কোন না কোন প্রকারে চুরি করিবেই। হয় ত সে জানিতেছে, বুঝিতেছে, যে ঐরূপ কার্য্য করা কর্ত্তব্য নহে এবং সে যে দ্রব্য অপহরণ করে, তাহার সেইরূপ দ্রব্যেরও কোন অভাব নাই,

তথাপি সে চুরি না করিয়া থাকিতে পারে না। যেমন চৌর্য্যসম্বন্ধে বলা হইল, অন্যান্য অকর্ত্তব্য কার্য্যসম্বন্ধেও ঐরূপ ঘটিয়া থাকে।

কোন প্রকার অকর্ত্তব্য কার্য্য অলক্ষিতভাবে করিতে পারিলে, অথবা অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিলে রাজদণ্ড হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে, ইহাও ভাবিয়া অপরাধী ব্যক্তি ঐ কার্য্য হইতে বিরত না হইতে পারে, কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদ্রষ্টা ও সর্ব্বত্র বিদ্যমান ঈশ্বরের নিকট কোন কার্য্য গোপন করিবার উপায় নাই, এবং প্রতিমুহূর্ত্তে সে যে কার্য্য করিতেছে, ইহজীবনে বা পরজীবনে নিশ্চয়ই তাহার ফলভোগ করিতে হইবে, ইহাই যদি তাহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, তাহা হইলে সে সহজেই কুকার্য্য হইতে বিরত হইয়া থাকে।

আর্য্যশাস্ত্র সকলের পক্ষে সমান নিয়ম করেন নাই, ইহাই ঐ শাস্ত্রের একটি বিশেষত্ব। ইহজীবনে বা পরজীবনে সকলের একই রূপ দণ্ডের অথবা সকল প্রকার কর্ত্তব্য কার্য্যের জন্য সকলের পক্ষে একই রূপ পুরস্কারের কথা আর্য্যশাস্ত্রকারগণ বলেন নাই। অন্যান্য দেশের কোন কোন প্রাচীন শাস্ত্রকার সকলের পক্ষেই সকল প্রকার সৎ-কার্য্যের জন্যই পরজীবনে মৃত্যুর অনির্দ্দিষ্ট কাল পরে একই প্রকার অনন্ত সুখের এবং অসৎ কার্য্যের জন্য চিরদুঃখের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু আর্য্যশাস্ত্রকারগণ তদ্রূপ বলেন নাই; পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কার্য্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন রূপ ফলভোগ করিয়া থাকে, তাঁহারা তাহাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহ জীবনেও তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন রূপ গুণাবলম্বীর একই প্রকার অপরাধের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপ দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন। মনুষ্যমাত্র একই প্রকার দুষ্কার্য্যের জন্য সমানরূপ দণ্ডনীয় হওয়া তাহারা উচিত বিবেচনা করেন নাই। দণ্ডপ্রদানের একটি প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, তাহাদ্বারা সেই ব্যক্তির যেন উৎকর্ষ লাভ হয়, অর্থাৎ তাহার যেন ঐরূপ কার্য্য করিতে প্রবৃত্তি না হয়

সমাজের সকল ব্যক্তিই ঐ প্রকার দুষ্কার্য্য হইতে বিরত হইলে, সেই সমাজেরও উৎকর্ষ সাধিত হয় এবং উহা শান্তিময় হয়। যে সত্ত্ব-গুণাবলম্বী তাহার ক্ষণিক তমোগুণের ঈষৎ প্রবলতাবশতঃ যদি সামান্য-মাত্র পদস্খলিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে যে দণ্ড প্রদান করিলে সে ভবিষ্যতে সতর্ক হইয়া ঐ প্রকারের কার্য্য হইতে বিরত হয়, সেইরূপ দণ্ডে একজন তমোগুণাবলম্বী ঐ প্রকারে বিরত হইতে পারে না। এই জন্যই আর্য্যশাস্ত্রকারগণ পৃথক্ পৃথক্ বর্ণের পক্ষে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপ শাস্তির বিধান করিয়া গিয়াছেন। পৃথক্ পৃথক্ দেশের আধুনিক বিধানকর্ত্তাগণ সকলের পক্ষে সমান বিধান করা কর্ত্তব্য, ইহা প্রকাশ করিলেও, বিধানকালে অনেক সময়ে তদনুযায়ী কার্য্য করিতে পারেন নাই। ঐ সকল স্থানের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যক্তির পক্ষে প্রযোজ্য বিধানসমূহে যে সকল বিভিন্নতা লক্ষিত হয়, তাহার শৃঙ্খলাবদ্ধ কোন নিয়ম নাই, হয়ত ঐ সমস্ত অনির্দ্দিষ্ট ও অকিঞ্চিৎকর ভিত্তির উপরে স্থাপিত বলিয়া অনেক সময়ে কুফলপ্রদ হইয়া থাকে। ঐ সকলে অধিকাংশ স্থলেই বিধানকর্ত্তার স্বার্থপরতাবশতঃ অসামঞ্জস্য ঘটিয়া থাকে। উহাদের মধ্যে হয়ত ধনবান্ বা ক্ষমতাশালী অথবা বিধানকর্ত্তার সমশ্রেণীস্থ ব্যক্তির পক্ষে যে বিধান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, দরিদ্র বা শক্তিহীন অথবা বিধানকর্ত্তার অসমশ্রেণীস্থ ব্যক্তির পক্ষে সে প্রকার নির্দ্ধারিত হয় নাই। আর্য্যশাস্ত্রে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শ্রেণীর ব্যক্তির প্রতি প্রয়োজ্য বিধানসমূহের যে পার্থক্য, তাহা বিধানকর্ত্তার যথেচ্ছা অথবা স্বার্থপরতাবশতঃ ঘটে নাই, কিংবা অর্থ বা ব্যক্তিগত শক্তিবশতঃ ঐ সকলের তারতম্য হয় নাই, ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন গুণানুযায়ী বিধানের বিভিন্নতা বিহিত হইয়াছে; সেই জন্যই ব্রাহ্মণাদি পৃথক্ পৃথক্ বর্ণের পক্ষে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপ দণ্ড ও অন্যান্য নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

বিধানকর্ত্তা।

অন্যান্য দেশের পুরাতন বা আধুনিক সমাজের ন্যায় আর্য্যসমাজের বিধানকর্ত্তাগণ পূর্ণরজোগুণবিশিষ্ট অথবা তমোগুণাধিক ব্যক্তি ছিলেন না। ঐ কার্য্যে রাজার অথবা অন্য কোন নিকৃষ্ট গুণাবলম্বী ব্যক্তির কোন কর্ত্তৃত্ব থাকিত না। অন্যান্য কোন কোন সমাজে রাজা বা রাজপ্রতিনিধিই বিধানকর্ত্তা সুতরাং ঐ সকলের কোনটির ভাগ্যবশতঃ যদি উহাতে কখন কোন রাজা বা রাজপ্রতিনিধি সত্বগুণাবলম্বী হন, তাহা হইলেই উহার শ্রেয়ঃ হইয়া থাকে, নতুবা বিধানকর্ত্তার স্বার্থপরতা-বশতঃ সমাজবিপ্লবপ্রভৃতি নানা প্রকার বিশৃঙ্খলতা ঘটিয়া থাকে। এই জন্যই পুরাকালে বা অধুনা পৃথিবীর নানা দেশের নানা সমাজে প্রজাগণ অসন্তুষ্ট হইয়া কত যে গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে ও করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। যখন প্রজাগণের অসন্তোষের মাত্রা পূর্ণ হয় তখন সেই সমাজের বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। কোন কোন সমাজে একজনের পরিবর্ত্তে অনেকে মিলিত হইয়া বিধান করিবার প্রথা আছে। ইহাতে যে নিয়মে বিধানকর্ত্তাগণ নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে, তাহাতে কোন দরিদ্র ব্যক্তি উৎকৃষ্ট সত্বগুণাবলম্বী হইলেও সে নির্ব্বাচিত হইতে পারে না। যে প্রথায় নির্ব্বাচিত হয়, তাহাতে তাহারা নানাপ্রকার গুণাবলম্বী, অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের ব্যক্তি হইয়া থাকে। রজঃ বা তমোগুণাধিক ব্যক্তিগণ স্বার্থপর হইয়া থাকে, সুতরাং বিধানকর্ত্তাগণের মধ্যে উহাদের সংখ্যা অধিক হইলেই বিভ্রাট ঘটে; কিন্তু এই প্রথাতে এক জনের স্বার্থপরতার পরিবর্ত্তে বহু ব্যক্তির স্বার্থপরতা জড়িত হয় এবং পরস্পর পরস্পরের স্বার্থপরতায় ব্যাঘাত জন্মায় বলিয়া, একজন রাজসিক বা তামসিক ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারিতা হইতে ইহা কিয়দংশে উৎকৃষ্ট। নির্ব্বাচিত ব্যক্তিগণের মধ্যে যাহাদের বাগ্মিতা, চতুরতা ও কোন

প্রকারে অপরকে মুগ্ধ করিবার ক্ষমতা থাকে, তাহাদেরই ইচ্ছানুযায়ী অনেকটা কার্য্য হইয়া থাকে। বিধানকর্ত্তাতে স্বার্থশূন্যতা না থাকিলে সেই সমাজের কখন মঙ্গল হইতে পারে না, ইহা সদাই অশান্তিময় হইয়া থাকে।

আর্য্যসমাজের বিধানকর্ত্তাগণ সত্ত্বগুণাবলম্বী ব্যতীত অন্য কোন গুণাবলম্বী হইতেন না, সুতরাং তাঁহাদের স্বার্থপরতা থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না। যাঁহারা নির্জ্জনে বাস করিয়া অযত্নলব্ধ বস্তুদ্বারা জীবন ধারণ করিতেন, কেবলমাত্র অপরের মঙ্গলচিন্তা করিয়া সমাজের উপকারসাধনের চেষ্টা ব্যতীত যাঁহাদের অন্য কোন প্রয়োজন ছিল না, যাঁহারা ইচ্ছাদ্বেষবিরহিত হইয়া সর্ব্বজীবকে সমান জ্ঞান করিতেন, তাঁহাদের স্বার্থপরতা কি প্রকারে থাকিতে পারে (১)? আর্য্যগণের কতকগুলি সমাজের অথবা একটিমাত্র সমাজের সংসারবিরত উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণগণ অরণ্যে বা অন্য কোন নির্জ্জন স্থানে একত্র সম্মিলিত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ সমাজের অবস্থা এবং স্থানের বিভিন্নতার প্রতি দৃষ্টি এবং সকলের ক্রমোৎকর্ষের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, সম্যগ্‌রূপে আলোচনা ও বাদানুবাদকরতঃ যে সমস্ত বিধান বিধিবদ্ধ সদা পরিবর্ত্তিত করিতেন, তাহাতে কি কখন ভ্রমপ্রমাদ থাকিতে পারে? তাঁহাদের মধ্যে যিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট সত্ত্বগুণাবলম্বী তিনিই মুখপাত্র হইতেন, এবং সকলের সংশয় নিরসন করিতেন। ঐ সম্মিলনে উপস্থিত গৃহস্থাশ্রমী ব্রাহ্মণগণ তথায় যে সকল উপদেশ লাভ করিতেন, গৃহে প্রত্যাগত হইয়া তদনুযায়ী সকলকে নিজ নিজ অধিকারোপযোগী শিক্ষা প্রদান করিতেন।

---

(১) विद्वद्भिः सेवितः सद्भिर्नित्यमद्वेषरागिभिः ।
हृदयेनाभ्यनुज्ञातः योधर्मस्तन्निबोधत ॥ मनु, २।१।

অনেকের সংস্কার এই যে, যে কার্য্য কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং যে কার্য্য আচরণের যে প্রকার ফল হয় বলিয়া উহাতে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে সেই সকলের কারণ নির্দ্দেশ না করিয়া, অর্থাৎ কেনই বা ঐ কার্য্য কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য এবং কি জন্যই বা উহার নির্দ্দিষ্ট ফল হয়, তাহার হেতু না দর্শাইয়া এবং সেই সমস্ত কারণ সর্ব্বসাধারণকে না জানাইয়া, আর্য্যশাস্ত্রকারগণ যেন অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। কোন দেশের কোন সমাজের শাস্ত্রে ঐ প্রকার কারণ নির্দ্দেশ করিবার বা সেই সমস্ত সকলকে জানাইবার নিয়ম নাই। আইনের বিধান সকল ব্যক্তির জানা কর্ত্তব্য, ইহার অজ্ঞতাবশতঃ কোন কার্য্য করিলে তাহা মার্জ্জনীয় নহে, কিন্তু সেই বিধানের কারণ জানা কি সকলের পক্ষে প্রয়োজনীয়? যেমন, পরদ্রব্যাপহরণ দণ্ডবিধিতে অপরাধ বলিয়া গণ্য হইয়াছে এবং ঐ প্রকার কার্য্য আচরণের জন্য বিশেষ কোন দণ্ডের বিধান ইহাতে বিধিবদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু ইহা কেন অপরাধ এবং কি জন্যই বা ঐ প্রকার দণ্ড বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার কারণ ইহাতে প্রদত্ত হয় নাই এবং সকলেও উহা জানেও না।

নিজ জীবনের কর্ত্তব্য কার্য্য বিশেষরূপে অবগত হওয়া এবং সেই সমস্ত বিধিমত আচরণ করাই প্রকৃত শিক্ষা, যে ঐ শিক্ষা লাভ করিয়াছে, সেই শিক্ষিত, এতদ্ব্যতীত অপরে অশিক্ষিত, অজ্ঞ বা মূঢ়। যে জাতির বা যে সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তি ঐ প্রকার শিক্ষিত, সেই জাতিই সভ্য জাতি, সেই সমাজই উন্নতিশীল সমাজ। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য জাতি বর্ব্বর জাতি, অন্য সমাজ অশিক্ষিত, অসভ্য সমাজ।

শাস্তিদাতা।

কোন্ কার্য্য কর্ত্তব্য ও কোন্‌টিই বা অকর্ত্তব্য, এবং কোন্ কার্য্য

করিলে বা না করিলে কি ফল হইবে, তৎসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন দেশের শাস্ত্রকারগণ তথাকার সমাজের জন্য বিধিসমূহ নির্দ্দেশ করেন, এবং সেই সমস্ত যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয়, যাহাতে কেহ ঐ সকল উল্লঙ্ঘন করিতে না পারে, রাজা বা রাজশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি তাহার ব্যবস্থাবিধান করেন। কেহ কর্ত্তব্য কার্য্য না করিলে, অথবা অকর্ত্তব্য কার্য্য করিলে তাহার জন্য শাস্তি বা দণ্ডপ্রদান তাঁহারাই করিয়া থাকেন। এই প্রকারে রাজা বা রাজশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকর্ত্তৃক সমাজ শাসিত হয়। বিধিকর্ত্তা সত্ত্বগুণবহুল হওয়া উচিত তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। দণ্ডদাতা সত্ত্বগুণাবলম্বী কিম্বা অধিকতর রজোগুণবিশিষ্ট সত্ত্বগুণাবলম্বী ব্যক্তি, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় হওয়া প্রয়োজন। তমোগুণাধিক ব্যক্তি দণ্ডদাতা হইলে নানা প্রকারে কুফল ঘটিয়া থাকে এবং ইহাতে সমাজের বিশৃঙ্খলতা সম্পাদিত হয়, যে হেতু ঐ ব্যক্তি স্বার্থপরতার প্রেরণায় বা রিপুগণের উত্তেজনায় নিরপেক্ষভাবে দণ্ডবিধান করিতে কখনই সমর্থ হয় না। এই কারণবশতই যে সমাজে দণ্ডদাতা তামসিক ব্যক্তি, তাহাতে অশান্তিবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া নানাপ্রকার দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে এবং অবশেষে ঐ সমাজের বিপ্লব ঘটে।

ভক্তিমার্গ।

ভক্তি কি ?

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে কালের স্রোত উত্তীর্ণ হইয়া শান্তিময় স্থানে উপনীত হইবার—চরমলক্ষ্য চিরশান্তি পাইবার—তিনটি প্রধান মার্গ আছে। তন্মধ্যে কর্ম্মমার্গসম্বন্ধে বিশেষরূপে বলা হইয়াছে। ভক্তি অপর একটি পন্থা। একবারে কেহ বিশুদ্ধা ভক্তির পথে যাইতে পারে

না. সুতরাং কর্ম্মমার্গে অগ্রসর হইয়া যদি ভক্তিপথে উপনীত হওয়া যায়, তাহা হইলেই সহজসাধ্য হয়।

বৈধ কর্ম্ম আচরণ করিতে করিতে মনঃশুদ্ধি হইয়া বৈরাগ্য জন্মে, বিষয়ের প্রতি ক্রমে স্পৃহাশূন্যতা হয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধার উদ্রেক হইতে হইতে তাঁহার প্রতি যে গাঢ় অনুরাগের উদয় হয়, তাঁহার প্রতি যে আসক্তি জন্মে, তাহাই ভক্তি (১। বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ না করিলে, নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিতে না শিখিলে, প্রকৃত ভক্তি জন্মে না। নিজকৃত সমস্ত কর্ম্মই ভগবানে অর্পণ এবং তাঁহাকে কোন সময়ে বিস্মৃত হইলে চিত্তের যে একান্ত ব্যাকুলতা জন্মে, তাহারই নাম ভক্তি (২)। ইহা ঈশ্বরের প্রতি ঐকান্তিকী প্রেমস্বরূপা, ইহা লাভ করিলে সর্ব্বদাই ঈশ্বরে মন আবদ্ধ থাকে, সুতরাং বিষয়তৃষ্ণা শোক দ্বেষ সমস্তই বিদূরিত হয়, এবং কোন বস্তুতে আসক্তি বা কোন কার্য্যে উৎসাহ থাকে না। প্রকৃত ভক্তি কোন মনস্কামনা পূরণ করিবার জন্য নহে, ইহাতে ব্যবসাদারী নাই, কিছু পাইবার আশায় ঈশ্বরের নিকট যে প্রার্থনা করা যায়, তাহা প্রকৃত ভক্তি নহে। তিনি ভাল বাসিবেন বলিয়া তাঁহাকে যে ভালবাসা তাহাও ভক্তি নহে; মন স্বতঃই তাঁহাকে যে ভালবাসিয়া থাকে, তাঁহার প্রতি গাঢ় অনুরাগ জন্মিয়া ইন্দ্রিয়, মন এবং প্রাণাদি, বহির্ব্যাপার হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া, সর্ব্বদা তাঁহাতেই যে আবদ্ধ হইয়া থাকে, তাহাই প্রকৃত প্রেম, তাহাই যথার্থ ভক্তি। অভিমান অন্তর্হিত হইয়া মনে দীনভাবের উদয় না

---

(১) वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान् ।
विष्णुराराध्यते पन्था नान्यस्तत्तोषकारणम् ॥
विष्णुपुराण, ३८।९।

পরম পুরুষ বিষ্ণু বর্ণাশ্রমী পুরুষের আরাধ্য। তাঁহার সন্তোষের অন্য পথ নাই।

(২) নারদভক্তিসূত্র, ১৯; শাণ্ডিল্যভক্তিসূত্র, ২।

হইলে ভক্তি জন্মিতে পারে না। "আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা" এই প্রকার অভিমান যখন দূরীভূত হয় এবং প্রাতঃকালে উঠিয়া সায়াহ্ন পর্য্যন্ত ও সায়ংকাল হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত যত কিছু কার্য্য করা যায়, তৎসমস্ত তাঁহারই পূজামাত্র, এই প্রকার যখন মনের ভাব হয়, এবং সকল কার্য্যের ফল ঈশ্বরে অর্পণ করিতে শিক্ষা করিতে পারা যায়, তখনই বুঝিতে হইবে যে প্রকৃত ভক্তির উদয় হইয়াছে (১)।

প্রেম কি ?

প্রেম ও কাম স্বতন্ত্র সামগ্রী। ইন্দ্রিয়চরিতার্থ করিবার জন্য যে ভালবাসা তাহা কাম হইতে উৎপন্ন; অন্যের দ্বারা আমি সুখী হই, এইরূপ ভাবের নাম কাম। আমার দ্বারা অন্যে সুখী হউক এবং তাহাতে আমি সুখী হই, এইরূপ স্বার্থশূন্য মনোবেগের নাম প্রেম। ঈশ্বরের প্রতি ঐরূপ যে মনের ভাব তাহাই ঈশ্বরপ্রেম, তাহাই প্রকৃত প্রেম (২)। প্রেমের স্বরূপ যে কি, তাহা বলিতে পারা যায় না, ইহা অনির্ব্বচনীয়। এই প্রেম যে লাভ করিতে পারিয়াছে, যে প্রিয়তমকে চিনিতে পারিয়া তাঁহাতেই মনঃপ্রাণ ঢালিয়া দিয়াছে, তাহার কি আর অন্য কিছু ভাল লাগে ? যে ঈশ্বরকে প্রাণ-প্রিয়তমজ্ঞানে লাভ করিবার জন্য উন্মত্ত হইয়াছে, তাহার মনঃশুদ্ধির জন্য যজ্ঞাদি কর্ত্তব্য কার্য্য আচরণের প্রয়োজন থাকে না, এবং তাহাতে সে প্রীতিও বোধ করে না। ঐ প্রকার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য

---

(১) যৎ করোষীত্যাদি। গীতা, ৯।২৭।

(২) আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
চৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা।

করিয়াই ভক্তশ্রেষ্ঠ সাধক কবি বলিয়া গিয়াছেন,—

> "তুলসী ! জপ্ তপ্ কীজিয়ে,
> সব্ গুরিয়া কি খেল্।
> পিয়সে যব্ সম্বর্ হোই,
> রাখ্ পেটারি মেল ॥" (১)

ভক্তি কি প্রকারে হয়।

বৈধ-কর্ম্ম আচরণ করিতে করিতে হৃদয়ের বিশুদ্ধতা না জন্মিলে ভক্তির উদয় হইতে পারে না। কেবল মুখের কথা বলিলে ভক্তি করা হয় না, কেহ আপনাকে ভক্ত বলিয়া মুখে প্রকাশ করিলেও ভক্ত হয় না। ভ্রমবশতঃ ভক্ত হইয়াছে ভাবিয়া, যদি কেহ বৈধ-কর্ম্ম ত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহার সেই ত্যাগ তামসিক ত্যাগ (২)। ঈশ্বরে ঐকান্তিকী ভক্তির উদয় হইলে আপনা হইতে বৈধ-কর্ম্ম তিরোহিত হয়, ইহা ত্যাগ করিবার জন্য কোন প্রকার যত্ন বা চেষ্টা করিবার প্রয়োজন হয় না। ভক্তি যতদিন দৃঢ় না হয়, ততদিন শাস্ত্র-বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করা আবশ্যক, কিন্তু বৈধকর্ম্ম ত্যাগ করিলেও শরীর যতদিন থাকিবে ভোজনাদি স্বাভাবিক কার্য্যও ততদিন থাকিবে (৩)। কর্ম্মের দ্বারা গতিলাভ করিতে বহুকালের প্রয়োজন, কিন্তু ভক্তির উদয় হইলে শীঘ্রই হয় (৪)।

---

(১) তুলসী ! জপ তপ কর, কিন্তু এ সমস্ত বালিকার পুত্তলিকাক্রীড়ার মত ; বালিকা যখন পিত্রালয় হইতে প্রিয়সমাগমে যায়, তখন ঐ সকল ক্রীড়াপুত্তলিকাকে বাক্স পেটারার মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখে ; সেইরূপ যখন তুমি প্রাণপ্রিয়তম ভগবানের সঙ্গ লাভ করিবার জন্য অগ্রসর হও, তখন জপ তপ কোথায় পড়িয়া থাকে।

(২) गीता, १८।७।

(৩) नारदभक्तिसूत्र, १२, १३, १४ ।

(৪) अपि चेत् सुदुराचारः इत्यादि । गीता, ९।३०,३१।

ঈশ্বরে বিশ্বাস না জন্মিলে তাঁহার প্রতি ভক্তির উদয় হইতে পারে না। বিশ্বাসই ভক্তির মূল। মুখে কেবল বিশ্বাস করি বলিলে বিশ্বাস করা হয় না, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে হয়। বিশ্বাস জন্মিয়াছে কিনা তাহার পরীক্ষা নির্ভরতাদ্বারা করিতে পারা যায়,কারণ যাঁহার ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাস না থাকে তাঁহার উপর নির্ভর করিতে পারা যায় না। যতই বিশ্বাস দৃঢ় হইতে থাকে, ততই ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরতা বৃদ্ধি হয়; যতই তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া ধারণা করা যায়, ততই তাঁহার প্রতি বিশ্বাস ঘনীভূত হইতে থাকে এবং ততই আত্ম-নির্ভরতা ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইয়া তাঁহার প্রতি নির্ভরতা বৃদ্ধি হয়। সেই অবস্থায় উপনীত হইয়া সাধক ঈশ্বরকে ভজনা করে—তাঁহাকে ভক্তি করে—তাঁহার শরণাগত হয়। বিশ্বাস হইতে নির্ভরতা, নির্ভরতা হইতে শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা হইতে নিষ্ঠা, নিষ্ঠা হইতে রুচি, রুচি হইতে আসক্তি ইত্যাদি মানসিক ভাব ক্রমে ক্রমে জন্মিয়া থাকে। ঈশ্বরের প্রতি আসক্তি জন্মিলে—তাঁহার প্রতি গাঢ় অনুরাগের উদয় হইলে—বহির্বিষয়ের প্রতি অনুরাগ ক্রমে হ্রাস হইয়া আইসে, সাধক তখন আপনাকেও ভুলিতে আরম্ভ করে। প্রথমতঃ স্বধর্ম্মাচরণ করিতে করিতে অর্থাৎ নিজ নিজ প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী যাহা কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহা কেবলমাত্র কর্ত্তব্যবোধে আচরণ করিতে করিতে এই পথে প্রবেশ করিয়া, ক্রমে ক্রমে কর্ম্মফল ঈশ্বরে অর্পণ করিতে শিক্ষা করিতে হয়। তৎপরে ক্রমাগত অগ্রসর হইতে হইতে ঈশ্বরে অনুরাগের উদয় হইলে বৈধকর্ম্মাচরণ আপনা হইতেই ছাড়িয়া যায়, সাধক তখন তাঁহারই শরণাগত হয় (১)। তৎপরে অবিচলিতহৃদয় হইয়া

---

(১) आज्ञायैव गुणान्दोषानित्यादि । भागवत, ११।११।३२ ।
सर्व्वधर्म्मान् परित्यज्य इत्यादि । गीता, १८।६६।

তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া সে সর্ব্বদাই প্রসন্নচিত্ত থাকে এবং হিংসাদ্বেষশোক আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি মন হইতে অন্তর্হিত হওয়ায় সর্ব্বজীবকেই সমান জ্ঞান করিতে থাকে (১)। ঐ প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হইলে সাধক প্রকৃত ভক্তির প্রান্তদেশে উপনীত হইতে সমর্থ হয়, তখনই প্রকৃত ভক্তির অধিকারী হয়, অবশেষে আত্মহারা হইয়া যায়, ঈশ্বর তখন তাহার হৃদয়মন অধিকার করেন। এই অনুরাগই প্রকৃত ভক্তি। এই অবস্থাপ্রাপ্ত সাধক ক্রমে ক্রমে যখন চরমসীমায় উপনীত হয়, তখন সে নিজের স্বতন্ত্র সত্বা পর্য্যন্তও হারাইয়া ফেলে।

ভক্তশ্রেষ্ঠ ধ্রুব প্রহ্লাদ প্রভৃতি যে পথের পথিক হইয়া নির্ভরতা কি, ভক্তি কি, ভক্ত কাহাকে বলে, তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন; যে রমণীয় পথে যাইতে যাইতে দেবর্ষি নারদ মধুময় বীণার হরিময় ধ্বনি ছড়াইয়া যাহাকে অধিকতর রমণীয় করিয়া গিয়াছেন; অজ্ঞানতা ও মোহ হেতু অচেতন মানবকে চেতনা প্রদান করিতে চিন্ময় চৈতন্য স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া মধুরভাব ঢালিয়া দিয়া যে পথকে মাধুর্য্যময় করিয়া গিয়াছেন; সেই পথে অগ্রসর হইবার জন্য সকলেরই সর্ব্বতো-ভাবে সতত আয়াস প্রয়াস অবলম্বনে অবহিত হওয়া উচিত। বলিতে কি যিনি এই রমণীয় সুখগম্য পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তিনিই ধন্য, তিনিই কৃতার্থম্মন্য এবং তাঁহারই জন্ম সফল হইয়াছে।

সকামভাবে উপাসনা করিতে করিতে কামনাহীন হইয়া ঈশ্বরে প্রকৃত ভক্তির উদয় হয়।

মনুষ্য প্রবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া সকামভাবেও ঈশ্বরের উপাসনা করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে নিবৃত্তিমার্গে উপস্থিত হয়, ক্রমে ক্রমে সে

---

(১) ব্রহ্মভূতপ্রসন্নাত্মা ইত্যাদি। গীতা, ১৮।৫৪।

নিষ্কাম হয়। যদি কেহ কাহারও নিকট কোন বিষয়ের প্রার্থী হয়, তৎপূর্ব্বে সে তাহাকে নানাপ্রকার দ্রব্যাদি দিয়া তাহার সেবা করিয়া সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করে, আর যদি তাহার প্রার্থনা সফল হয়, তাহা হইলে তাহার সন্তোষের জন্য কৃতজ্ঞতার উপহার প্রদান করিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট রাখিতে যত্নবান্ হয়। সেই জন্যই সকামী ব্যক্তি কাম্যবস্তু লাভের জন্য আপনার হৃদয়গ্রাহী কোন মনোহর দেবমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া, অথবা বিদ্যমান কোন মূর্ত্তি নিকটে পাইয়া, তাহাই তাহার সাধের জিনিষ দিয়া সাজাইয়া থাকে, এবং সে যাহা অতি প্রিয়, অতি মূল্যবান্ মনে করিতেছে, তাহা অতি কষ্টে, অতি যত্নের সহিত সংগ্রহ করিয়া, তাহাদ্বারা ঈশ্বরের উদ্দেশে সেই মূর্ত্তির পূজা করে। তাঁহার নিকট ধনী নির্ধন, রাজা প্রজা সকলেই সমান, সেই জন্যই পর্ণকুটীরস্থ অতি দীনহীন অকিঞ্চন সাধকের ভক্তিমাখা শূন্য হৃদয়ে, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর সেই রাজাধিরাজ আসীন হইয়া দরিদ্রের ভক্ত্যুপহার গ্রহণ করেন, এবং সে তাঁহার উদ্দেশে কেবলমাত্র সামান্য পত্র পুষ্পাদি প্রদান করিয়াও অসীম আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে (১)। প্রত্যেক সাধক গুরুর উপদেশানুযায়ী নিজ নিজ ইষ্ট দেবকে সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করে এবং অন্যকে ভজনা না করিয়া অনন্যচিত্ত হইয়া কেবল একমাত্র নিজ ইষ্টদেবমূর্ত্তিরই উপাসনা করিয়া থাকে। ঐরূপ করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে তাহার মন তাঁহাতেই ব্যাপৃত হয়, তাঁহারই প্রতি সে আসক্ত হয়, তখন তিনি তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া তাহাতেই আসীন হন। এই প্রকারে সকামী ব্যক্তি ক্রমশঃ নিষ্কাম হইয়া থাকে, তখন সে যে কোন কর্ম্মই করে, সমস্তই তাঁহারই জন্য করিতে প্রয়াসী হয়, এবং ক্রমে ক্রমে সে বহির্ব্বিষয় ভুলিয়া গিয়া, নিজের স্বার্থে

---

(১) পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়মিত্যাদি। গীতা, ৯।২৬।

জলাঞ্জলি দিয়া হৃদয়ের ধন হৃদয়ে সযত্নে রক্ষা করে, তখন তাঁহাতেই তাহার মন একাগ্র হয়, আর কিছুই তাহার হৃদয়ে স্থান পায় না, সুতরাং তাহার হৃদয় হইতে অন্য চিন্তা লোপ হইয়া যাওয়ায়, সে সবই এক দেখিতে থাকে, সকলেতেই সে কেবল তাঁহারই অস্তিত্ব অনুভব করিতে থাকে (১)। ইহাই প্রকৃত ভক্তি।

চরম লক্ষ্যকে কে কোন্ অবস্থায় কি ভাবে লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইয়া থাকে।

সগুণ জীব নির্গুণ ব্রহ্ম চিন্তা করিতে সক্ষম হয় না। সহজে তাহার মন অব্যক্তে আসক্ত হইতে না পারায় তাহার ব্রহ্মচিন্তা দুশ্চিন্তায় পরিণত হয় এবং আসক্ত হইলেও তাহার সিদ্ধি লাভ করিতে ক্লেশ হয় (২)। যিনি বাঙ্‌মনোবুদ্ধির অগোচর, দয়া, স্নেহ, করুণাদি গুণের কণামাত্রও যাঁহাতে নাই, সেই নির্গুণ ব্রহ্ম মায়াময় সাধারণ জীবের ধ্যেয় হইতে পারেন না। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সমস্তই তাঁহার রূপ, ইহাও সকলে সহজে ধারণা করিতে পারে না এবং প্রত্যেক জীবে ও প্রতি পদার্থে তাঁহার অস্তিত্বও সকলে অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। তিনি সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন হইলেও সাধকের প্রকৃতিভেদে তাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি শক্তিযুক্ত অনুমান করিয়া, তাঁহাকে উপাসনা করিবার জন্য, তাঁহাকে ধ্যান করিবার জন্য, শাস্ত্রকারগণ বিধান করিয়াছেন এবং তদনুযায়ী সদ্‌গুরু উপদেশ দিয়া থাকেন।

---

(১) বহূনাং জন্মনামন্তে ইত্যাদি। গীতা, ৩।১৯

(২) ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥
গীতা, ১২।৫।

অব্যক্তে যাহাদের চিত্ত আসক্ত হইয়াছে, তাহাদের সিদ্ধিলাভ করিতে অধিকতর ক্লেশ হয়, যে হেতু অব্যক্তবিষয়ক নিষ্ঠা মনুষ্যগণ দুঃখে লাভ করিয়া থাকে।

যে ক্ষুধায় কাতর হইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য অস্থির হইয়াছে, কিংবা যে দুশ্চিকিৎস্য কোন রোগে অধীর হইয়া হৃদয়বিদারক কষ্ট অনুভব করিতেছে, যাহার চিত্তবৃত্তি সেই সেই বিষয়ে নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহার নিকট নির্ব্বিকার নিগুর্ণ ব্রহ্মের কথা বলিলে কি সে শান্তি পায়? ক্ষুধার্ত্তের অন্নপূর্ণামূর্ত্তি বড়ই ভাল লাগে; গুরু তাহাকে সেই জগজ্জননীর নিকট—যাঁহার ভাণ্ডার অক্ষয় অব্যয় তাঁহারই নিকট—ভিক্ষা করিতে শিখাইয়া দেন, ক্ষুদ্র জীবে তাহার দুর্গতি নাশ করিতে পারিবে না ক্রমে ক্রমে ইহাও বুঝাইয়া দেন। যাহারা অসহ্য আধিব্যাধির ভীষণ যন্ত্রণায় অস্থির হইতেছে, গুরুর উপদেশে তাহাদের কেহ বা সর্ব্বমঙ্গলার মঙ্গলময় ক্রোড়ে 'মা' বলিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য ছুটিতেছে, কেহ বা মঙ্গলদাতা মৃত্যুঞ্জয়ের চরণে 'পিতঃ' বলিয়া লুণ্ঠিত হইতেছে, সেই সেই মূর্ত্তিই তাহার হৃদয়গ্রাহিণী হইতেছে, তাহাই উপাসনা করিতে সে ভাল বাসিতেছে। যে শত্রুভয়ে কাতর, শত্রুদমনের জন্য লালায়িত, অভয়প্রাপ্তির জন্য ব্যগ্র, সে সন্তানের ন্যায় বিশ্বমাতার ক্রোড় আশ্রয় করিতে উৎসুক হয়, তাই বরাভয়প্রদায়িনী শত্রুবিধ্বংসকারিনী জগজ্জননীর একাধারে উগ্র ও সৌম্য মূর্ত্তি দেখিতে সে বড় ভালবাসে এবং সেই মূর্ত্তির নিকট মঙ্গলকামনা ও রক্ষাপ্রার্থনা করিয়া থাকে (১)। কেহ বা ঐ জন্য গদাধর চক্রপাণি মূর্ত্তিই প্রিয়বোধ করে। যে জীবনের মনোমত সঙ্গিনী পাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষিত, সে বরদায়িনী মাতার নিকট "ভার্য্যাং মনোরমাং

---

(১) सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते ।
यानि चात्यर्थघोराणि तै रक्षास्मांस्तथा भुवम् ॥
चण्डी, ৪।২৬।

(হে দেবি!) ত্রৈলোক্যে তোমার যে সৌম্য এবং অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিসকল প্রচারিত আছে, সেই সকল রূপ দ্বারা আমাদিগকে ও পৃথিবীকে রক্ষা কর।

দেহি মনোবৃত্ত্যনুসারিণীং” বলিয়া প্রার্থনা করিতেছে। শতসহস্র কামনারাশি যাহার মনকে সদাই উদ্বেলিত করিতেছে, সে সর্ব্বশক্তিশালিনী বিশ্বপ্রসবিনী জননীর পদতলে দাঁড়াইয়া “পুত্রং দেহি, ধনং দেহি, ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে” ইত্যাদি বলিয়া তাহার অসংখ্য বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহার নিকট বরপ্রার্থনা করিতেছে ও তাঁহার চরণে পুষ্পোপহার প্রদান করিতেছে, এবং তাঁহারই উপর নির্ভর করিয়া সে তাহার মনের দুর্ব্বহ ভার লঘু করিতেছে। আবার কেহ বা ধনপুত্রাদি কামনা করিয়া অন্য কোন প্রকার ভাবে ঈশ্বরের ভজনা করিতেছে (১)। এই সকামভাবেই খ্রীষ্টানগণ “Our Father which art in Heaven, Hallowed be thy name. Give us this day our daily bread” (২) ইত্যাদি বলিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছে। কাহারও বা ইহ জগতের সুখের লালসা নাই, ইহা অপেক্ষা অধিকতর সুখের জন্য সে স্বর্গাদি কামনা করিয়া যজ্ঞাদির বিধিবিহিত অনুষ্ঠান দ্বারা ইন্দ্র, চন্দ্র, তপন, পাবন, পবন, বরুণ প্রভৃতি দেবতার উপাসনা করিতেছে। অধিক কি, আত্মজ্ঞান-পিপাসু ব্যক্তি আত্মজ্ঞানলাভের জন্য, এবং তত্ত্বজ্ঞ পুরুষও মুক্তির জন্য তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন (৩)। সকলে একভাবে তাঁহার

---

(১) कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः ।
तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥
গীতা, ৭।২০

পুত্র কীর্ত্তি শত্রুজয় ইত্যাদি বিষয়ক সেই সেই কামনাদ্বারা যাহাদের তত্ত্বজ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে, তাহারা, সেই সেই দেবতার আরাধনায় যে যে নিয়ম আছে, সেই সেই নিয়ম অবলম্বন করিয়া, স্বকীয় প্রকৃতি অনুযায়ী, অর্থাৎ তাহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাসনানুসারে নিয়মাদির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, অন্য দেবতার উপাসনা করিয়া থাকে।

(২) St. Mathew, Ch. 6, V. 9, 11.

(৩) चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन। গীতা, ৭।১৬।

ভজনা করিতে পারে না বা ভালবাসে না; কেহ বা পিতামাতার ন্যায় তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতে, কেহ বা প্রভুর ন্যায় তাঁহার সেবা করিতে, কেহ বা সখাভাবে তাঁহাকে দেখিতে, কেহ বা বাৎসল্যভাবে তাঁহাকে আদর করিতে চাহে, আবার কেহ বা সেই ত্রিলোকপতিকে পতিভাবে ভজনা করিতে ভালবাসে। সাধক যে ভাবে তাঁহাকে উপাসনা করে, যে ভাবে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করে, সেই ভাবেই তিনি তাহার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, সেই ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান্ ভক্তের মনস্কামনা পূর্ণ করেন (১)। তিনি ক্ষুধার্ত্তের অন্নদাতা, রোগীর আরোগ্যদাতা, ভীতের ভয়ত্রাতা, ধনাকাঙ্ক্ষীর ধনদাতা, অপুত্রকের পুত্রদাতা, দুঃখীর দুঃখভঞ্জনকর্ত্তা, স্বর্গকামীর স্বর্গফলদাতা, আত্মজ্ঞান-পিপাসুর আত্মজ্ঞানোপদেষ্টা এবং তত্ত্ববেত্তার মুক্তিদাতা। একমাত্র তাঁহাকেই কেহ প্রভু, কেহ পিতা বা মাতা, কেহ সখা, কেহ নাথ, কেহ পুত্র বা কন্যা বলিয়া ডাকিতেছে এবং তদনুযায়ী তাঁহার উপাসনা করিতেছে। যে যে ভাবেই তাঁহার উপাসনা করুক না কেন, যে যাহাই বলিয়া তাঁহাকে ডাকুক না কেন, সকাম, নিষ্কাম, সগুণ, নির্গুণ সকল অবস্থাতেই তিনিই একমাত্র সহায়, তিনিই একমাত্র ফলদাতা। একমাত্র তাঁহাকেই লোকে ভিন্ন ভিন্ন নামে, ভিন্ন ভিন্ন রূপে, ভিন্ন ভিন্ন উপচারে এবং ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পূজা করিয়া থাকে (২)। গুরু শিষ্যের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি দেখিয়া তাহাকে তত্তদনুযায়ী শিক্ষা প্রদান করেন।

---

(১) যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে ইত্যাদি। গীতা, ৪।১১।

(২) আকাশাৎ পতিতং তোয়ং যথা গচ্ছতি সাগরম্।
সর্ব্বদেবনমস্কারঃ কেশবং প্রতি গচ্ছতি॥

* আকাশ হইতে পতিত জল যেমন সাগরেই গমন করে, সেইরূপ সকল দেবতার উদ্দেশে নমস্কার কেশবের প্রতিই গমন করে

দাস্যাদিভাব।

নানা প্রকার ভাবে ঈশ্বরের ভজনা করিতে পারা যায়, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রধান। ইহার মধ্যে কোন একটি ভাবে তাঁহাকে চিন্তা করিলে মন তাঁহাতে আবদ্ধ থাকে এবং ক্রমে ক্রমে তদ্‌গত হইয়া ইহা তাঁহাতেই লীন হয়। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ এবং সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান, এইরূপে তাঁহাকে দেখা শান্তভাব। “তিনি প্রভু আমি তাঁহার দাস” এইরূপে তাঁহার শরণাগত হওয়া দাস্যভাব। বিপদে, সম্পদে, সুখে, দুঃখে সর্ব্বদাই তিনি সহায়, এইরূপে তাঁহার অনুগত হওয়া সখ্যভাব। সন্তানের ন্যায় স্নেহের সহিত তাঁহাকে আদর করিয়া তাঁহাতে তদ্‌গত-প্রাণ হওয়া বাৎসল্যভাব। “আমার মনঃপ্রকৃতি নারী এবং তিনি পুরুষ বা পতি” এই ভাবাপন্ন হইয়া তাঁহাতে মনঃপ্রাণ ঢালিয়া দেওয়া কান্তভাব বা মধুরভাব।

রুচীনাং বৈচিত্র্যাত্ ঋজুকুটিলনানাপথজুষাং
নৃণামেকগম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব। মহিম্নস্তব।

সর্ব্ব এব যজন্তি ত্বাং সর্ব্বদেবমহেশ্বরম্।
যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যদ্যপ্যন্যধিয়ঃ প্রভো॥
যথাদ্রিপ্রভবা নদ্যঃ পর্জ্জন্যাপূরিতাঃ প্রভো।
বিশন্তি সর্ব্বতঃ সিন্ধুং তদ্বৎ ত্বাং গতয়োঽন্ততঃ॥

ভাগবতম্, ১০।৪০।৯,১০।

হে সর্ব্বদেবময় প্রভো! যাহারা নানা দেবতার ভক্ত, তাহাদিগের বুদ্ধি যদিও অন্যে আসক্ত, তথাপি সকলেই আপনারই পূজা করেন। প্রভো! যেমন পর্ব্বতজাত নদী-সকল, বর্ষার জলে পূর্ণ হইয়া সর্ব্বদিক্ হইতে সমুদ্রে গিয়া পতিত হয়; তেমনই সমুদয় গতি অন্তে আপনাতেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে।

যো যো যাং যাং তনুং ভক্ত শ্রদ্ধয়াঽন্বয়ঃ। গীতা, ৭।২১,২২।

ভগবানের মহিমা অপার, তাঁহার দয়া অসীম, ভক্তকে ত তিনি উদ্ধার করিয়াই থাকেন, এমন কি যে শত্রু, যে ক্রমাগতই তাঁহার প্রতি শত্রুভাবে আচরণ করিয়া থাকে,তাহাকেও তিনি সদ্গতি প্রদান করিয়া থাকেন (১)। ভয় বা দ্বেষবশতঃ সর্ব্বদাই তাহার মনে তাঁহারই চিন্তা জাগরূক থাকে, সে ঐ জন্য সদাসর্ব্বদাই তাঁহার চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করে, পরে তিনি ব্যতীত আর কেহ তাহার মনে স্থান পায় না, সে একেবারে তন্ময় হইয়া যায়, এবং অবশেষে তাঁহাতেই তাহার অস্তিত্ব লোপপ্রাপ্ত হয়। শত্রুভাবে কেহ তাঁহার উপাসনা করে না, তবে ঘটনাবশতঃ কাহারও কাহারও এই প্রকার অবস্থা ঘটিয়াছে।

ভক্তিমার্গে গমনশীল বৈষ্ণব সাধকগণ।

বহু সাধক নানা শাস্ত্রানুযায়ী পৃথক্ পৃথক্ পথ অবলম্বন করিয়া প্রতিস্রোতে চলিতেছেন, কিন্তু সাধু বৈষ্ণব! যে শাস্ত্রের প্রতিধ্বনি তোমার হৃদয়ে আঘাত করিতেছে, যাহা শুনিতে শুনিতে এবং যাহার অনুযায়ী কার্য্য করিতে করিতে তুমি উন্মত্তবৎ চলিয়াছ, কি জানি তাহাতে কি আছে, সেই শব্দে আমারও হৃদয়তন্ত্রী প্রতিঘাত হইয়া কেন নাচিয়া উঠে! যদিও আমার ভগ্ন যন্ত্রের ছিন্ন তন্ত্রীতে আঘাত লাগিয়া মধুর শব্দ উত্থিত হয় না, তথাপি আমার মনে হয় যেন, ঐ শাস্ত্র অতি সুমধুর এবং তুমি তাহা অবলম্বন করিয়া ধন্য হইয়াছ।

তোমাতে যে একাধারে কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান এই তিনটি পথ ত্রিবেণীর ন্যায় মিলিত হইয়াছে! তোমা অপেক্ষা অধিকতর নিষ্কাম

---

(১) अहो बकी यं स्तनकालकूटमित्यादयः।

भागवतम्, ३।२१।२३, २४।

उक्तं पुरस्तादेतदित्यादि। भागवतम्, १०।२९।१३—१५।

কর্ম্মযোগী কে আছে ? তুমি প্রতি মুহূর্ত্তে যে কার্য্য করিতেছ, তাহাতে তোমার নিজ স্বার্থের লেশমাত্রও নাই ; উহা তোমার নিজের জন্য করিতেছ না, কেবল ভগবানের জন্য করিতেছ, ইহাই যে কেবল তুমি ক্রমাগত মনে করিতেছ। তুমিই যথার্থ নিষ্কাম হইতে শিখিয়াছ! বিষয়সুখের কামনা ত কোন্ তুচ্ছ, তুমি সেই চরম কামনা মুক্তিটি পর্য্যন্তও যে পাইতে ইচ্ছা কর না; কেবলমাত্র ভগবানের সেবা করিতেছ এবং চিরদিনই তাঁহার সেবা করিবে, ইহাই মনে করিয়া তুমি পরমানন্দ অনুভব করিতেছ ( )। ইহা হইতে অধিকতর কামনাহীনতা আর কাহাতে পাইতে পারি ? তোমা অপেক্ষা অধিকতর ভক্ত আর কে হইতে পারে ? তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ইত্যাদি মানসিক অবস্থা ক্রমে ক্রমে লাভ করিয়া অবশেষে বহির্ব্বিষয়ের প্রতি তোমার অনুরাগ সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়া যাওয়ায়, তুমি ভগবানের গাঢ় অনুরাগরূপ শুদ্ধ প্রেম লাভ করিয়াছ, তুমি ভক্তির চরমসীমায় উপনীত হইয়াছ। তোমা অপেক্ষা অধিকতর আত্মজ্ঞানী

---

(১) लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य ह्युदाहृतम् ।
अहैतुक्यव्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे ॥
सालोक्यसार्ष्टिसामीप्यसारूप्यैकत्वमप्युत ।
दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः ॥
स एव भक्तियोगाख्य आत्यन्तिक उदाहृतः ।

भागवतम्, ३।२९।१२, १३, १४।

পুরুষোত্তমে (অন্তর্যামী আমাতে) অহৈতুকী অর্থাৎ ফলানুসন্ধানশূন্য, অব্যবহিতা অর্থাৎ ভেদদর্শনরহিত ভক্তি নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ, যাঁহারা সেই ভক্তি লাভ করিয়াছেন, সেই ভক্তগণ, আমার নিকট অন্য কোন ফলানুসন্ধান দূরে থাকুক, প্রত্যুত তাঁহাদিগকে সালোক্য অর্থাৎ আমার সহিত এক লোকে বাস, সাষ্টি অর্থাৎ আমার সমান ঐশ্বর্য্য, আমার সামীপ্য, আমার সমানরূপত্ব, আমার সাযুজ্য অর্থাৎ আমার সহিত ঐক্য, এই সকল বস্তু দিতে চাহিলেও তাঁহারা গ্রহণ করেন না, কেবল আমার সেবাকেই পরম-পুরুষার্থ জানিয়া তাহাই প্রার্থনা করিয়া থাকেন, ইহাকেই আত্যন্তিক ভক্তিযোগ বলে।

আর কে আছে? প্রকৃত জ্ঞান কি তাহা তুমি বুঝিয়াছ; জগৎসংসার সমস্তই অসার, কেবল ভগবানই একমাত্র সার, ইহা তুমি যে বিশেষ-রূপে উপলব্ধি করিয়াছ। তুমি জলে বিষ্ণু, স্থলে বিষ্ণু, সর্ব্বত্রই সেই সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুকেই কেবল অনুভব করিতেছ; তুমি আপনার অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়া, ভগবানে তন্ময় হইয়া, কেবল তাঁহারই অস্তিত্বব্যতীত আর যে কিছুই অনুভব করিতে পারিতেছ না। ইহা অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ জ্ঞান কি আছে জানিনা।

তুমি আপনাকে তৃণ হইতে নীচ মনে করিলে কি হয়! তুমি যে অত্যুচ্চ মহীরুহের ন্যায় উন্নতমস্তকে জগৎসংসারকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া প্রতিস্রোতে প্রবলবেগে চলিয়াছ, তোমার হৃদয়ের ধনকে বহুদিন পরে পাইবার জন্য যেন একেবারে উন্মত্ত হইয়া ছুটিতেছ। প্রেমনামে কি পদার্থ তুমি হৃদয়ে মাখাইয়াছ, ইহাতে বিষয়ানুরাগ, বিদ্বেষ, ভয়, ক্রোধ সমস্তই যে তোমার হৃদয় ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছে? আহা! ঐ অমৃতের এক বিন্দু যদি আমি পাই, তাহা হইলে আমার বিষয়াসক্তি শিথিল হইয়া যায়, তখন আমি আমার আকাঙ্ক্ষিত কৃপারজ্জু দৃঢ়রূপে ধরিতে পারি, এবং তাহার সাহায্যে অনায়াসে আমার অভীপ্সিত স্থানে উপনীত হইয়া পরম শান্তি লাভ করিতে পারি।

তুমি যে পথে যাইতেছ তাহার সবই মধুময়, সকলই সুন্দর। ভগবানের সৌন্দর্য্যময়ী ও মনোরমা মূর্ত্তি দেখিবার জন্য তোমার চক্ষু লালায়িত, তাঁহার হৃদয়োন্মাদক মধুর বংশিধ্বনি শুনিবার জন্য তোমার কর্ণ আকুল, ভাবের মধ্যে যাহা মধুর সেই ভাবে তোমার হৃদয় বিভোর। তোমার সাধনার জন্য, তোমার ধারণার উপযোগী হইবার জন্য, সেই অনন্ত বিশ্বরূপ ব্রহ্ম মনোমহিনী ক্ষুদ্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। মনুষ্যচক্ষুর গোচরীভূত হইবার জন্য তাঁহার প্রথম স্ফুটন, সত্ত্বগুণের নীলিম বর্ণে পরিদৃশ্যমান, জ্যোতিষ্কময় অসংখ্য তারকারাজিসুশোভিত

আকাশের রূপে তিনি বিরাজিত হইয়াছেন, তাই তাঁহার নীলাভ অঙ্গে, নক্ষত্রপরিবেষ্টিত চন্দ্রের পরিবর্ত্তে, শ্বেতবর্ণ বনমালার মধ্যস্থিত উজ্জ্বল কৌস্তুভমণি, সুশোভিত হইয়াছে। ঘনীভূত তেজের প্রথম স্ফুরণ বিদ্যুৎ যেন তাঁহার বসন রঞ্জিত করিয়াছে এবং নেত্রবিমোহনকর সমস্ত বর্ণই তাঁহার শিরঃস্থিত ময়ূরপুচ্ছে পরিস্ফুটিত হইয়াছে। শব্দ আকাশের গুণ, পঞ্চতন্মাত্রের মধ্যে ইহাই প্রথম ও প্রধান পরিব্যক্তি তাহাই তাঁহার সুমধুর বংশিধ্বনিতে ব্যক্ত হইতেছে। তোমার গুরু তোমাকে শিখাইয়াছেন যে, যদি কাহাকেও ভাল বাসিতে হয়, তাঁহাকেই ভাল বাসিবে, যদি কোন মূর্ত্তি সর্ব্বদাই তোমার মনোদর্পণে দেখিতে চাও, ঐ মূর্ত্তিই দেখিবে। তোমার হৃদয়নেত্রে যে প্রেমরূপ অঞ্জন মাখাইয়া তুমি সেই মূর্ত্তি দেখিতে শিখিয়াছ, যে জন্য তুমি বলিতে পার "জনম অবধি হম্ রূপ নেহারিনু নয়ন না তিরপিত ভেল," সেই প্রেম আমার অন্ধ নয়নে মাখাইয়া দাও, যেন ইহা সেই রূপ দেখিতে সমর্থ হয়।

তোমার ভগবান্ দণ্ডদাতা নহেন, সুতরাং ভয়সঙ্কুচিত হইয়া তুমি তাঁহার সম্মুখীন হও না, তোমার কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, সুতরাং বরদাতার নিকট বরপ্রার্থীর ন্যায়ও তুমি অগ্রসর হও না। তাঁহার বিষয় শ্রবণ করিলেই, এমন কি তাঁহার নাম উচ্চারণ করিবামাত্রই, তুমি অশ্রু বিসর্জ্জন কর, এ অশ্রু বিভীষিকাময় দণ্ডদাতার সম্মুখে পাপসন্তপ্ত অথবা ত্রাসত্রাসিত পাপীর দণ্ডভয়জনিত কিংবা পরিতাপজাত অশ্রু নহে; ইহা শোকসন্তপ্ত হৃদয়ের শোকোদ্ভূত বা নিরাশহৃদয়ের নৈরাশ্যজনিতও অশ্রু নহে, অথবা কামুকের কামাশ্রুও নহে, ইহা নির্ম্মল প্রেমাশ্রু, ইহা সত্ত্বগুণের আনন্দাশ্রু। তুমি তাঁহাকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ভালবাস এবং তাহার বিনিময়ে কিছু আকাঙ্ক্ষা কর না, তাঁহাকে ভালবাসিতে সক্ষম হইয়াছ বলিয়াই তুমি আনন্দে বিহ্বল। তোমার নিকট তাঁহার

নামেরও এত মাধুর্য্য যে তাহা শুনিবামাত্র তোমার হৃদয় প্রেমার্দ্র হইয়া আকুল হয়, পরে ঐ নাম জপিতে জপিতে একেবারে অবশ হইয়া তাঁহাকে পাইবার জন্য তোমার মন লালায়িত হয়; সেই অবস্থা সাধকশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবকবি হৃদয়ের আবেগে, মধুরভাষায় যেন মধু ঢালিয়া দিয়া গাহিয়াছিলেন,

"সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম
কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ।
না জানি কতেক মধু, শ্যাম নামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে,
জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে॥" (১)

জ্ঞানমার্গ।

কালের স্রোত অতিক্রম করিয়া শান্তিময় স্থানে যাইবার—ব্রহ্মে লীন হইয়া চিরশান্তি পাইবার—যে তিনটি প্রধান পন্থা আছে, তন্মধ্যে জ্ঞানমার্গ দুরূহ ও শেষ পন্থা। নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিতে করিতে, এক জন্মেই হউক, বা জন্মজন্মান্তরেই হউক, জ্ঞানোৎপত্তি হইয়া থাকে। জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হইলে সমস্ত কর্ম্ম দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হয়। তাহা হইলে আর নূতন কর্ম্মফল সঞ্চিত হইয়া, তাহার ভোগের জন্য পুনঃ পুনঃ গতাগতি করিতে হয় না। জ্ঞানের উদয় হইলে স্বার্থপরতা

---

(১) চণ্ডীদাস।

দূরীভূত হয়, রিপুগণ নিস্তেজ হয়। সাধারণ চর্ম্মচক্ষুদ্বয় ব্যতীত যখন জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানরূপ তৃতীয় চক্ষু উন্মীলিত হয়, তখন তাহার উগ্রতেজে রিপুগণের মধ্যে দুর্জ্জয় রিপু কামও দগ্ধ হইয়া যায়—মদন ভস্মীভূত হয়—কন্দর্পের পঞ্চবাণ নিস্তেজ হইয়া অকর্ম্মণ্য হয় এবং মনসিজের নিত্য সহচরী রতি বা আসক্তি তাহার প্রধান সহায়কে হারাইয়া দীনহীনার ন্যায় যেন রোদন করিতে থাকে।

জ্ঞান কি এবং কি প্রকারে ইহার উদয় হয়।

জ্ঞানী সমস্ত কামনা উপেক্ষা করিয়া, সকল বিষয়েই স্পৃহাশূন্য হইয়া, শত্রুমিত্রজ্ঞান লোপ করিয়া, সুখদুঃখে বিচলিত না হইয়া, উর্দ্ধ-শ্বাসে কালস্রোতের অভিমুখে ছুটিয়াছেন; তিনি অনুরাগভয়-ক্রোধাদিশূন্য হইয়া, প্রতিস্রোতে হইলেও অবলীলাক্রমে ভাসিয়া যাইতেছেন; দুঃখেতে তাঁহার মন বিক্ষোভিত হইতেছে না, বিষয়-সুখের জন্য তিনি লালায়িত হইতেছেন না (১); কেবলমাত্র চিরশান্তি লাভ করিবার আশায় শান্তি উপভোগ করিতে করিতে চলিতেছেন, ব্রহ্মব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পান না, সকলেতেই সমানদৃষ্টি করিতে করিতে সমস্তই ব্রহ্মময় দেখিতে দেখিতে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইতেছে, অবশেষে নিজেও ব্রহ্ম ইহাই উপলব্ধি করিতেছেন, এবং স্বকীয় পার্থক্যজ্ঞান—অহংমমেতি জ্ঞান—"আমি" "আমার" ইত্যাদিরূপ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব জ্ঞান,—লোপ করিতেছেন; তখনই তাঁহার প্রকৃত "সোঽহং" ভাব হইতেছে, অবশেষে তাঁহার ক্ষুদ্রসত্তা সেই

---

(১) দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনা ইত্যাদি। গীতা, ২।৫৬

মহাসত্তা পরমাত্মা পরব্রহ্মে, অনন্ত সাগরে বুদ্‌বুদের ন্যায় মিশাইয়া যাইতেছে (১)।

সত্ত্বাদিগুণানুযায়ী জ্ঞান ত্রিবিধ। যে জ্ঞান জন্মিলে ভেদদৃষ্টি-পরিত্যাগপূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন ভূতসমূহে সর্ব্বত্র একমাত্র অদ্বিতীয় পরমাত্মসত্তা দর্শন করিতে পারা যায়, যাহা দ্বারা সকলেতে অধিষ্ঠিত পরমাত্মাকে সর্ব্বত্রব্যাপক দেখিতে পাওয়া যায়, সেই আত্মজ্ঞানই সাত্ত্বিক জ্ঞান, ইহাই প্রকৃত জ্ঞান; যে জ্ঞানের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন দেহে পৃথক্ পৃথক্ পদার্থের অনুভব হয়, অর্থাৎ প্রাণিগণের মধ্যে কাহাকেও সুখী কাহাকেও দুঃখী ইত্যাদিরূপ দেখিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেহে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আত্মা বলিয়া অনুভব হয়, তাহাই রাজস জ্ঞান; এবং সেই অখণ্ড, সর্ব্বব্যাপী, পরিপূর্ণ আত্মা কোন একটি দেহে বা মূর্ত্তিবিশেষে সম্পূর্ণরূপে সংস্থিত অর্থাৎ উহা ভিন্ন আত্মা আর কোথাও নাই, এতাদৃশ অযৌক্তিক ও অযথার্থ জ্ঞানই তামস জ্ঞান (২)।

যে জ্ঞানমার্গে চলিয়াছে, তাহার সর্ব্বদাই মনে এই প্রকার উদয় হয় যে, "আমি কে", "কোথা হইতে আসিয়াছি," "কোথায় বা চলিয়াছি," "চলিতে চলিতে আমার পরিণামই বা কি হইবে।" এই রূপ ক্রমাগত চিন্তার উদয় হইতে হইতে যখন উপলব্ধি হয় যে, আমি ব্রহ্ম হইতে আসিয়াছি এবং তাঁহাতেই ফিরিয়া যাইব; যখন বুঝিতে পারা যায় যে, আত্মা ব্রহ্ম হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত অবস্থিত, এবং ইহা সর্ব্বভূত হইতে অভেদ; যখন ভেদজ্ঞানপরিত্যাগপূর্ব্বক আমিও যাহা, সর্ব্বভূতে অবস্থিত, সেই ব্রহ্মও তাহাই, এই প্রকারে ভজনা করিবার অধিকারী হওয়া যায়, এবং আত্মতুলনায় সর্ব্বজীবে সমান দেখা যায়, ও সুখদুঃখে

---

(১) যদা ভূতপৃথগ্ভাবম্ একস্থম্ অনুপশ্যতি। গীতা, ১৩।৩০

(২) গীতা, ১৮।২০—২২

সমান জ্ঞান করিতে পারা যায় ; তখনই আত্মজ্ঞানের উদয় হয় ; ইহাই প্রকৃত জ্ঞান (১)। এতদ্ব্যতীত আত্মশ্লাঘারাহিত্য, দম্ভহীনতা, পর-পীড়াবর্জ্জন, সহিষ্ণুতা, সরলতা, সদ্‌গুরুসেবা, অন্তর্ব্বাহ্যের পবিত্রতা, মনের স্থিরতা, সংযম, ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয়ভোগে স্পৃহাহীনতা, অহঙ্কারের অভাব, জন্মমৃত্যুজরাব্যাধির ক্লেশকারিতা সর্ব্বদা চিন্তাকরণ, স্ত্রীপুত্র-গৃহাদিতে অনাসক্তি ও তাহাদের সুখে আপনাকে সুখী অথবা দুঃখে আপনাকে দুঃখী মনে না করা, প্রিয় ও অপ্রিয় সমাগমে প্রসন্ন বা ক্ষুণ্ণ না হইয়া সমভাবাপন্ন থাকা, অনন্যভাবে ঈশ্বরে একান্ত ভক্তি, নির্জ্জন-স্থানে অবস্থিতি এবং বিষয়ী লোকের সমাগমপরিত্যাগ, এই সমস্ত জ্ঞানসাধনের অনুকূল, এই জন্য ঐ সমুদায়ও জ্ঞান বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, এবং এই সকলের যাহা বিপরীত তাহা অজ্ঞানতা নামে অভিহিত হয় (২)।

পূর্ব্বোক্ত বিধিতে জ্ঞান লাভ করিয়া যাঁহাকে জানিতে হয়, তিনিই জ্ঞেয়, তাঁহাকে জানিলে মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। তিনি অনাদি পরব্রহ্ম ; তিনি সর্ব্বত্র হস্তপদবিশিষ্ট, সর্ব্বত্র চক্ষু মস্তক ও মুখ বিশিষ্ট এবং সর্ব্বত্র শ্রবণেন্দ্রিয়বিশিষ্ট হইয়া, লোকে সর্ব্বস্থান ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন ; তিনি ইন্দ্রিয়গণের গুণস্বরূপ রূপরসাদি বৃত্তিতে সেই সেই আকারে প্রকাশমান অথচ সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিত, আসক্তি-শূন্য অথচ সত্বাদিগুণের পালক ; তিনি জীবগণের অন্তরে ও বাহিরে আছেন ; তিনি স্থাবর-জঙ্গম-রূপাদিবিহীন বলিয়া অবিজ্ঞেয়, অজ্ঞানিগণের সম্বন্ধে দূরস্থ এবং জ্ঞানিগণের নিত্যসন্নিহিত, জীবগণে অবিভক্ত ও বিভক্তরূপে অবস্থিত অর্থাৎ জ্ঞানীর চক্ষুতে অভিন্ন ও

(১) सर्वभूतस्थमात्मानमित्यादि । गीता, ६।२९—३२

(২) अमानित्वमदम्भित्वमित्यादयः । गीता, १३।७—११

অজ্ঞানীর চক্ষুতে ভিন্নরূপে প্রতীয়মান, স্থিতিকালে ভূতগণের পালক, প্রলয়কালে গ্রাসকারী এবং সৃষ্টিকালে স্বয়ং নানা কার্য্যরূপে উৎপত্তি-শীল। তিনি সূর্য্যাদি জ্যোতিঃ সকলেরও প্রকাশক, এইজন্য অজ্ঞান দ্বারা অস্পৃষ্ট বলিয়া কথিত হন। তিনিই জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞানগম্য বা জ্ঞানসাধনদ্বারা প্রাপ্য এবং সমুদয় জীবের হৃদয়ে নিয়ন্তৃরূপে অবস্থিত (১)।

জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ শুকদেব জ্ঞানের অমৃতময় ফল আস্বাদন করিতে করিতে যে পথে গমন করিয়াছেন, ব্যাস, জৈমিনি, কপিল, পতঞ্জলি, গৌতম, কণাদ, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি জ্ঞানযোগিগণ যে মার্গ অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষিত চরম অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, কেহ কি সেই পথ অবলম্বন করিবার অধিকারী হইয়াছ? তাহা হইলে তুমি যে বহুদুর অগ্রসর হইয়াছ, তুমি যে শান্তিময়ের অতি নিকটবর্ত্তী হইয়া শান্তি কি তাহা বুঝিয়াছ এবং প্রকৃত শান্তির আস্বাদ পাইতে সক্ষম হইয়াছ।

জীবন্মুক্তি।

কর্ম্মফলের অল্পমাত্রও সংস্কাররূপে অবশিষ্ট থাকিয়া শরীর ধারণ করাইয়া দেয়, তাহাতে যদি আর নূতন সংস্কার উৎপন্ন না হয়, তাহা হইলে সেই শরীরধারণের অবস্থাকেই জীবন্মুক্তি বলা যায়। কুম্ভকারের চক্র যেমন একবার ঘুরাইয়া দিলে ঘুরিতে থাকে, তাহাকে পুনরায় আর ঘুরাইয়া না দিলেও, তাহাতে আর নূতন শক্তি সঞ্চালন না করিলেও, যেমন সেটি কিছুক্ষণ ঘুরিতে থাকে, তদ্রূপ নূতন কর্ম্মফল সঞ্চয় না করিয়া প্রারব্ধ কর্ম্মফলস্বরূপ সংস্কারবলেই জীবাত্মা কিছুকাল শরীর

---

(১) জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে... [illegible] ইত্যাদয়ঃ। গীতা, ১৩।১২।১৭

ধারণ করিয়া থাকে ; এই প্রকার অবস্থাকেই জীবন্মুক্তির অবস্থা বলে। ইহার পরে শরীরপাত হইলেই কৈবল্য অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

জীবন্মুক্ত ব্যক্তি কর্ম্ম ও ফলের আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া সদাই পরিতৃপ্ত ও পরমানন্দযুক্ত থাকেন ; তিনি আত্মাকে দেহেন্দ্রিয়প্রভৃতি কিছুরই আশ্রিত মনে করেন না, সুতরাং লোকদৃষ্টিতে কার্য্য করিলেও সে কার্য্য তাঁহার অদৃষ্ট রচনা করিতে পারে না। তিনি কামনারহিত ও সর্ব্বত্যাগী হইয়া শরীর ও মনকে সংযত করিয়াছেন, সুতরাং প্রারব্ধভোগার্থ শরীরের দ্বারা কর্ম্ম করেন মাত্র ; শুভ ও অশুভ কর্ম্মানুষ্ঠানকালে মন তাহাতে আসক্ত না হওয়ায় সেই কর্ম্মের জন্য তিনি পাপ বা পুণ্যরূপ ফলভাগী হন না। তিনি যদৃচ্ছালব্ধ বস্তুতে সন্তুষ্ট হন এবং শীতোষ্ণ, মানাপমান, সুখদুঃখ প্রভৃতিতে তাঁহার মন স্থির ও অবিচলিত থাকে, সর্ব্বত্র ব্রহ্মব্যতীত আর কিছুই না দেখায় ভেদ-জ্ঞানশূন্য, অতএব শত্রুতাবিহীন, এবং কার্য্যের সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে হর্ষবিষাদহীন, সুতরাং তিনি কোন কর্ম্ম করিলেও বন্ধনদশাগ্রস্ত হন না (১)।

সকলের এক ধর্ম্ম হইতে পারে কিনা ?

ত্রিগুণের সংমিশ্রণের তারতম্যবশতঃ মনুষ্যগণের ঠিক একই প্রকার শারীরিক গঠন বা মানসিক বৃত্তি নহে এবং শক্তি সামর্থ্য বা প্রবৃত্তিও সকলের সমান নহে। এই সকল কারণবশতঃ উৎকর্ষলাভের জন্য সকলের একই পথ হইতে পারে না, সকলের এক ধর্ম্ম হওয়া সম্ভব নহে। যিনি কোন পথে গমন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন,

---

(১) ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গমিত্যাদয়ঃ। গীতা, ৪।২০।২২

অথবা সিদ্ধিলাভ করিবার আশায় বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন, তিনি তাঁহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তিদিগকে সেই পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। ইহা হইতেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সম্প্রদায় হইয়াছে। মনুষ্যগণের মধ্যে উপরি উক্তরূপ পরস্পরের পার্থক্যবশতঃ এক সম্প্রদায়ে অধিক লোক হইতে পারে না, বহুসংখ্যক লোক একটি সাধারণ সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও উহা অসংখ্য অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া থাকে। এই এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণ যদি প্রায় সমগুণাবলম্বী হয় এবং ঐ সম্প্রদায়ের আচরণীয় কার্য্যসমূহ যদি তাহাদের গুণের উপযোগী হয়, তাহা হইলে তাহারা ক্রমশঃ উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে। সকল মনুষ্যেরই এক ধর্ম্ম হইতে পারে যে মনে করে সে ভ্রমে পতিত হয়, এবং উহা করিবার জন্য যে চেষ্টা করে সে বিফলমনোরথ হয়। পুরাকাল হইতে অনেকে ঐ প্রকার চেষ্টা করিয়াছে বলিয়া, কিংবা এক সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ অন্য সম্প্রদায়ের মনুষ্যগণের প্রতি ঈর্ষা বা দ্বেষযুক্ত হওয়ায়, নানা দেশে নানা সমাজে কতই যে নিষ্ঠুর রোমহর্ষণকারী বীভৎস ব্যাপারের অভিনয় হইয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই এবং এখনও বহুস্থানে ঐ প্রকার হইতেছে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে সকলের উৎকর্ষলাভের জন্য একই প্রকার কর্ত্তব্য কার্য্য নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। এই জন্যই ত্রিগুণের তারতম্যানুযায়ী আর্য্যসমাজ চতুর্ব্বর্ণে বিভক্ত হইয়া আসিয়াছে। ত্রিগুণের পার্থক্যবশতঃ এক বর্ণের ব্যক্তি বর্ণান্তরের সমস্ত কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনে সক্ষম হয় না এবং করিলেও তাহার উৎকর্ষ সাধিত হয় না। উৎকর্ষলাভের জন্য কর্ত্তব্যকার্য্যসম্পাদন যদি ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে পৃথক্ পৃথক্ বর্ণের কার্য্যসমূহকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ধর্ম্ম বলিতে পারা যায়। যদিও মনুষ্যমাত্রই চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে একটি না একটি বর্ণের অন্তর্গত, কিন্তু অন্যান্য সমাজে ঐরূপ বিভাগ না থাকায় এবং উহাতে মনুষ্যগণ

গুণানুযায়ী শ্রেণীবদ্ধ না হওয়ায় ও তাহাদের পরস্পর সমগুণানুযায়ী দাম্পত্যসম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট হওয়ার কোন প্রকার নিয়ম না থাকায়, ঐ সমস্ত সমাজ সংকরত্বে পূর্ণ, সুতরাং সমাজস্থ ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্যকার্য্য-নির্দ্ধারণের বিধিসমূহ সমস্তই যেন শৃঙ্খলাবিহীন ও স্বেচ্ছাচারিতাময়।

যে পশুভাবাপন্ন তাহাকে তাহার উপযোগী উপদেশই দিতে হয়, সে যে কর্ম্ম করিতে সুক্ষম হয় তাহাই করিতে শিক্ষা প্রদান করিতে হয়; তাহাকে তাহার প্রবৃত্তির সম্পূর্ণ বিপরীত ও তাহার সামর্থ্যের অতিরিক্ত দেবভাবাপন্ন ব্যক্তির উপযোগী কর্ম্ম করিতে শিক্ষা দিলে বা উহা করিতে বাধ্য করিলে, অথবা তাহার বুদ্ধির অগম্য উপদেশ প্রদান করিলে, তাহার কোন ফলই হয় না, বরঞ্চ অনিষ্টই হইয়া থাকে। তাহাকে তাহার উপযোগী পথে লইয়া গেলেই তাহার উৎকর্ষ সাধিত হয়। আবার যে দেবভাবাপন্ন ব্যক্তি তাহাকে নিম্নাধিকারীর ন্যায় পরিচালন করিলে, কিংবা ইহারই উপযোগী কর্ম্ম করিতে বাধ্য করিলে, প্রথমোক্ত ব্যক্তির অপকর্ষ ব্যতীত উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে না। যেমন, গর্দ্দভকে অশ্বের ন্যায় চালাইলে, অথবা তাহার পৃষ্ঠে হস্তীর উপযোগী ভার দিলে, তাহার প্রাণসংশয়ই হইয়া থাকে। আবার অশ্বকে যদি গর্দ্দভের ন্যায় চালান যায় তাহা হইলে তাহার দ্রুতগামিত্ব ক্রমে ক্রমে লোপ হইয়া তাহার উৎকর্ষ নষ্ট হয়, এবং হস্তীর পৃষ্ঠে যদি গর্দ্দভের উপযোগী ভার প্রদান করিয়া তাহাকে তদ্রূপ অভ্যাস করান যায়, তাহা হইলে সে আর অধিক ভার বহন করিতে ইচ্ছুকও হয় না এবং অবশেষে সমর্থও হয় না। অতএব যে যেমন অধিকারী তাহাকে তেমনিই পথে লইয়া যাইতে হয়, তাহার উপযোগী কর্ম্মই তাহাকে শিক্ষা করাইতে হয়।

উৎকর্ষ লাভের জন্য মানুষের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত বরাবরই যে একই প্রকার কর্ত্তব্য কার্য্য তাহাও নহে। ইহা হইতেই পারে না,

যদিও ঐ প্রকার কেহ আচরণ করে, তাহা হইলে তাহার উৎকর্ষ সাধিত না হইয়া অনিষ্টই হইয়া থাকে। বাল্যে যাহা কর্ত্তব্য কৈশোরে তাহা নহে, কৈশোরে যাহা, যৌবনে তাহা নহে, এবং যৌবনে যাহা, বার্দ্ধক্যে তাহা নহে। এই জন্যই আর্য্যশাস্ত্রে আশ্রমবিভাগের ব্যবস্থা আছে। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে বিশেষরূপে বলা হইয়াছে।

যদি সমগ্র আর্য্যশাস্ত্রানুমোদিত উপদেশনিচয় এবং ইহাকর্ত্তৃক প্রদর্শিত পথসমূহ একই ধর্ম্ম হয়, এবং যাহারা ঐ শাস্ত্রানুযায়ী চলে, তাহাদের সকলকেই যদি এক সম্প্রদায়ভুক্ত বলা যায়, তাহা হইলেই সকল মনুষ্যের এক ধর্ম্ম সম্ভব হইতে পারে, এবং সকল মনুষ্যই এক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূত বিবেচিত হইতে পারে। যে পশু হইতে কিঞ্চিন্মাত্র উন্নত হইয়া মনুষ্য হইয়াছে, যে তমোগুণে আচ্ছন্ন, তাহার জন্যও ঐ শাস্ত্র বিধান করিয়াছেন, আবার যিনি সত্বগুণাবলম্বী দেবভাবাপন্ন সুতরাং মনুষ্যগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ঈশ্বরের সন্নিকট, উহাতে তাহার উপযোগীও বিধান আছে। পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ ও আশ্রম অনুযায়ী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপ শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা, আর্য্যশাস্ত্র তাহারই ব্যবস্থা করিয়াছেন। এ প্রকার সার্ব্বজনীন শাস্ত্র অন্য কোন সমাজে নাই, হইতেও পারে না। যাহার যে প্রকার ক্ষমতা, যে যতটুকু অধিকারী, তাহার সেইরূপ পথ ইহাতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার জন্য সেইরূপ শিক্ষাই বিহিত হইয়াছে। ঐ প্রকার অধিকারানুযায়ী সমাজকে বিভক্ত করিয়াছে এবং ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পথ, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রকার কর্ত্তব্য কার্য্য নির্দ্ধারণ করিয়াছে বলিয়াই আর্য্যশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব, এই জন্যই ইহা এত উৎকৃষ্ট, এবং ঐ শাস্ত্র দ্বারা চালিত হইয়াছে বলিয়াই আর্য্যসমাজ উন্নত এবং অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিয়া এখনও জীবিত আছে ও চিরকাল থাকিবে। নানা কারণবশতঃ বিপর্য্যস্ত হইলেও ইহা ধর্ম্মরাজ্যে এখনও শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। সম্প্রতি ইহা যেন নিদ্রায়

অভিভূত হইয়া আছে, সেই জন্য যদিও ইহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিথিল হইয়াছে, কিন্তু তথাপি ইহাতে এখনও জীবনীশক্তি আছে। জানি না কতকাল এই সমাজ নিদ্রিত থাকিবে।

উপসংহার।

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত"।

উচ্চবর্ণীয় আর্য্যগণ! আর কতদিন নিদ্রিত থাকিবে, উত্থিত হইয়া যাহা শ্রেষ্ঠতম তাহাই পাইবার জন্য চেষ্টা কর। তোমাদেরই ঊর্দ্ধতন মহাপুরুষগণ, তোমরা যে স্থানে ভাসিতেছ সেই স্থান হইতেই ভাসমান অন্যান্য জীব ও পদার্থকর্ত্তৃক আকৃষ্ট না হইয়া, সেই শান্তিময়ের উদ্দেশে স্রোতের প্রতিমুখে দ্রুতগতিতে গিয়াছেন, এবং নিজ ক্ষমতায়, নিজ সাধনাবলে, এই দুস্তর স্রোত উত্তীর্ণ হইয়া চিরশান্তি লাভ করিয়াছেন, ও যাইতে যাইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট জীবকে ভিন্ন ভিন্ন সুগম পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, এবং বিভিন্ন প্রকার শ্রেণীর জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সহজ উপায় বলিয়া গিয়াছেন। তোমরা ত বহুবার ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়াছ, তবুও কেন শ্রান্ত হইয়া বিশ্রামলাভের জন্য, শান্তিময় স্থানে যাইবার জন্য, উৎসুক হও নাই? তোমরা বহুবার বহুসুখ ভোগ করিয়াছ, উহা প্রাপ্তির আশায়ও অসংখ্যবার নিরাশ হইয়াছ, তুচ্ছ ভাসমান জীব ও পদার্থের সহিত এতবার এতদিন হইতে সংশ্লিষ্ট হইয়াও বীতস্পৃহ হও নাই? তোমরা অশীতিলক্ষযোনি ভ্রমণ করিয়া, নিকৃষ্ট তামসী গতি স্থাবরজন্ম হইতে আরম্ভকরতঃ অশীতি লক্ষবার অদৃশ্য হইয়া, প্রত্যেক বারে নূতন নূতন মূর্ত্তি-ধারণপূর্ব্বক ক্রমোৎকর্ষবশে দুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়াছ;

আবার মনুষ্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াও বহুবার ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়াছ, তাই তোমরা এই পবিত্র ভারতভূমিতে শ্রেষ্ঠ আর্য্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। পুনঃপুনঃ এত নূতন নূতন আবরণে আবৃত হইয়া, এত নূতন নূতন জীব ও পদার্থাদির সহিত সংযোগবিয়োগরূপ সুখদুঃখ ভোগ করিয়াও তোমাদের সাধ মিটে নাই? এত ঘুরিয়া ফিরিয়া এত ছুটাছুটি করিয়া কি তোমাদের শ্রান্তিবোধ হয় নাই? আর কেন! চল, ফিরিয়া চল। বহুকাল হইল প্রকৃত গৃহ ছাড়িয়া আসিয়া, প্রকৃত পিতামাতা পুত্রকন্যাদি ত্যাগ করিয়া আসিয়া, কতবার যে কত নশ্বর গৃহে "আমার আমার" বলিয়া প্রবেশ করিয়াছ, কতবার যে কত জীবকে পিতামাতাপুত্রকন্যাদি নামে অভিহিত করিয়া "আমার আমার" বলিয়া তাহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়াছ, কতবার যে কত পদার্থকে তোমাদের ইন্দ্রিয়ের প্রীতিকর মনে করিয়া "আমার আমার" বলিয়া গ্রহণ করিয়াছ, তাহার ইয়ত্তা নাই; কিন্তু কৈ কিছুইত তোমাদের হইল না! তোমাদের যদি হইত, তাহা হইলে সে সমস্ত তোমাদের হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে কেন? আর কতদিন বাল্য-ক্রীড়া করিবে? অবোধ বালিকাগণ যেমন পিতা মাতা পুত্র কন্যা পুত্রবধূ জামাতা ইত্যাদি নামে অভিহিত করিয়া বিবিধ পুত্তলিকা লইয়া ক্রীড়া করে, যেমন ক্রীড়ার গৃহ প্রস্তুত করিয়া তাহাদিগকে সাজাইয়া রাখে, উহার মধ্যে কোনটি হারাইলে বা ভাঙ্গিলে তাহাদের অত্যন্ত দুঃখ হয়, তাহারা কান্দিয়া আকুল হয়, সেই প্রকার তোমাদেরও অবস্থা, তোমরাও সেইরূপ পুত্তলিকা লইয়া ক্রীড়া করিতেছ, কতকগুলি জীবের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে পিতা মাতা পুত্র কন্যা প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়া তাহাদিগকে লইয়া কখনও বা আমোদে উন্মত্ত হইতেছ, আবার কখনও বা উহাদের মধ্যে কোনটি অদৃশ্য হইলে অসহ্য কষ্ট পাইতেছ, শোকে অভিভূত হইতেছ। যেমন বয়োবৃদ্ধ

ব্যক্তি বালক্রীড়া দেখিয়া হাস্য করে, সেইরূপ তোমাদেরও ক্রীড়া দেখিয়া যাঁহারা জ্ঞানবৃদ্ধ তাঁহারা হাস্য করিতেছেন। বালিকাগণ যতই বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, ততই ঐ পুত্তলিকা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীত হয়, তখন আর তাহাতে তাহাদের তত আসক্তি থাকে না, তখন উহা অপেক্ষা প্রকৃত পুত্র কন্যাদি পাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা হয় এবং পাইলে তাহাতেই আসক্ত হয়; তদ্রূপ তোমাদেরও যতই জ্ঞানপ্রাপ্তি হইবে, ততই তোমাদের পিতা মাতা পুত্র কন্যাদির নশ্বরত্ব উপলব্ধি হইবে, তাহাদের প্রতি আসক্তি হ্রাস হইয়া গিয়া যিনি নশ্বর পিতা মাতা প্রভৃতি হইতে অতি প্রিয়তম তাঁহারই প্রতি আসক্তি জন্মিবে। এখনও কি তোমাদের ভ্রম ঘুচে নাই? প্রকৃতই যাহা তোমাদের তাহাই পাইবার উদ্দেশে অগ্রসর হও। এই বর্ত্তমান আবরণ ত্যাগের পূর্ব্বে যাহাতে প্রকৃত বস্তু লাভ করিবার উপযোগী হও, যাহাতে সেই বস্তু সম্যগ্‌রূপে বুঝিতে ও চিনিতে পার তাহারই আয়োজন কর; তাহা হইলে আর পুনঃপুনঃ ফিরিয়া আসিতে হইবে না, আর বৃথা যন্ত্রণাভোগ করিতে হইবে না (১)। আহারবিহারনিদ্রাদির দ্বারা অনেকবার ইন্দ্রিয়চরিতার্থ করিয়াছ, এক্ষণে এই দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া, ধর্ম্মক্ষেত্র কর্ম্মভূমি ভারতভূমিতে পবিত্র আর্য্যকুলে উচ্চবর্ণে জন্মিয়া, আর কেন কেবলমাত্র পশুরূপী জীবের অনুসরণ করিতেছ, পশুগণ অপেক্ষা তোমরা যে অনেক শ্রেষ্ঠ জীব। পশুগণ অপেক্ষা কেন, অন্যান্য মনুষ্যগণ অপেক্ষাও

(১) ইহ চেদশকদ্বোদ্ধুং প্রাক্ শরীরস্য বিস্রসঃ।
ততঃ সর্গেষু লোকেষু শরীরত্বায় কল্পতে॥

কঠোপনিষৎ।

যদি ইহজগতে শরীর পতনের পূর্ব্বে (ব্রহ্মকে) অবগত হইতে না পার, তাহা হইলে সৃষ্ট ভূতের আবাসভূমিরূপ লোকসমূহে ঘুরিবার জন্য শরীর গ্রহণ করিতে হইবে।

তোমরা যে সেই উৎকৃষ্টতম চরমতত্ত্বের অনেক সন্নিকট, তাহাই দেখাও সকলে দেখিয়া তোমাদেরই অনুসরণ করুক। তোমাদেরই পূর্ব্বপুরুষগণ পৃথিবীস্থ সকল মনুষ্যেরই আদর্শস্বরূপ ছিলেন, সকলেই তাঁহাদের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া তাঁহাদেরই অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাদের বংশধর হইয়া তোমরা কি এতই নিকৃষ্ট হইয়াছ যে, অন্যকে আদর্শ ক[illegible] তাহাদের অনুসরণ করিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছ, অনুকরণের অনুকরণকে প্রকৃত ভ্রমে অমূল্য রত্ন হারাইতেছ, এবং পথভ্রান্ত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া প্রবৃত্তির স্রোতে গা ঢালিয়া দিতেছ? সেই সাধকশ্রেষ্ঠ ভক্ত কবি যেমন মনের আবেগে গাহিয়াছিলেন, এখনও সময় থাকিতে তোমরাও যাহাতে তেমনই প্রাণের সহিত গাহিতে পার ও তদনুযায়ী কার্য্য করিতে পার তাহারই চেষ্টা কর:—

"না করিলাম ধর্ম্ম কর্ম্ম, পাপ করেছি রাশি রাশি।
আমি যাবার পথে কাঁটা দিয়ে, পথ ভুলে রয়েছি বসি॥
জনমি ভারতভূমে মা, কি কর্ম্ম করিলাম আসি।
আমার একূল ওকূল দুকূল গেল, (এখন) অকূল পাথারে ভাসি॥"